# ইসলাম

## ঈমান ও শিক্ষা

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার

দারুল খিদমাহ প্রকাশনী

| | |
|---|---|
| ছাফা পাহাড়ের ওপর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) | ১৩২ |
| তীব্র বিরোধিতা ও নির্যাতন | ১৩৪ |
| আবু জাহ্‌ল্ ও উটবিক্রেতা | ১৩৬ |
| উৎবাহ বিন রাবী'আহ্‌র প্রস্তাব | ১৩৯ |
| আরেকটি ধূর্ততাপূর্ণ প্রস্তাব | ১৩৯ |
| আবিসিনিয়ায় হিজরত | ১৪০ |
| মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা | ১৪০ |
| হযরত 'উমারের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ | ১৪২ |
| বয়কট ও নির্বাসন | ১৪৩ |
| দুঃখ-কষ্টের বছর | ১৪৪ |
| তায়েফে ঃ জীবনের কঠিনতম দিন | ১৪৫ |
| মি'রাজ ঃ উর্ধলোকে পরিভ্রমণ | ১৪৬ |
| আল-আকাবার প্রথম অঙ্গীকার | ১৪৮ |
| আল-আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার | ১৪৯ |
| মদীনায় হিজ্‌রত | ১৫০ |
| হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হিজ্‌রত | ১৫১ |
| মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) | ১৫৩ |
| আযান প্রবর্তন | ১৫৭ |
| মুসলমানদের জন্যে আরো করণীয় নির্ধারণ | ১৫৮ |
| কঠিন দায়িত্ব | ১৫৯ |
| বদর যুদ্ধ | ১৫৯ |
| 'উহুদের যুদ্ধ | ১৬২ |
| আহ্‌যাব যুদ্ধ বা খন্দক যুদ্ধ | ১৬৫ |
| হুদায়বিয়ার সন্ধি | ১৬৮ |
| মক্কাহ বিজয় | ১৭০ |
| বিদায় ভাষণ | ১৭৩ |
| বিষাদের খবর ঃ ইন্তেকাল | ১৭৫ |
| দায়িত্ব সম্পাদন | ১৭৭ |
| এক নযরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনকাহিনী | ১৭৯ |
| অনুশীলনী (তিন ঃ ক) | ১৮২ |
| অনুশীলনী (তিন ঃ খ) | ১৮৩ |
| অনুশীলনী (তিন ঃ গ) | ১৮৪ |
| **অনুশীলনী (তিন ঃ ঘ)** | ১৮৫ |

| | | |
|---|---|---|
| চার | আল-খুলাফাউর্ রাশিদূন্ (সঠিক পথে চালিত খলীফাহ্গণ) | ১৮৬-২০৩ |
| | হযরত আবু বকর (রাঃ) | ১৮৬ |
| | হযরত 'উমার (রাঃ) | ১৯১ |
| | হযরত 'উছমান (রাঃ) | ১৯৫ |
| | হযরত 'আলী (রাঃ) | ১৯৭ |
| | উপসংহার | ২০০ |
| | অনুশীলনী (চার ঃ ক) | ২০১ |
| | অনুশীলনী (চার ঃ খ) | ২০৩ |
| পাঁচ | তিন জন মহীয়সী মুসলিম মহিলা | ২০৪-২১১ |
| | হযরত খাদীজাহ (রাঃ) | ২০৪ |
| | হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) | ২০৬ |
| | হযরত আয়েশাহ (রাঃ) | ২০৮ |
| | অনুশীলনী (পাঁচ) | ২১১ |
| ছয় | কয়েক জন নবী-রাসূলের (আঃ) কাহিনী | ২১২-২৩০ |
| | হযরত আদম (আঃ) | ২১২ |
| | হযরত নূহ (আঃ) | ২১৫ |
| | হযরত ইব্রাহীম (আঃ) | ২১৮ |
| | হযরত মূসা (আঃ) | ২২১ |
| | হযরত 'ঈসা (আঃ) | ২২৫ |
| | অনুশীলনী (ছয় ঃ ক) | ২২৭ |
| | অনুশীলনী (ছয় ঃ খ) | ২২৯ |
| | অনুশীলনী (ছয় ঃ গ) | ২৩০ |
| সাত | শারী'আহ্ (ইসলামী আইন) | ২৩১-২৩৬ |
| | সুন্নাহ | ২৩৩ |
| | ফিকহ্ | ২৩৪ |
| | অনুশীলনী (সাত) | ২৩৬ |
| আট | ইসলামে সামাজিক জীবন | ২৩৭-২৪৮ |
| | ইসলামে পারিবারিক জীবন | ২৩৭ |
| | বিবাহ (নিকাহ) | ২৩৭ |
| | ইসলামে নারীর মর্যাদা | ২৩৯ |
| | ইসলামে নারীর অধিকার | ২৪১ |
| | ইসলামে নারীর কর্তব্য | ২৪২ |
| | বহুবিবাহ ও ইসলাম | ২৪৪ |
| | অনুশীলনী (আট) | ২৪৮ |

| | | |
|---|---|---|
| নয় | ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | ২৪৯-২৫৪ |
| | অনুশীলনী (নয়) | ২৫৪ |
| দশ | ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা | ২৫৫-২৫৯ |
| | অনুশীলনী (দশ) | ২৫৯ |
| এগার | মানবজীবনের আরো কয়েকটি দিক | ২৬০-২৬৭ |
| | খাদ্য ও পানীয় | ২৬০ |
| | পোশাক-পরিচ্ছদ | ২৬৩ |
| | উৎসব, উদ্‌যাপনী ও স্মরণীয় দিন | ২৬৪ |
| | অনুশীলনী (এগার) | ২৬৭ |
| বার | বিভিন্ন বিষয়ে কুর্‌আন মজীদের কিছু বাছাই করা আয়াত | ২৬৮-২৯৩ |
| | তাওহীদ | ২৬৯ |
| | রিসালাহ | ২৬৯ |
| | আখিরাহ | ২৭০ |
| | মু'মিনের গুণাবলী | ২৭২ |
| | পুত্রের প্রতি হযরত লুকমান (আঃ)-এর উপদেশ | ২৭২ |
| | দায়িত্ব-কর্তব্য | ২৭৩ |
| | সামাজিক সৎগুণাবলী | ২৭৫ |
| | খারাপ ও হারাম কাজসমূহ | ২৮৮ |
| | অনুশীলনী (বার) | ২৯৩ |
| তের | কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ | ২৯৪-৩০২ |
| | দায়িত্ব-কর্তব্য | ২৯৪ |
| | মৌলিক গুণাবলী | ২৯৬ |
| | আচার-ব্যবহার | ২৯৯ |
| | খারাপ আচরণ | ৩০০ |
| | অনুশীলনী (তের) | ৩০২ |
| চৌদ্দ | মুসলিম জাহান | ৩০৩-৩১২ |
| | মানচিত্র | ৩০৩ |
| | জনসংখ্যা ও সম্পদ | ৩০৫ |
| | মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ | ৩০৬ |
| | মুসলিম সংখ্যালঘু দেশসমূহ | ৩০৯ |
| | অনুশীলনী (চৌদ্দ) | ৩১২ |
| পনর | নির্বাচিত পুস্তক তালিকা | ৩১৩-৩১৫ |
| ষোল | পরিভাষা কোষ | ৩১৬-৩৩৬ |

بسم الله الرحمن الرحيم

# বাংলা প্রথম সংস্কারণে

## লেখকের ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালার যিনি আমার ইংরেজীতে প্রকাশিত এই Islam: Beliefs and Teachings এর বাংলা সংস্করণ প্রাকাশ করার তাওফিক দিয়েছেন। আমি দরুদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি।

ইংরেজীতে লিখিত আমার এ বই আল্লাহ্ অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব ইংরেজী ভাষী দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি এ বইতে ইসলামের বুনিয়াদী আকিদা এবং ইসলাম এর প্রধান দিকগুলোকে সহজ ভাষায় সংযোজন করতে চেষ্টা করেছি।

ইংরেজী ভাষা থেকে এ বইটি ফরাসী (French), নরওয়েজিয়ান (Norwegian), রোমানিয়ান (Romanian), এবং চাইনিজ (Chinese) ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী বইটি যুক্তরাজ্য ছাড়া কুয়েত, পাকিস্তান ও ভারতে অনুমোদনসহ মুদ্রিত হয়েছে।

অনেক দিন থেকে আমার আশা ছিল বইটিকে বাংলায় প্রকাশ করার। সময় ও সুযোগ করতে না পেরে এতদিন আমি এ কাজ করতে পারিনি।

আমি নিজে বাংলা ভাষী হলেও প্রায় তিন যুগ ধরে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থানের কারনে আমি নিজে আমার বইয়ের অনুবাদ করতে সাহস করিনি। আমি চাচ্ছিলাম সহজ ও সাবলীল বাংলা জানেন এমন কাউকে দিয়ে অনুবাদ করাতে। এজন্য পরিচিত ভাইদের মাধ্যমে চেষ্টা করেছি। ভাই নূর হোসেন মজিদী সাহেব তাঁর বহু ব্যস্ততা সত্বেও বইটি অনুবাদ করেছেন। এ জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা অনুবাদ আমি নিজে বার বার পড়েছি এবং সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তন করেছি। তবুও ভুল-ক্রটি যে থাকবে এ ব্যপারে আমি নিশ্চিত। পাঠকের নিকট সবিনয় অনুরোধ তারা যেন কষ্ট করে ভুল-ক্রটি গুলো আমাকে জানিয়ে বাধিত করেন।

ইসলামের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র কুরআন ও রাসুল (সাঃ) এর হাদীছ। এ দুটি উৎস হচ্ছে আরবী ভাষায়। আরবী পরিভাষা ও শব্দ সঠিকভাবে বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন অনেকটা অসম্ভব। কয়েকটি আরবী অক্ষরের সঠিক উচ্চারন বাংলায় অত্যন্ত কঠিন। যেমন: ق ، غ، ع، ط، ض، ز، ذ، ح، ث প্রতিবর্ণায়নে এ ব্যপারে কিছুটা নির্দেশনা আছে। ইসলামের অনেকগুলো ঐতিহাসিক নামসহ বেশ কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় ভুল উচ্চারিত হয়ে আসছে এবং উর্দূ ও ফারসী থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে বেশ কিছু আরবী নাম এবং শব্দ ভুল থেকে গেছে এবং এখনো সে ভুলের প্রচলন চলছে।

**উদহারণ স্বরূপ প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি সোরাহ্‌বিল বিন হাছানাহ্** (شُرَحْبِيْلُ بِنْ حَسَنَةَ) কে সুরজিল বিন হাছানাহ্, হারবুল ফিজার (حَرْبُ الْفِجَارِ) কে হরফুল ফুজ্জার, বায়তুল মাকদিস (بَيْتُ الْمَقْدِسْ) কে বায়তুল মোকাদ্দাস, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মায়ের আরবী নাম হাজর (هَاجَرْ) কে বিবি হাজেরা, সাহুর (سَحُوْر) কে সেহেরী বলা হয়। এছাড়াও আরো বহু আরবী শব্দ বাংলায় তার মূলরুপ হারিয়ে ফেলেছে। আমরা বাংলা ভাষীরা ج আর ذ কে সঠিক ভাবে উচ্চারন করিনা। তাই আমাদের উচ্চারনে জালিল (جَلِيْل) হয়ে যায় (ذَلِيْل) যালিল। এতে অর্থ সম্পূর্ন বদলে যায় এভাবে আমরা (زَكَاة) যাকাতকে (جَكَاة) জাকাত, জানাযাহ (جَنَازَة) কে (زَنَجَاة) যানাজা উচ্চারণ করে ফেলি।

আমি আমার এ বইতে এগুলোকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি তার মূল্যায়ন সম্মানিত পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম। ভুল-ক্রটি যে থাকবে এতে আমি নিঃসন্দেহ। এটা বলতেও দ্বিধা নেই যে আমার আরবী ভাষা জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

আমি এ বইটি যদিও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মূলতঃ লিখেছি তথাপি আমি আশা করি বয়স্করাও এ বই পাঠে উপকৃত হবেন।

এই পুস্তক রচানায় আমি যেসব তথ্যসূত্র ও উৎস থেকে উপকৃত হয়েছি সেগুলো পুস্তকের শেষে Bibliography তে উল্লেখ করেছি।

এই বই লেখার কাজে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার এ বইটি যদি বাংলাদেশের কিশোর-তরুন-যুবকদের ইসলামকে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে এবং ইসলামী জ্ঞানের ভিত্তিতে আমল করার জন্য অনুপ্রানিত করে, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব এবং আমার মহান খালিক ও মালিকের দরবারে সেজদাবনত হব।

আল্লাহ্ আমার এ আন্তরিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এ বইকে আখিরাহ্‌তে আমার নাজাতের বাহন করে দিন। আমিন।

**গোলাম সারওয়ার**

**লন্ডন**

**১ জিল্‌হাজ্জ, ১৪২৩ হিঃ**

**৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ ঈসায়ী।**

# প্রতিবর্ণায়ন

আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এ ব্যাপ্যারে যত্নবান হওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ আরবী শব্দের সামান্য ভুল উচ্চারণের কারণে অনেক ক্ষেত্রে অর্থ বদলে যেতে পারে; এমন কি বিপরীত অর্থও প্রকাশ পেতে পারে।

এ সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে আরবী শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণে সহায়তা করার জন্যে নীচে একটি প্রতিবর্ণায়ন দেয়া হল (যা এ পুস্তকের বঙ্গানুবাদে অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও বাস্তব অসুবিধা ও সঙ্গত কারণে কিছু ব্যতিক্রমও করা হয়েছে।) এ প্রতিবর্ণায়ন থেকে মূল আরবী শব্দের বানান নির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু একটি শব্দ ঠিক কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে তা বই-এর পাতায় ছেপে দেখানো সম্ভব নয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ "আল্লাহ্" (اَللّٰه) শব্দটিতে দু'টি 'ল' রয়েছে এবং দু'টি 'ল'-এর উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় 'ল'-এর 'া' (আ-কার) দীর্ঘ হবে অর্থাৎ টেনে পড়তে হবে। তেমনি 'মুহাম্মাদ'(مُحَمَّد) শব্দের حَ -এর উচ্চারণ বাংলা 'হ' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং দু'টি 'ম' সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

বাংলা ভাষায় দীর্ঘ 'আ' বলতে কিছু নেই; না লেখ্যরূপ আছে, না উচ্চারণ আছে। তবে জানা থাকা প্রয়োজন। যদিও জানা থাকলেও বাংলা বাক্যের মধ্যে আরবী শব্দের 'দীর্ঘ-আ'-এর উচ্চারণ আসে না, তবে আরবী বাক্য পড়ার ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব হয়। নইলে হ্রস্ব উচ্চারণ করলে অর্থ ভুল হবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের নিকট পরিচিত কোন চিহ্ন না থাকায় আমরা বাংলায় 'দীর্ঘ আ' বা মাদ্দ্ (مَدّ) -এর জন্য আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করিনি। এরূপ আরো কিছু হরফের জন্যে (যেমন : ث، ض، غ ইত্যাদি) আমরা স্বতন্ত্র ও একক প্রতিবর্ণায়নচিহ্ন ব্যবহার করিনি। এর কারণ, প্রথমতঃ অনেকগুলো আরবী হরফের বাংলা সঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তাই এসব হরফের উচ্চারণ শিক্ষকের নিকট থেকে না শিখলে প্রতিবর্ণায়ন কোন কাজে আসবে না। দ্বিতীয়তঃ বাংলা মুদ্রণ ব্যবস্থায় আরবীর প্রতিবর্ণায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যথোপযোগী চিহ্নের অভাব। তৃতীয়তঃ কতক আরবী হরফের ভুল উচ্চারণ এমন সার্বজনীন রূপ পেয়েছে যে, সেসব হরফবিশিষ্ট ব্যাপক প্রচলিত শব্দের সঠিক উচ্চারণ দেখলে আরবী না-জানা পাঠক-পাঠিকা একে দু'টি আলাদা শব্দ মনে করতে পারে। যেমন حَدِيْث--এর সঠিক উচ্চারণ বাংলায় সম্ভব নয়, তবে কাছাকাছি উচ্চারণ 'হাদীথ্', কিন্তু এর 'হাদীস/হাদীছ' উচ্চারণ সার্বজনীন রূপ পেয়েছে। তাই 'প্রথাগত ভুল' (Customary Error/ غلط مشهور ) হিসেবে এক্ষেত্রে ভুল উচ্চারণ লেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। চতুর্থতঃ সবগুলো হরফের প্রতিবর্ণায়ন করলে কিশোর-তরুণদের জন্যে লেখা এ বই-এর ভাষার গতিশীলতা ব্যাহত হবে এবং পাঠক-পাঠিকারা বই পড়তে গিয়ে হোঁচট খাবেন। যেহেতু বাংলায় দীর্ঘ ঈ-কার ও দীর্ঘ-উ-কার আছে তাই তার উচ্চারণ না থাকলেও

আরবী-ফার্সীর মূল বানান নির্দেশ করার জন্যে আমরা তা বহাল রেখেছি। যা-ই হোক, ভাষার গতিশীলতার স্বার্থে আমরা এ বই-এর অনুবাদে আরবী-ফার্সী শব্দের আংশিক প্রতিবর্ণায়ন করেছি এবং কতক ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত বানান ঠিক রেখেছি। সেই সাথে এ বইয়ে ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী পরিভাষাসমূহের মূল আরবী-ফার্সী বানান বইয়ের শেষে পরিভাষাকোষে দেয়া হল; উচ্চারণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় শিখে নিতে হবে।

আরবী ভাষায় নির্দিষ্টবাচক ال -এর উচ্চারণ কোন কোন ক্ষেত্রে 'আল্' হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'ল্'-এর পরিবর্তে এর সাথে যুক্ত শব্দের প্রথম হরফ হস্‌যুক্ত হয়ে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। আজকাল আরবী না-জানা অনেক লোক পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের অনুসরণে সকল ক্ষেত্রে 'আল্' লিখেন। এত বানানের সঠিক নির্দেশ পাওয়া গেলেও সঠিক উচ্চারণ প্রতিফলিত হয় না। আমরা এ ক্ষেত্রে উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়েছি। যেমন : اَلتَّشَهُّد -কে 'আল-তাশাহ্‌হুদ্' না লিখে 'আত্-তাশাহ্‌হুদ্' লিখেছি।

আরবী হরফ ও শব্দের সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কোন আরবীভাষী বা আরবী-জানা লোকের কাছ থেকে শিখে নেয়া। এ ব্যাপারে অডিও ও ভিডিও-র সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। [এখানে কাছাকাছি প্রতিবর্ণায়ন প্রদত্ত হল এবং সাথে ইংরেজী ভাষান্তরও দেয়া হল।]

| আরবী হরফ ও চিহ্ন | বাংলা হরফ ও চিহ্ন | ইংরেজী হরফ ও চিহ্ন | উদাহরণ আরবী | বাংলা | ইংরেজী |
|---|---|---|---|---|---|
| ا | অ | a | أَوَّل | আউয়াল | Awwal |
| ب | ব্ | b | بِلَال | বিলাল | Bilal |
| ت | ত্ | t | تِرْمِذِي | তিরমিযী | Tirmidhi |
| ث | ছ্ | th | عُثْمَان | 'উছ্‌মান | 'Uthman |
| ج | জ্ | j | جَنَّة | জান্নাহ্ | Jannah |
| ح | হ্ | h | مُحَمَّد | মুহাম্মাদ | Muhammad |
| خ | খ্ | kh | خَلِيْفَة | খালীফাহ্ | Khalifah |
| د | দ্ | d | دَاوُد | দাউদ্ | Dawud |
| ذ | য্ | dh | تِرْمِذِي | তিরমিযী | Tirmidhi |
| ر | র্ | r | رَحْمَان | রাহ্‌মান | Rahman |
| ز | য্ | z | زَكَوة | যাকাহ্ | Zakah |
| س | স্ | s | سُنَّة | সুন্নাহ্ | Sunnah |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ش | শ্ | sh | شهادة | শাহাদাহ | Shahadah |
| ص | ছ্ | s | صَوْم | ছাওম | Sawm |
| ض | দ্ | d | رَمَضَان | রামাদান | Ramadan |
| ط | ত/ত্ | t | طَهَارَة | তাহারাহ | Taharah |
| ظ | য্ | z | ظُهْر | যুহ্‌র | Zuhr |
| ع | ' | ' | عَصْر | 'আছর | 'Asr |
| غ | গ্ | gh | مَغْرِب | মাগ্‌রিব | Maghrib |
| ف | ফ্ | f | فَاطِمَة | ফাতিমাহ | Fatimah |
| ق | ক্ | q | قُرْآن | কুর'আন | Quran |
| ك | ক্ | k | كَعْبَة | কা'বাহ | Ka'bah |
| ل | ল্ | l | لُقْمَان | লুক্‌মান | Luqman |
| م | ম্ | m | مُوسَى | মূসা | Musa |
| ن | ন্ | n | نُوْح | নূহ | Nuh |
| و | ও/ওয়/ভ্ | w | قَوْل | কাওল | Qawl |
| | | | وَحى | ওয়াহী | Wahi |
| | | | تَكْوِيْر | তাক্‌ভীর | Takwir |
| ه | হ্ | h | اِبْرَاهِيْم | ইব্‌রাহীম | Ibrahim |
| ى | য় | y | يَاسِيْن | ইয়াসীন | Yasin |
| ة | ত্/হ্ | t/h | فَاطِمَة | ফাতিমাহ | Fatimah |
| | | | فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء | ফাতিমাতুয্ যাহরা' | Fatimatuzzahra' |
| ء | ' | ' | بِئْر | বি'র | Bi'r |
| ـَ (ফাৎহা/Fathah) | া | a | رَجَب | রাজাব | Rajab |
| اَ | া | a | دَاوُد | দাঊদ | Dawud |
| ـِ (কাসরাহ/kasrah) | ি | i | جِنّ | জিন | Jinn |
| ىِ | ী | i | خَدِيْجَة | খাদীজাহ | Khadijah |
| ـُ (দাম্মাহ/dammah) | ু | u | جُمُعَة | জুমু'আহ | Jumu'ah |
| وْ | ৌ | aw | نُوْح | নূহ | Nuh |
| ىْ | ই/য় | ai | سُلَيْمَان | সুলাইমান | Sulaiman |

# হিজরী তারিখ প্রসঙ্গ

হিজরী বর্ষপঞ্জী তথা ইসলামী বর্ষপঞ্জী হচ্ছে একটি চান্দ্র বর্ষপঞ্জী যা চন্দ্রের আবর্তন বা চন্দ্রকলার ওপর ভিত্তিশীল। ইসলামী চান্দ্রবর্ষে মাসের সংখ্যা ১২ এবং দিনের সংখ্যা সাধারণতঃ ৩৫৪–সৌরবর্ষের তুলনায় ১১দিন কম। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হিজরতের বছর ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ইসলামী চান্দ্রবর্ষ বা হিজরী সাল গণনা করা হয়। তাই ৬২২ খৃষ্টাব্দ হচ্ছে ইসলামী বর্ষপঞ্জীর প্রথম বছর বা ১ম হিজরী সাল।

## হিজরী সালকে খৃস্টাব্দে পরিণত করার পদ্ধতি

নিম্নলিখিত ফর্মূলার সাহায্যে হিজরী সালকে খৃস্টাব্দে পরিণত করা যায় ঃ

হিজরী সাল x ৩২/৩৩ + ৬২২ = খৃষ্টাব্দ

উদাহরণ ঃ ১৪২১ হিঃ = ১৪২১ x ৩২/৩৩ + ৬২২ = ২০০০ খৃষ্টাব্দ (মোটামুটি)

## খৃস্টাব্দকে হিজরী সালে পরিণত করার পদ্ধতি

নিম্নলিখিত ফর্মূলার সাহায্যে খৃস্টাব্দকে হিজরী সালে পরিণত করা যায় ঃ

(খৃস্টাব্দ - ৬২২) x ৩৩/৩২ = হিজরী সাল

উদাহরণ ঃ ২০০০ খৃঃ = (২০০০–৬২২) x ৩৩/৩২ = ১৪২১ হিঃ (মোটামুটি)

## ইসলামী বর্ষপঞ্জীর মাসসমূহ

ইসলামী বর্ষপঞ্জীর ১২ মাসের নাম যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ মুহার্‌রাম, সাফার, রাবী'উল আউআল, রাবী'উল্ আখির, জুমাদাল উলা, জুমাদাল আখিরাহ্‌, রাজাব, শা'বান, রামাদান, শাওয়াল, যূল-কাদাহ ও যূল-হিজ্জাহ।

## কুর'আনের উদ্ধৃতি

এই বইতে কুর'আন মজীদের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সূত্র নির্দেশ করতে গিয়ে সূরাহর নাম, সূরাহ্‌-নম্বর ও আয়াত-নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ (সূরাহ আল্-বাকারাহ–২ ঃ ১৮৬) এর মানে সূরাহ আল-বাকারাহ–যার ক্রমিক নং ২ এবং আয়াত নং ১৮৬।

# উৎসর্গ
# ও
# দু'আ

আমি আমার এ বইকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার সেই সব মুখ্‌লিছ (একনিষ্ঠ) বান্দাহ্‌দের, বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি যারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে তাদের যা কিছু আছে তা-ই কুরবানী  করার জন্য স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্!
হে আমার স্রষ্টা, মালিক ও রব!
হে আমার সকল কাজের পর্যবেক্ষক!
আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, অনুনয় করছি,
দু'আ করছি, আমার এ আন্তরিক প্রয়াসকে কবুল কর,
আর এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের হেদায়াতের
নূরের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য কর,
আর শেষ বিচারের দিনে আমাকে ক্ষমা কর
যেদিন তোমার দয়া ও রহমত ছাড়া
কোন কিছুই উপকারে আসবে না।
আমিন।

(পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে)

# ইসলাম ঃ পরিচিতি

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম হচ্ছে সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে গোটা মানব জাতির জন্যে পাঠানো হেদায়াত (পথনির্দেশ)। মানুষ তার সারা জীবনে যা কিছু করে তার সব কিছুই এর আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ও অন্যান্য প্রাণী-প্রজাতির মধ্যে আমাদের অবস্থান বা মর্যাদা সম্বন্ধে ইসলাম আমাদেরকে অবগত করে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তৎপরতাসহ আমাদের সকল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মতৎপরতা পরিচালনার সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন করে।

'ইসলাম' একটি আরবী শব্দ যার মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। আত্মসমর্পণ মানে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে মেনে নেয়া। আর আনুগত্য মানে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করা। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁর আনুগত্য আমাদের জীবনে শান্তি নিয়ে আসে। আর 'ইসলাম' শব্দের মানেও 'শান্তি'। যে ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে ও তার ভিত্তিতে আমল করে সে-ই মুসলমান।

'আল্লাহ্' আরেকটি আরবী শব্দ। এ শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার মূল নাম। মুসলমানরা মহান সৃষ্টিকর্তাকে বুঝাবার জন্যে 'ঈশ্বর', 'সদাপ্রভু' বা ইংরেজী God-এর পরিবর্তে 'আল্লাহ্' শব্দ ব্যবহারকেই বেশী পছন্দ করে। কিন্তু 'আল্লাহ্' মানে 'মুসলমানদের God' নয়, যদিও কিছু লোক এরূপ ভুল ধারণা করে থাকে। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মহান

সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং এ নামটি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা সকলের ও সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি এক অতুলনীয় সত্তা; তাঁর কোন পুত্র-কন্যা নেই। মুসলমানদের জন্যে যে কোন কাজ 'বিসমিল্লাহ্' বলে শুরু করা কর্তব্য; এর মানে "আল্লাহ্‌র নামে"।

ইসলাম হচ্ছে শান্তি ও সুন্দরভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা। আমরা চারদিকে তাকালে দেখতে পাই, সব কিছু– চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি, সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত ও বিশালায়তন মহাসাগরসমূহ এক অপরিবর্তণীয় আইন মেনে চলছে; তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আইন। আমরা এ সবের মধ্যে কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা দেখতে পাই না। সব কিছুই যথাস্থানে রয়েছে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় নিখুঁত শৃঙ্খলা ও চমৎকার সমন্বয় দেখতে পাচ্ছি। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। চাঁদ ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি রাতের বেলা আলো দেয়। রাত চলে যায়, আরেকটি নতুন দিনের আগমন ঘটে, এভাবেই চলতে থাকে। বসন্তকালে ফুল ফোটে এবং গাছপালা সবুজ পত্রপল্লবে ছেয়ে যায়। সব কিছুর জন্যই সুনির্ধারিত নিজস্ব গতিপথ ও পরিণতি বা জীবনচক্র রয়েছে, যার লঙ্ঘন বা ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

তোমরা কি কখনো এই সব প্রাকৃতিক বস্তু কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার আইনের লঙ্ঘন হতে দেখেছ? না, কক্ষনো না । কেন? কেবল এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী শান্তি দেখতে পাই। কিন্তু মানুষের বিষয়টি আলাদা, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ভাল ও মন্দের মধ্য থেকে যে কোনটিকে বেছে নেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, যেহেতু মানুষ ভুলে যায় ও ভুল করে সেহেতু তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য একের পর এক নবী-রাসূলগণকে(আঃ) তাঁর কিতাবসহ পাঠিয়েছেন এবং এভাবে ভুলে যাওয়া বিষয়গুলোকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ বাণীবাহক (রাসূল) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং সর্বশেষ কিতাব আল্-কুর'আন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করতে প্রাকৃতিকভাবে আমাদেরকে বাধ্য করেন নি। তাঁর আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কেন? কারণ, তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। এ পরীক্ষার পরে একটি 'পুরস্কার ও শাস্তির দিন' আসবে। এটিই হচ্ছে শেষ বিচারের দিন (ইয়াওমুদ্দীন)। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে জান্নাতে (বেহেশ্‌তে) চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অকৃতকার্য হবে তাদেরকে জাহান্নামে (দোজখে) ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে এ পুরস্কার লাভ করতে ও শাস্তি থেকে বাঁচতে পারি।

আমরা জানি যে, সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান, কারণ, কোন কিছুই কখনোই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বরখেলাফ করে না। চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা এবং স্থলভাগ ও সমুদ্রে বিচরণকারী প্রাণীকুল–কোন কিছুই বা কেউই আল্লাহ্‌র

আনুগত্যের ব্যতিক্রম কিছু করতে পারে না। তারা ঠিক তা-ই করে যা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের কোন স্বাধীনতা নেই।

এ ক্ষেত্রে কেবল মানুষ ও জিন্ই হচ্ছে ব্যতিক্রম। (জিন্ একটি অদৃশ্য প্রজাতি) তাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করবে কি করবে না সে সর্ম্পকে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে ও তা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে আমাদের নিকট যে হেদোয়াত পাঠিয়েছেন। আমরা যদি তার অনুসরণ করি তাহলে আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি অবশ্যই সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানুষের মূল প্রকৃতি অনুযায়ী সকল মানুষই যা কিছু ভাল তা পছন্দ করে, আর যা কিছু মন্দ তা অপছন্দ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সকলেই সত্যবাদিতা পছন্দ করি ও মিথ্যাকে ঘৃণা করি। এমন কি একজন মিথ্যাবাদীও মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত বা পরিচিত হওয়া পছন্দ করে না। কেন? কারণ, আমরা আমাদের অন্তরে জানি যে, মিথ্যা বলা একটি মন্দ কাজ। একইভাবে, অন্যদের সাহায্য করা, দয়া করা, ভদ্রতা-নম্রতা, পিতামাতা ও শিক্ষকদেরকে সম্মান করা, সততা ও অন্য সমস্ত ভাল আচরণ সব সময়ই পছন্দনীয়। অন্যদিকে রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার, অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া, পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের প্রতি অসম্মান, কাউকে গালি দেয়া বা কারো নাম বিকৃত করণ এবং অন্যান্য খারাপ আচরণকে সকলেই অপছন্দ করে।

**ইন্নাদ্দীনা 'ইন্দাল্লাহিল্ ইসলাম।**

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।" (সূরাহ আলে 'ইমরান- ৩ : ১৯)

তাই আমরা বলতে পারি যে, মানবপ্রকৃতি যা-কিছু ভাল তাকে পছন্দ করে এবং যা-কিছু মন্দ তাকে অপছন্দ করে। আরবী ভাষায় – কুর'আনের ভাষায় – ভাল কাজকে 'মা'রূফ' (مَعْرُوْف) ও মন্দ কাজকে 'মুন্‌কার্' (مُنْكَر) বলা হয়।

এছাড়া মানব প্রকৃতি শান্তিকে ভালবাসে এবং বিশৃঙ্খলাকে ঘৃণা করে। আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলার ফলেই শান্তি আসে, আর আল্লাহ্‌র আইন অমান্য করার ফলেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ শান্তি মানব প্রকৃতিরই অংশবিশেষ; ইসলাম এ শান্তিই প্রতিষ্ঠা করে। একারণেই ইসলামকে প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়; আরবী ভাষায় বলা হয় (دِيْنُ الْفِطْرَة) দীনুল্ ফিৎরাহ্ ।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও পাপাচার উৎখাতের জন্যে আহ্বান জানায়। অন্যায় ও পাপাচারের উৎখাত এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার এ যৌথ প্রচেষ্টাকে 'জিহাদ' বলা হয়। (جِهَاد) 'জিহাদ' মানে, সমাজে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমাজ থেকে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। জিহাদের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। পরে এ বইতে তোমরা জিহাদ সম্বন্ধে আরো জানতে পারবে।

## মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় কাজ করা ও তাঁর আদেশ পালন করার জন্যেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির নিকট পাঠানো তাঁর সর্বশেষ কিতাব কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

"আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার 'ইবাদাত্ করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" (সূরাহ আয্‌যারিয়াত–৫১ ঃ ৫৬)

এ আয়াতে 'ইবাদাত্ মানে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পুরোপুরি মেনে চলা। কুর'আন মজীদে আল্লাহ্‌র বন্দেগী বা আরাধনা বুঝাতে 'ইবাদাত্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যত ভাল কাজ করি তা যদি আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য করি তবে তা সবই 'ইবাদাত বলে গণ্য হবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

বস্তুতঃ 'ইবাদাত্ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে ও পরলোকের জীবনে সাফল্য ও সুখ-শান্তি অর্জনের একমাত্র পন্থা।

# ইসলাম বা 'মোহামেডানিজ্‌ম্'

অনেক সময় ভুলবশতঃ (বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায়) ইসলামকে 'মোহামেডানিজ্‌ম্' ও মুসলমানদেরকে 'মোহামেডান' বলে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে সেসব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের নামে অথবা যে সম্প্রদায়ের মাঝে ধর্মটি বিকাশ ও বিস্তারলাভ করেছে তার নামে। উদাহরণস্বরূপ, যীশূ খৃষ্টের (হযরত ঈসা আঃ-এর) নামে খৃস্টধর্মের, বুদ্ধের নামে বৌদ্ধ ধর্মের ও ইয়াহূদার নামে ইয়াহূদী ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নামে ইসলামের নামকরণ করা হয় নি। বরং 'ইসলাম' হচ্ছে সকল নবী-রাসূল (আঃ)-এর মাধ্যমে পাঠানো হেদায়াতের নাম; এই নবী-রাসূলগণের (আঃ) প্রথম হচ্ছেন হযরত আদম (আঃ) ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

'ইসলাম' ও 'মুসলিম' হচ্ছে কুর'আন মজীদে ব্যবহৃত শব্দ। কুর'আন মজীদে এরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامُ-

-"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।" (সূরাহ আলে 'ইমরান- ৩ ঃ ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَ فِىْ هٰذَا-

-"তিনি (আল্লাহ্) ইতিপূর্বেই তোমাদেরকে 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (কুর'আনেও)।" (সূরাহ আল্-হাজ্জ-২২ ঃ ৭৮)

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই (আঃ) একই বাণী প্রচার করেন। তা হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, অন্য কারো নয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে পাঠানো এ বাণী সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। কুর'আন মজীদে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلَامَ دِيْنًا-

–"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার দানকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করে দিলাম।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ– ৫ ঃ ৩ )

তাই ইসলামকে 'মোহামেডানিজ্‌ম্' ও মুসলমানকে 'মোহামেডান' বলে অভিহিত করা একটি ভুল কাজ।

## অনুশীলনী (এক ঃ ক)

## ৫ম - ৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১) 'ইসলাম' বলতে কি বুঝ?

২) 'ধর্ম' শব্দে 'ইসলাম' শব্দের পুরো অর্থ নিহিত নেই কেন? ব্যাখ্যা কর।

৩) তোমার মতে ইসলাম কিভাবে শান্তি নিয়ে আসে?

৪) তোমার মতে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করতে আমাদেরকে কেন বাধ্য করেন না?

৫) সত্যিকার অর্থে– 'মুসলমান' কাকে বলে?

৬) "প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় রয়েছে" – একথার দ্বারা আমরা কি বুঝাতে চাই?

৭) 'ইবাদাত-এর কতক দৈনন্দিন উদাহরণ দাও।

৮) নিম্নলিখিত আরবী শব্দগুলোর অর্থ কি?

(ক) ইসলাম إِسْلَامٌ (খ) 'ইবাদাত্ عِبَادَةٌ (গ) মা'রূফ্ مَعْرُوْفٌ
(ঘ) মুন্‌কার্ مُنْكَرٌ

## ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১) 'ইসলাম' বলতে কি বুঝ?

২) সত্যিকার অর্থে– 'মুসলমান' কাকে বলে?

৩) আল্লাহ্ তা'আলা কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?

৪) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন এবং কেন দিয়েছেন?

৫) ইসলামকে 'দীনুল্ ফিৎরাহ্' বলা হয় কেন?

৬) কেবল মুসলিম নামের অধিকারী হলেই তা একজন মানুষকে মুসলিমে পরিণত করে না কেন? এক অনুচ্ছেদের মধ্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

৭) ইসলামকে 'মোহামেডানিজম্' বলা ঠিক নয় কেন? তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৮) ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল ভাবধারার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। কেন এ জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনযাপনের চেষ্টা করা উচিত?

৯) প্রকৃতি ও তার কর্মধারার পর্যবেক্ষণ কিভাবে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নির্দেশ

করে – এ সম্বন্ধে আলোচনা কর। তোমার উত্তরের ব্যাখ্যায় কুর'আন মজীদের আয়াত ব্যবহার কর।

## একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১) "আধুনিক বিশ্বে সঠিক ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ।" প্রযুক্তির অগ্রগতি ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধানের প্রেক্ষাপটে এ উক্তিটি নিয়ে আলোচনা কর।

২) "বেঁচে থাকা মানে অব্যাহত আত্মসমর্পণ। অনেকে আনন্দবাদের বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে, আর অনেকে ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আমরা সকলেই কোনকিছুর নিকট আত্মসমর্পণ করে আছি, তবে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার অধিকারী।" ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

# বুনিয়াদী বা মৌলিক বিশ্বাসসমূহ

**ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হচ্ছে ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | আল্লাহ্ | |
| ২) | আল্লাহ্র ফেরেশ্তাগণ | (মালায়িকাহ) |
| ৩) | আল্লাহ্র কিতাবসমূহ | (কুতুবুল্লাহ) |
| ৪) | আল্লাহ্র রাসূলগণ | (রুসুলুল্লাহ) |
| ৫) | বিচারদিবস | (ইয়াওমুদ্দীন) |
| ৬) | ভাগ্যনির্ধারণ | (আল্কাদ্র) |
| ৭) | মৃত্যুপরবর্তী জীবন[1] | (আখিরাহ) |

'ঈমানে মুফাছ্ছাল' (اَلايْمَانُ الْمُفَصَّلْ) (বিস্তারিত ঈমান) - এ মৌলিক বিশ্বাসসমূহের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ
وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

(আমান্তু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আখিরি ওয়াল কাদ্রি খাইরিহি ওয়া শার্রিহি মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল্ বা'ছি বা'দাল্ মাওত্।)

–"আমি ঈমান পোষণ করি আল্লাহ্তে, তাঁর ফেরেশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলগণে, শেষ দিবসে (বিচারদিবসে), সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভালমন্দ সবকিছু নির্ধারিত হওয়াতে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে।"

এ সাতটি বিশ্বাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

---

১। কোন কোন গ্রন্থে মৌলিক বিশ্বাস ছয়টি উল্লিখিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'বিচারদিবসে'কে 'মৃত্যুপরবর্তী জীবন '-এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| তাওহীদ | (আল্লাহ্‌র একত্ব ও এককত্ব) | تَوْحِيْد |
| রিসালাহ | (নবী-রাসূলদের পয়গাম) | رِسَالَة |
| আখিরাহ | (মৃত্যুপরবর্তী জীবন) | اٰخِرَة |

তাওহীদ, রিসালাহ ও আখিরাহ-তে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইসলামী জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই এ সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে হবে।

## তাওহীদ تَوْحِيْد

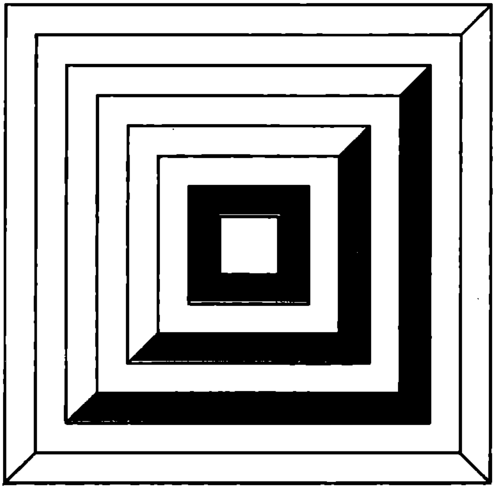

আল্লাহ্‌

তাওহীদ মানে আল্লাহ্‌র একত্ব। এটা হচ্ছে ঈমানের (ইসলামে বিশ্বাসের) প্রধান অংশ। কুর'আন মজীদের সূরাহ ইখ্‌লাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ-

–"বল, তিনিই আল্লাহ্‌; তিনি এক। আল্লাহ্‌ চিরন্তন, অবিনশ্বর। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তিনি জন্ম নেন নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরাহ আল-ইখলাছ্‌–সূরাহ নং–১১২)

ইসলামের বিশ্বাসসমূহের মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাওহীদ মানে পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি। তিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে লালন পালন করেন এবং তিনি আমাদের হেদায়াতের একমাত্র উৎস।

তাওহীদ মানে হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার সকল ক্ষমতাসহ তাঁর ওপরে বিশ্বাস পোষণ করা। আল্লাহ্‌ তা'আলা পরম জ্ঞানময় ও সর্বশক্তিমান। তিনি পরম দয়াময়, মেহেরবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমময়। তিনি সদাসর্বদা আমাদের সাথে আছেন। তিনি আমাদেরকে দেখছেন যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-কন্যা নেই, বা তিনি কারো মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনিই আমাদেরকে জীবন দান করেন এবং আমাদের জীবন নিয়ে নেন (আমাদেরকে মৃত্যু দেন)। মৃত্যুর পরে সকলকেই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।

একজন মুসলমানের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তার ঈমানের ঘোষণা দেয়া। এ ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে মুখে বলতে হবে ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই; মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর রাসূল।) এই আরবী বাক্যটি উচ্চারণকে শাহাদাহ (ঈমানের ঘোষণা) বলা হয়। এ ঘোষণার দু'টি অংশ ঃ (১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (২) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

প্রথম অংশের অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র দু'টি দিক রয়েছে। একটি দিক নেতিবাচক, অপর দিকটি ইতিবাচক। 'লা ইলাহা' হচ্ছে নেতিবাচক দিক, আর 'ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে ইতিবাচক দিক।

একজন ঈমানদারকে অবশ্যই প্রথমে তার অন্তরকে অন্য যে কোন দেবদেবী বা উপাস্য থেকে এবং অন্য যেকোন পূজার বস্তু থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। কেবল তখনই তার অন্তরে আল্লাহ্‌র একত্বের বিশ্বাস মযবূত হতে পারে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষযটি বুঝার চেষ্টা করতে পারি। মনে কর আমাদের এক খণ্ড জমি আছে; জমিটি আগাছা ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। আমরা এ জমিটিতে ধানের চাষ করতে চাই। এখন আমরা যদি জমিটির আগাছা ও লতাগুল্ম পরিস্কার না করেই সেখানে খুব ভাল জাতের ধানের চাষ করি তো আমরা সেখান থেকে ধানের ভাল ফসল আশা করতে পারি না। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদেরকে অবশ্যই জমিটি চাষ করতে হবে, আগাছা ও লতাগুল্ম সাফ করতে হবে এবং ধানের বীজ বপনের আগে জমিটিকে ভালভাবে প্রস্তুত করতে হবে। কেবল তাহলেই আমরা ভাল ফসল আশা করতে পারি।

আমরা এ জমিটিকে মানুষের অন্তরের সাথে তুলনা করতে পারি। মানুষের অন্তর যদি মিথ্যা মাবুদের বা মিথ্যা খোদার ওপরে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে তো আমরা সেখানে তাওহীদ মযবূত হওয়ার আশা করতে পারি না। অতএব, অন্তরকে অবশ্যই অন্য মাবুদ,

যে কোন দেবদেবী বা পূজার বস্তু থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। কেবল তখনই হৃদয়ে তাওহীদ মযবূত হবে ও ঈমানের জ্যোতিতে তা আলোকিত হবে।

তাওহীদ আমাদের গোটা জীবনধারাকে গড়ে তোলে ও প্রভাবিত করে। এ কারণেই আমাদের জন্য তাওহীদের অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানা জরুরী।

নিখুঁত নিয়মশৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনাসহ এই বিশাল ও জমকালো মহাবিশ্ব সুস্পষ্টভাবে এটাই বুঝাচ্ছে যে, এসবের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী রয়েছেন।

আমরা যখন এ বিশ্বলোকের চমৎকার ব্যবস্থা ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন আমরা দেখতে পাই যে, এতে কোন বিশৃঙ্খলার অস্তিত্ব নেই। সূর্য, চন্দ্র ও ছায়াপথ একই সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে চলেছে। গোটা ব্যবস্থায়ই পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিদ্যমান। প্রতিটি বস্তুকেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে সঠিক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে। এর কোন কিছু সম্পর্কেই "আরো উন্নত করা যেত"– এমন কথা বলার কোন সুযোগ নেই এবং কোথাও কোন খুঁত নেই। শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের এই জমকালো ও পূর্ণাঙ্গ সমাহার একজন সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও পরিচালকের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। (সূরাহ আল্-মূল্ক– ৬৭ ঃ ৩-৫)

উদাহরণস্বরূপ, গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের যদি একাধিক স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী থাকত তাহলে অবশ্যই সংঘাতের সৃষ্টি হত ও তার পরিণতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কিন্তু বিশ্বজগতে আমরা এ ধরনের কোন বিশৃঙ্খলা দেখতে পাই না। একটি বিদ্যালয়ের ভালভাবে পরিচালনা এবং একটি গাড়ী বা জাহাজের সঠিকভাবে পথ চলার জন্য একজন প্রধান শিক্ষক বা একজন চালক বা একজন ক্যাপ্টেনের প্রয়োজন। একই সময়ে একটা গাড়ীকে যেমন একাধিক চালক চালাতে পারে না ঠিক সেভাবেই একটি প্রতিষ্ঠান একাধিক নেতার নেতৃত্বে সমস্যাহীনভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে গঠিত এ বিশ্বজগত একটি একক জগত। এর প্রতিটি অংশেরই অভিন্ন উৎস ও অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে। কেননা একজন সর্বশক্তিমান সত্তা এ বিশ্বজগতকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই একটি মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত এ বিশ্বলোকের সবকিছুই পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতা সহকারে কর্মতৎপর রয়েছে। মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু তারা একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে, তা হচ্ছে, শরীরকে ঠিক রাখা ও ঠিকমত কাজ করতে সাহায্য করা।

## মানবজীবনে তাওহীদের প্রভাব

আমাদের জীবনের ওপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বা তাওহীদে বিশ্বাসের সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে।

(ক) একজন তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করে এবং তাঁর খাঁটি বান্দাহ্ ও প্রজায় পরিণত হয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। একজন মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধের নিকট সমর্পণ করে তখন সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই তার কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন।

কুর'আন মজীদে একথাই বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِىْ الاَرْضِ-

-"তুমি কি দেখ নি যে, আল্লাহ্ পৃথিবীর সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন?" (সূরাহ আল্-হাজ্জ- ২২ ঃ ৬৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন :

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِىْ السَّمٰوَاتِ وَمَا فِىْ الاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً -

-"তোমরা কি দেখ নি যে, যা কিছু আসমানে আছে ও যা কিছু যমীনে আছে আল্লাহ্ তার সবকিছুকেই তোমাদের অধীন বানিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নে'আমতসমূহ তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন?" (সূরাহ লুকমান- ৩১ ঃ ২০)

এ দু'টি আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনের প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকে মানুষের খেদমত ও কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তবে অন্যান্য বস্তু ও প্রাণী আমাদের অধীন হয়ে তখনই আমাদের অধিকারে আসবে যখন আমরা তাওহীদে বিশ্বাস করব এবং তার ভিত্তিতে আমল করব। অর্থাৎ আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হতে হবে।

(খ) তাওহীদে বিশ্বাস ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে অত্যন্ত উঁচু স্তরের আত্মসম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে। কারণ সে জানে যে, সে তার অভাব-অভিযোগ ও

প্রয়োজন পূরণের জন্যে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ওপরই নির্ভরশীল নয়। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তার সকল প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে এবং তিনি ছাড়া আর কারোই তার কল্যাণ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই।

একজন ঈমানদার কখন আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মসম্মানবোধের অধিকারী হতে পারে? যখন সে অনুভব করে যে, সে তার প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য একমাত্র তার স্রষ্টা ছাড়া আর কারো ওপরই নির্ভরশীল নয় কেবল তখনই সে এর অধিকারী হতে পারে। সে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না। কারণ সে জানে যে, সে সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র অনুগত বান্দাহ্ হয়ে থাকলে আল্লাহ্ই তার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন।

(গ) তাওহীদের বিশ্বাস ঈমানদার ব্যক্তিকে বিনয় ও নম্রতার অধিকারী করে। সে কখনোই উদ্ধত ও অহঙ্কারী হয় না। সে সব সময়ই এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকে যে, পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহ্র এবং কেবল আল্লাহ্ তা'আলার একজন প্রজা হিসেবেই সে অন্যান্য সৃষ্টির ওপরে নিয়ন্ত্রণ লাভের অধিকারী। সে খুব ভালভাবে এ-ও জানে যে, তার যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহ্র। তাই তার উদ্ধত বা অহঙ্কারী হবার কোন কারণ নেই।

(ঘ) তাওহীদে বিশ্বাস একজন ঈমানদারকে কর্তব্যপরায়ণ, সৎ ও ন্যায়পরায়ণে পরিণত করে। ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে, ইহকাল ও পরকালীন জীবনে সাফল্যের অধিকারী হতে হলে তাকে অবশ্যই তার স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমল করতে হবে। এ সচেতনতা তাকে কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যান্য পাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

(ঙ) তাওহীদে বিশ্বাস ব্যক্তিকে সাহসী করে তোলে। এ বিশ্বাস তার মন থেকে মৃত্যুর ভয় ও নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ দূর করে দেয়। সে জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সুনির্দিষ্ট সময়ে তার মৃত্যু ঘটাবেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউই ঈমানদার ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবে না। তাই সে যদি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে তো তার ভয় করার মত কিছুই নেই। সে কোন রকম ভয়-ভীতি ছাড়াই তার কর্তব্য পালন অব্যাহত রাখে।

(চ) একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী ব্যক্তি সচেতনভাবেই নিজেকে গোটা সৃষ্টিজগতের একটি অংশ বলে মনে করে। সে হচ্ছে সৃষ্টিলোকের সর্বশক্তিমান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এ বিশ্বাস তার মন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে।

(ছ) তাওহীদে বিশ্বাস ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়, ধৈর্য ও অধ্যবসায় সৃষ্টি করে। ঈমানদার ব্যক্তি মনের একাগ্রতার অধিকারী হয় এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে।

একটি নৌকার কথা চিন্তা করে দেখ। নৌকার একটি হাল থাকে যা তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। হাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৌকা তরঙ্গের ওপর দিয়েও অত্যন্ত চমৎকারভাবে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু নৌকাটি যদি হাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে এক একটি তরঙ্গ আসে আর তাকে একেক বার একেক দিকে ছুঁড়ে দেয়। এমন কি উত্তাল তরঙ্গে নৌকাটি ডুবেও যেতে পারে।

একইভাবে, একজন ঈমানদার যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করে তখন সে জীবনের চলার পথে সকল ক্ষেত্রেই নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে না তাকে চাকরি হারানোর ভয়, বিপদাপদের ভয়, ক্ষুধার ভয় এবং এ ধরনের আরো অনেক মিথ্যা খোদার আনুগত্য করতে হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখে তার জীবন এ ধরনের ভয়-ভীতির দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না।

(জ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-তে বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব এই যে, এ বিশ্বাস ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য করে। একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী ব্যক্তি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু জানেন ও দেখেন এবং সে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তার ঘাড়ের শাহ্‌রগের চেয়েও নিকটে অবস্থান করছেন।(আল্-কুর'আন ঃ সূরাহ কাফ্ – ৫০ ঃ ১৬) সুতরাং একজন প্রকৃত ঈমানদার গোপনে বা রাতের অন্ধকারেও কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় না। কারণ, সে এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব সময় সবকিছুই দেখতে পান এবং সব কিছু জানেন।

একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী ব্যক্তি তার ঈমান অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। বস্তুতঃ ইসলামে আমলবিহীন ঈমানের কোন গুরুত্ব নেই।

আমরা মুসলমানরা তাওহীদে বিশ্বাসী। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও প্রজা। তাই আমাদের কাজকর্ম ও আচরণে ঈমানের প্রতিফলন একান্তই জরুরী।

## আল্-কাদ্‌র  اَلْقَدْرُ

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লহ্ তা'আলাই এ বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই বিশ্বলোকের নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গতিধারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন; একে আল্-কাদ্‌র্ বলা হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বাইরে ও তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম কিছুই ঘটতে পারে না। প্রতিটি প্রাণীর শেষ পরিণতিই আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে। (আল-কুর'আন ঃ সূরাহ আল্-ফুরকান– ২৫ ঃ ২, সূরাহ আল্-আহ্‌যাব– ৩৩ ঃ ৩৮)

কিন্তু একথার মানে এ নয় যে, মানুষের কোন ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। আমরা জানি যে, মানুষ হচ্ছে এ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র খালীফাহ্ (প্রতিনিধি)। আমরা আরো জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কোন কাজ করতে বাধ্য করেন না। তাঁকে মেনে চলা বা অমান্য করার বিষয়টি আমাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমরা তাঁকে মানব, কি মানব না তা তিনি জানেন। কিন্তু আমরা কি করতে যাচ্ছি তা আল্লাহ্‌র জানা থাকার কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ব্যাহত হয় না। মানুষ জানে না তার পরিণতি কি হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা জানেন। মানুষের চলার পথ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ হস্তক্ষেপ করেন না। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন।

শেষ বিচারের দিনে আমাদের নিয়্যতের (মানসিক সিদ্ধান্তের) ভিত্তিতে আমাদের বিচার করা হবে। আমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া হেদায়াত অনুসরণ করি তাহলে আমাদের পুরস্কার দেয়া হবে, অন্যথায় আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

আল্-কাদ্‌রে বিশ্বাস স্থাপন করে কার্যতঃ আমরা এ মর্মে সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর সৃষ্ট বিশ্বজাহানের সবকিছুর ও সকল কাজের নিয়ন্ত্রণকারী। কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তা তিনিই নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে অবগত আছেন। এর মানে এ নয় যে, আমরা যা করতে চাই তা-ই করতে পারব, যেন আমাদের ক্ষেত্রে যা-ই ঘটুক তাতে কিছুই আসে যায় না। বরং আমাদেরকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া হেদায়াতের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। আমরা ভাল-মন্দ বেছে নিতে পারি। পৃথিবীর বুকে আমরা যে কাজ করছি তার ভিত্তিতে শেষ বিচারের দিনে আমাদের বিচার করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন। তাই একমাত্র তিনিই সঠিকভাবে তাঁর প্রজাদের অর্থাৎ মানুষ ও জীনের বিচার করতে পারেন। তিনি মানব-জাতিকে তাঁর দেয়া হেদায়াত অনুসরণ করতে বলেছেন। কারণ, তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সাফল্যের জন্যেই এ জীবনবিধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাকে পুরস্কার দেয়া হবে আর কাকে দেয়া হবে না তা পুরোপুরি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের ওপরই নির্ভর করে।

কার ভাগ্যে কি ঘটবে আল্লাহ্ তা'আলা তা অবগত আছেন, কিন্তু আমরা অবগত নই। এই ভবিষ্যদ্জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর (ছিফাত্) অন্যতম।

অনেক সময় এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয় আমাদের দৃষ্টিতে যার কোন অর্থ নেই বলে মনে হয়। প্লাবন, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি কেন সংঘটিত হয়? কেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষ অনাহারে মারা যায়? মানুষ কেন দুঃখ-কষ্টে ভোগে? কি কারণে একজন মানুষ ভাল হয় এবং আরেকজন মানুষ অপরাধী হয়?

আমরা এসব প্রশ্নের সবগুলোর উত্তর জানি না। বিশ্বজগত সম্বন্ধে আমাদের খুব অল্পই জানা আছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুই জানেন। আমরা যেসব সমস্যা মোকাবিলা করি বা যেসব খারাপ ঘটনা ঘটতে দেখি সেজন্য আমরা যদি আল্লাহ্কে দোষারোপ করি তো ভুল করব। কেননা আমরা এসবের পিছনে নিহিত কারণ জানি না।

আমাদের অবশ্যই সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার ওপর দৃঢ় ঈমান বা বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলীর অনেক কিছুই বুঝার ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই এবং আমরা যা কিছু করছি তা করতে আমরা বাধ্য– এ ধরনের যুক্তি দেখানো একান্তই অর্থহীন। আমরা কি করব ও কি করব না সে ব্যাপারে আমরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাই আমরা আমাদের নিজেদের কাজের জন্য দায়ী। আমাদের কাজ-কর্মের এ স্বাধীনতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ভবিষ্যদ্জ্ঞানের কোন বৈপরীত্য নেই।

## অনুশীলনী (এক : খ)

### ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১) বইয়ের এ অধ্যায়ের শুরুতে অঙ্কিত ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের ছকটি ভাল করে দেখ। এবার একজন মুসলমানের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ তুলে ধরার জন্য তোমার নিজস্ব একটি ছক তৈরী কর।

২) নিম্ন লিখিত আরবী শব্দগুলোর অর্থ কি?
(ক) মালায়িকাহ (খ) কুতুবুল্লাহ (গ) রিসালাহ (ঘ) আখিরাহ

৩) 'তাওহীদ' শব্দের অর্থ কি?

৪) সূরাহ আল্-ইখ্লাছের শব্দগুলো মনোযোগসহকারে পড়। এ সূরাহ থেকে তাওহীদ সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৫) বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণকারী কে?

৬) কেন তোমাদের মনে হয় যে, একাধিক স্রষ্টা থাকলে সমস্যার সৃষ্টি হত?

৭) বইয়ের ২৬ নং পৃষ্ঠার ছবিটি ভাল করে দেখে নাও এবং এ ছবিটি কিভাবে তাওহীদের ব্যাখ্যা করে নিজের ভাষায় লিখ।

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১) "তাওহীদে বিশ্বাসের কারণে ব্যক্তির জীবনধারায় পরিবর্তন আসা অপরিহার্য।" এ উক্তিটির ব্যাখ্যা কর এবং তোমার উত্তরকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ কর।

২) "তাওহীদ, রিসালাহ ও আখিরাহ হচ্ছে গোটা ইসলামী জীবনব্যবস্থার সারসংক্ষেপ।" এ উক্তটি নিয়ে আলোচনা কর।

৩) ইসলামের সাতটি মৌলিক বিশ্বাসকে তিনভাগে ভাগ কর এবং এ নিয়ে তোমার নিজের পক্ষ থেকে একটি নকশা অঙ্কন কর।

৪) নিম্নলিখিত শব্দগুলোর প্রতিটির আরবী শব্দ লিখ ঃ
(ক) বিশ্বাস (খ) রাসূলের পয়গাম (গ) একমাত্র এক (ঘ) আল্লাহ্‌র একত্ব
(ঙ) ফেরেশ্‌তা (চ) আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহ (ছ) ঈমানের ঘোষণা

৫) একজন মুসলমানের জীবনে আল্-কাদ্‌র বা তাকদীরে বিশ্বাস এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১) তাওহীদের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিকের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২) "তাওহীদের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে হলে অবশ্যই তার দাবী অনুযায়ী কাজ করতে হবে।" তোমার নিজের ভাষায় এ উক্তির যথার্থতা বর্ণনা কর।

৩) ভাল ও মন্দ কাজ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং আল্-কাদ্‌রের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই- ইসলামের এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যা কর।

## রিসালাহ্ : رسَالَة

রিসালাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যম। মানুষ যাতে পার্থিব জীবনে সঠিক কর্মধারা অনুসরণ করতে পারে এবং এ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী সুখ-শান্তির জায়গায় পরিণত করতে পারে সে উদ্দেশ্যে দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনুসরণের জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাঠিয়েছেন। যারা এ হেদায়াত অনুসরণ করবে তারা মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিরাট পুরস্কার লাভ করবে।

মানবজাতির সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মানবজাতির নিকট তাঁর হেদায়াত পাঠাতে শুরু করেন। তাঁর মনোনীত এই ব্যক্তিদেরকে নবী ও রাসূল (বহুবচনে যথাক্রমে আম্বিয়া ও রুসুল) বলা হয়। তাঁরা নিজ নিজ যুগের লোকদেরকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগী বা 'ইবাদাত করার জন্য আহবান জানান। তাঁরা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনবিধান অনুসরণের জন্য লোকদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং কার্যতঃ পথপ্রদর্শন করেন।

নবী-রাসূলগণ (আঃ) মানুষ ছিলেন। আমাদের কখনোই তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র বলে উল্লেখ করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অনন্য এবং তাঁর কোন অংশীদার, পুত্র বা কন্যা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার কোন পুত্র-কন্যা বা অংশীদার আছে বলে মনে করা ও উল্লেখ করা বিরাট গোনাহ বা পাপ।

সকল নবী-রাসূলের (আঃ) দাওয়াত এক ও অভিন্ন। যেহেতু আল্লাহ্ এক তাই তাঁর বাণীও এক। এ বাণী হচ্ছে ঃ "একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং সকল মিথ্যা খোদাকে বা তাগুত্‌কে পরিত্যাগ কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰا قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ - اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

– "আমরা নূহ্‌কে তার জনগোষ্ঠীর নিকট পাঠালাম। সে বলল ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর; তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করছি।" (সূরাহ আল- আ'রাফ– ৭ ঃ ৫৯)

অন্য কথায়, সব নবী-রাসূলই (আঃ) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্- আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই"- এই বাণী প্রচার করেন।

তোমাদের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়াতের প্রয়োজন কেন? এর জবাব অত্যন্ত সহজ। তা হচ্ছে, আমরা মানব-প্রজাতি অত্যন্ত দুর্বল ও অস্থিরমতি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই এবং আমাদের যে সব বিষয়ে জ্ঞান আছে তা খুবই সীমিত। তেমনি আমরা কেউই পূর্ণতার অধিকারী নই। তোমরা বুঝতেই পারছ যে, এতসব দুর্বলতার কারণে স্বভাবতঃই আমাদের পক্ষে নিজেদের জন্যে এমন কোন পথনির্দেশ রচনা করা সম্ভব নয়, যা সব সময় ও সকল অবস্থায় আমাদের জন্য উপযোগী হতে পারে। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে তাঁর নবীদের (আঃ) মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়াত (পথনির্দেশ) প্রদান করেছেন।

শুধু তা-ই নয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীদের মাধ্যমে আমাদের নিকট তাঁর কিতাবসমূহ পাঠিয়েছেন। (কুর'আন ঃ সূরাহ আল্-বাকারাহ্- ২ ঃ ২১৩, সূরাহ আল্-আ'রাফ্- ৭ ঃ ৫২) এই নবীগণকে (আঃ) রাসূলও বলা হয়। (রাসূল= একবচন, রুসুল্= বহুবচন) কুর'আন হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশেষ হেদায়াতের কিতাব। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে প্রতিটি জাতির নিকট নবী-রাসূল (আঃ) পাঠিয়েছেন। (কুর'আন ঃ সূরাহ ইউনুস- ১০ ঃ ৪৭, সূরাহ আর্-রা'দ্-১৩ ঃ ৭, সূরাহ্ ফাতির-৩৫ ঃ ২৪) পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথে (আছ্-ছিরাতুল মুস্তাকীম-এ) ফিরিয়ে আনার জন্যে যুগে যুগে নবী-রাসূল (আঃ) পাঠানো হয়েছিল।

# আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূলগণ (আঃ) رُسُلُ اللّٰه

আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি উক্তি অনুযায়ী, যুগে যুগে আগত নবী-রাসূলগণের (আঃ) মোট সংখ্যা ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার। কুর'আন মজীদে এদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পঁচিশ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন ঃ

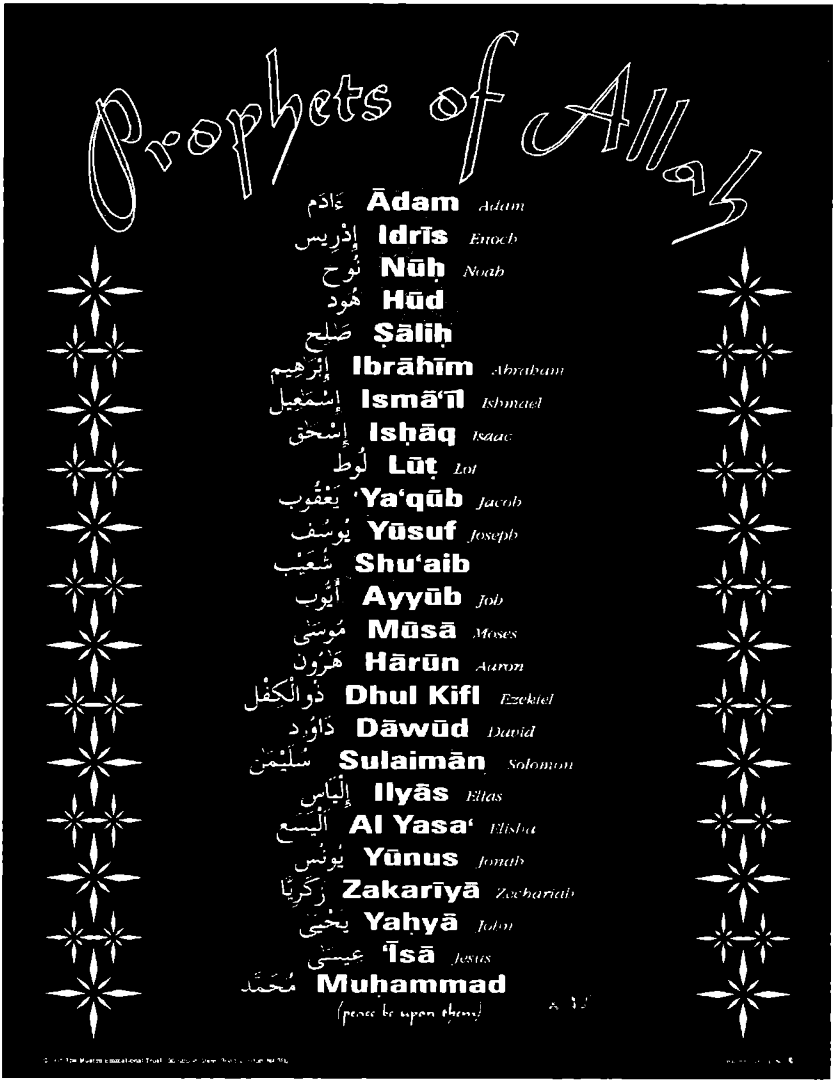

হযরত আদম, হযরত ইদ্রীস্, হযরত নূহ্, হযরত হূদ্, হযরত ছালেহ্, হযরত ইব্রাহীম্, হযরত ইস্মা'ঈল্, হযরত ইস্হাক্ব, হযরত লূত্, হযরত ইয়া'কূব, হযরত ইউছুফ, হযরত শূ'আইব, হযরত আইউব্, হযরত মূসা, হযরত হারূন, হযরত যুল্ কিফ্ল্, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত ইল্ইয়াস্, হযরত আল্-ইয়াসা', হযরত ইউনুস্, হযরত যাকারিয়্যা, হযরত ইয়াহ্ইয়া, হযরত 'ঈসা ও হযরত মুহাম্মাদ (তাঁদের সকলের প্রতি সালাম)।

মুসলমান হিসেবে আমরা সকল নবী ও রাসূলের (আঃ) ওপর ঈমান রাখি। (কুর'আন ঃ সূরাহ আল্-বাকারাহ্– ২ ঃ ২৮৫) হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির নিকট আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়াত পাঠানো শুরু হয় এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে তা সমাপ্ত করা হয়।

## ফেরেশ্তাগণ : الملائكة :

আমরা ইতিমধ্যেই আল্-ঈমান্ আল-মুফাছ্ছালে ফেরেশতায় (মালায়িকাহ্) ঈমানের কথা উল্লেখ করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ফেরেশতা কারা? তারা কি করে? আমরা কি তাদেরকে দেখতে পাই? মানুষ ও তাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ এক ধরনের সৃষ্টি। বিশেষ বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঐশী নূর (জ্যোতি) থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)-কে কাদামাটি থেকে এবং জিন্-প্রজাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়। ইব্লীস্–যে শয়তান হিসাবে পরিচিত– জিন্ জাতিরই সদস্য। অনেক লোক মনে করে যে, ইবলীস ফেরেশতাদের নেতা ছিল। কুর'আন মজীদের বক্তব্য অনুযায়ী এ ধারণা ঠিক নয়। (আল্-কুর'আন্ ঃ সূরাহ আল্-কাহ্ফ–১৮ ঃ ৫০)

ফেরেশতাদেরকে যেসব কাজ সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাদেরকে সে জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই। তারা সব সময়ই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করে, তাদের তাঁর হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে এবং তারা স্বেচ্ছায় ভালপথ বা মন্দপথ বেছে নিতে পারে। এ কারণেই শেষ বিচারের দিনে মানুষকে তার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে যে হুকুম দেন তারা তা পালন করে। তারা হচ্ছে আল্লাহ্র ইচ্ছা কার্যকর করার জন্যে সৃষ্ট পাপমুক্ত বান্দাহ্। তারা মানুষকে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা কার্যকর করতে সাহায্য করে। মানুষ কি করবে সে সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ফেরেশ্তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদের এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সাহায্য করে।

ফেরেশতাদের অন্যতম করণীয় হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার গুণগান, প্রশংসা ও তা'রীফ করা। তারা কখনোই ক্লান্ত হয় না। তারা আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাদের নিদ্রার প্রয়োজন নেই, বা মানুষের জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন তাদের জন্যে তার প্রয়োজন নেই।

মানুষের আকৃতি ধারণ করে আমাদের সামনে উপস্থিত না হলে আমরা ফেরেশ্তাদেরকে দেখতে পাই না। জিবরাইল ফেরেশ্তা একবার হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ছাহাবীগণের এক সমাবেশে তাঁদের সামনে মানুষের বেশে হাযির হয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই জানতেন যে, তিনি একজন ফেরেশ্তা। ফেরেশ্তাগণ, তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সুবিধাজনক যেকোন আকৃতি ধারণ করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন রাজত্বে অসংখ্য ফেরেশ্তা রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য ফেরেশ্তাগণ হচ্ছেন ঃ

**জিব্রাঈল বা জিব্রীল্ (আঃ)** جِبْرَائِيْل/جِبْرِيْل

**মিকাঈল বা মীকাল্ (আঃ)** مِكَائِيْل/مِيْكَال

**'ইয্রাঈল বা 'আয্রাঈল (আঃ)** عِزْرَائِيْل (مَلَكُ الْمَوْت)
(মৃত্যুর ফেরেশ্তা)

**ইস্রাফীল (আঃ)** اِسْرَافِيْل

জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট এবং অন্য সকল নবী-রাসূলের (আঃ) নিকট আল্লাহ্ তা'আলার ওহী নিয়ে আসেন। 'ইযরাঈল বা 'আয্রাঈলকে (আঃ) মালাকুল মাওত্ বা মৃত্যুর ফেরেশ্তাও বলা হয়। আমাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর দায়িত্ব তাঁর ওপরে ন্যস্ত রয়েছে। বিশ্বজাহানের ধ্বংসের দিনে ও শেষ বিচারের দিনে ইস্রাফিল শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন।

কতক ফেরেশ্‌তা সব সময়ই মানুষের কাজকর্ম লিখে রাখার কাজে ব্যস্ত। তাদেরকে 'সম্মানিত লিপিকারগণ' (কিরামান কাতিবীন্) বলা হয়। আমরা যেসব কথাবার্তা বলি তার একটি শব্দও লিপিবদ্ধ বা রেকর্ডকৃত হওয়া থেকে বাদ পড়ে না। (আল-কুর'আন ঃ সূরাহ্ কাফ্– ৫০ ঃ ১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সীমাহীন রাজত্বকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও নিখুঁতভাবে পরিচালনা করেন, আর ফেরেশ্‌তারা হচ্ছে তাঁর একান্ত অনুগত বান্দাহ্। আমাদের মধ্যে যারা সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মেনে চলে ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে জান্নাতে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে এবং গুনাহ্‌গারদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। (আল-কুর'আন ঃ সূরাহ্ আল-যুমার–৩৯ ঃ৭১-৭৪)

## আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহ كُتُبُ اللهِ

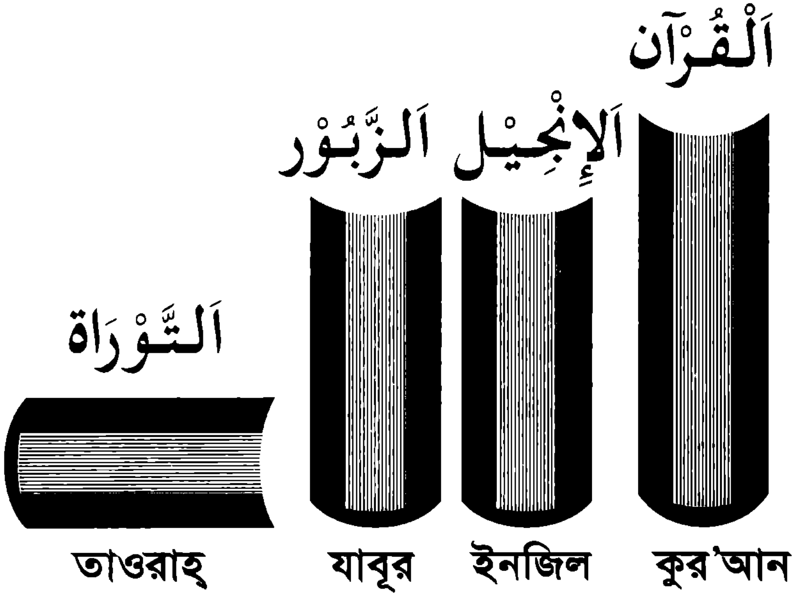


আমরা জানতে পারলাম যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ এবং পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা)। তবে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য আমাদের হেদায়াত বা পথনির্দেশের প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের ভিতরে অনেক দুর্বলতা

আছে এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত সেহেতু আমরা আমাদের নিজেদের জন্য পথনির্দেশ রচনা করতে অক্ষম। একমাত্র আল্লাহ্ই এসব দুর্বলতার উর্ধে এবং একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা রয়েছে সকল জায়গা ও সকল সময়ের মানুষের জন্যে উপযোগী হেদায়াত প্রদানের।

আমরা জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়াতবিহীন অবস্থায় ফেলে রাখেননি এবং এ-ও জানি যে, আমাদের জীবনপথে চলার জন্যে সঠিক পথ দেখাতে তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণকে (আঃ) পাঠিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে হেদায়াত সম্বলিত কিতাব পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ সীমাহীন। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুই তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন।

একটু চিন্তা করে দেখ, কেমন চমৎকারভাবে তিনি আমাদেরকে জন্ম থেকে শুরু করে যৌবনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্নের মধ্য দিয়ে বড় হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন! আমরা যখন মায়ের পেটে থাকি তখন কে আমাদের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন? আমাদের জন্মের সাথে সাথে আমাদের পান করার জন্যে কে আমাদের মায়ের বুকে দুধের সঞ্চার করেন? নিঃসন্দেহে পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলাই এসবের ব্যবস্থা করেন।

মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে দেয়া হেদায়াত। বস্তুতঃ নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও কল্যাণকর 'ইলম বা জ্ঞান একমাত্র সর্বজ্ঞানী মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকেই এসে থাকে। (আল-কুর'আন ঃ সূরাহ আল-বাকারাহ্- ২ ঃ ১৪৬ -১৪৭, সূরাহ আন্-নিসা- ৪ ঃ ১৬৩, সূরাহ আন্-নাজ্ম্- ৫৩ ঃ ১-৬)

একজন মুসলমান কুর'আন মজীদে উল্লিখিত সকল আসমানী কিতাবে ঈমান রাখে। এ কিতাবগুলো হচ্ছে ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত (অবতীর্ণ) **তাওরাহ,** হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত **যাবূর**, হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত **ইনজীল** ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত **কুর'আন**। কুর'আন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত পুস্তিকাসমূহের (ছুহুফে ইবরাহীম) কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে একমাত্র কুর'আন মজীদই অপরিবর্তিত রূপে সংরক্ষিত রয়েছে। মূল তওরাহ্[১], যাবূর্ ও ইনজিল[২]-এর এখন আর অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে এসব

গ্রন্থের যে সংস্করণ পাওয়া যায় তা যেসব নবীর (আঃ) নামে প্রচলিত তাঁদের ইন্তেকালের বহুবছর পরে তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা লিখিত।[৩] সংশ্লিষ্ট লেখকগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র কথাকে মানুষের কথার সাথে মিশ্রিত করেছেন।

'পুরাতন নিয়ম' (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ও 'নতুন নিয়ম' (নিউ টেস্টামেন্ট)-এর পুস্তকসমূহের সংকলন 'বাইবেল' হচ্ছে প্রাপ্ত হিব্রু ও গ্রীক পাণ্ডুলিপির ইংরেজী অনুবাদ। এতে যেসব সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়েছে যে কোন সচেতন ও সতর্ক পাঠক তা থেকে খুব সহজেই অন্ততঃ কতগুলো সংযোজন ও পরিবর্তন ধরতে পারবেন।

বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলে প্রচুর ভুল চোখে পড়ে।[৪] এটি কোন আসমানী কিতাব নয়। এতে অসংখ্য বিভ্রান্তিকর ভ্রান্তধারণা ও নবীদের (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ রয়েছে। এসব নবী-রাসূলের (আঃ) মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো বাণী তাঁদের অনুসারীদের অবহেলা বা নির্বুদ্ধিতার কারণে হয় হারিয়ে গেছে, নয়ত বিকৃত হয়েছে। অন্যদিকে কুর'আন মজীদে মানবজাতির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া হেদায়াত মূল রূপে ও মূল ভাষায় অপরিবর্তিত ও অবিকৃত রয়েছে। অতীতের নবী-রাসূলগণের (আঃ) ওপর নাযিলকৃত আল্লাহ্ তা'আলার যেসব বাণী তাঁদের অনুসারীরা হারিয়ে ফেলেছিল কুর'আন মজীদ তা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনরায় পেশ করেছে। কুর'আন মজীদের বাণী সকল কালের ও সকল পরিবেশের জন্য প্রযোজ্য।

## পাদটীকা ঃ

১। তাওরাহ্ হিব্রুভাষায় নাযিল হয়েছিল এবং ইনজীল যথাসম্ভব আরামী (সিরীয়) ভাষায় নাযিল হয়েছিল।

২। **বাইবেল দুই অংশে বিভক্ত ঃ** Old Testament (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ও New Testament (নিউ টেস্টামেন্ট)। ওল্ড টেস্টামেন্টে অন্তর্ভুক্ত পঞ্চপুস্তক (Pentateuch) (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ– Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy) এবং ইয্‌রা (Ezra), গীতসংহিতা (Psalms) ইত্যাদি পুস্তক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিউ টেস্টামেন্ট-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইনজীল হিসেবে দাবীকৃত চারজন লেখকের চারটি পুস্তক ঃ ম্যাথিউ, মার্ক, লুক ও জন (Mathew, Mark, Luke & John)। হযরত

'ঈসা (আঃ)-এর জীবনকাহিনীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য বারনাবাসের ইনজীল (The Gospel of Barnabas) এতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

৩। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা (আঃ)-কে তুলে নিয়ে যাবার পর ইনজীল (Gospel) সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়। খৃস্টানদের মতে হযরত 'ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় এবং এর ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কুর'আন মজীদ তাদের এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা (আঃ)-কে তুলে নিয়েছেন। (সূরাহ আন-নিসা–৪ ঃ ১৫৭-১৫৮)

৪। (ক) জিনেসিসে (নবম অধ্যায়, পদ ঃ ২০-২২) হযরত নূহ (আঃ)-কে মদ্যপ ছিলেন এবং নগ্ন হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) জিনেসিসে (১৯তম অধ্যায়, পদ ঃ ৩১-৩৭) হযরত লূত (আঃ) এর প্রতি নিজ কন্যার সাথে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

(গ) জিনেসিসে (২৬তম অধ্যায়, পদ ঃ ৭-১১) হযরত ইসাহাক (আঃ)-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।

(ঘ) New Testament-এর পুস্তকসমূহের সংকলকগণ কিভাবে বিকৃতি সাধন করেছেন তা ম্যাথিউ পুস্তকের ১৯তম অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭তম পদের সাথে মার্ক (Mark) পুস্তকের ১০ম অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮তম পদের তুলনা করলে খুব সহজেই ধরা পড়ে।

(তথ্যসুত্র ঃ The New English Bible, Oxford University Press, 1970

## অনুশীলনী (এক ঃ গ)

৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১) রিসালাহ্ কাকে বলে?

২) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এত নবী-রাসূল (আঃ) পাঠানোর প্রয়োজন হল কেন?

৩) কুর'আন মজীদে কতজন নবীর (আঃ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

৪) চারজন শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্তার নাম বল এবং তাঁদের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৫)  তোমার খসড়া খাতায় একটি নক্‌শা অঙ্কন করে তাতে আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের নাম উল্লেখ কর। কোন্‌ নবীর (আঃ) প্রতি কোন্‌ কিতাব নাযিল হয়েছিল তা-ও দেখাও।

৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১)  আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রথম নবী (আঃ) কে?

২)  আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশেষ নবী (আঃ) কে?

৩)  আছ-ছিরাতুল মুস্তাকীম্‌ কি?

৪)  "আমাদেরকে পথপ্রদর্শনের জন্যে শুরু থেকেই নবী-রাসূলগণকে (আঃ) পাঠানো হয়।" এটা কেন প্রয়োজন হয়েছিল?

৫)  আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তাদের সম্বন্ধে নিজের ভাষায় দশটি বাক্য লিখ।

৬)  কুর'আন মজীদে যেসব আসমানী কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর নাম লিখ এবং সেগুলোর বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ কর।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১)  রিসালাহ্‌ শব্দের তাৎপর্য বর্ণনা কর এবং আমাদের জীবনে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২)  তোমার নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তাদের অবস্থান ও মর্যাদা এবং তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য ব্যাখ্যা কর।

৩)  মানুষ যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হেদায়াত প্রয়োজন কেন? তারা যা খুশী তা-ই করতে পারে না কেন?

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ② الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ③ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ④ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦

সূরাহ আল-ফাতিহাহ্

## আল্-কুর'আন القرآن।

কুর'আন মজীদ এক অতুলনীয় কিতাব। এ কিতাবটি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সকল মানুষের জন্যে হেদায়াত হিসেবে নাযিল করা হয়েছে। কুর'আন মজীদ মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ । এটি ইসলামী আইন-কানুন বিধি-বিধানের প্রধান উৎস। কুর'আন মজীদের প্রতিটি শব্দই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

কুর'আন মজীদ মানবজাতির নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশেষ আসমানী কিতাব (ঐশী গ্রন্থ)। ৬১০ খৃষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন হিরা (حراء) গুহায় আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর ওপরে ওয়াহী (وحى) (খোদায়ী প্রত্যাদেশ) আকারে কুর'আন নাযিল শুরু হয়। আমরা ইতিমধ্যেই যেমন উল্লেখ করেছি, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্বেকার বিভিন্ন নবী-রাসূলের (আঃ) ওপর যেসব আসমানী কিতাব নাযিল করা হয় সেগুলো মূল রূপে মওজুদ নেই। কেবল কুর'আন মজীদই অপরিবর্তিত রয়েছে। তাই এ বিশ্ব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্যে কুর'আন মজীদই একমাত্র হেদায়াতের কিতাব। এ কারণে কুর'আন মজীদ আসল রূপে সংরক্ষিত রাখা এবং মানুষের দ্বারা বিকৃত হওয়া থেকে যে মুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, এ কিতাব চিরস্থায়ী হেদায়াতের কিতাব।

লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার দৃষ্টিতে বিশ্বের অন্য কোন গ্রন্থকেই কুর'আন মজীদের সাথে তুলনা করা চলে না। আল্লাহ্ তা'আলার এ কিতাবের একটি বিস্ময়কর দিক এই যে, এটি পুরোপুরি অপরিবর্তিত রয়েছে। এমন কি বিগত চৌদ্দ শ' বছরে এর একটি বিন্দুও পরিবর্তিত হয় নি। এর কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনক মজীদের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ-

-"নিঃসন্দেহে আমরা এ যিক্র্ (কুর'আন) নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী।" (সূরাহ আল্-হিজ্র্-১৫ ঃ ৯)

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই কুর'আন নাযিল করেছেন এবং তিনিই এর হেফাযত করবেন। আর বাস্তবেও তা-ই দেখা যাচ্ছে; তিনি এ কিতাবকে যে কোন ধরনের পরিবর্তন থেকে রক্ষা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও- চিরদিন একে রক্ষা করবেন।

কুর'আন মজীদের সূরাহসমূহ এমনই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, মহান স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা রচনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব ও জিন জাতিদ্বয়কে সম্মিলিতভাবে কুর'আনের সমতুল্য একটি গ্রন্থ রচনার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং সেই সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কখনোই তা করতে পারবে না। (আল্-কুর'আন ঃ সূরাহ আল্-বাকারাহ্- ২ ঃ ২৩, সূরাহ ইউনুস্-১০ ঃ ৩৭-৩৮, সূরাহ বানি ইসরাঈল-১৭ ঃ ৮৮) এ চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও কেউ গ্রহণ করতে পারবে না।

কুর'আন মজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। কুর'আন মজীদ আজও অপরিবর্তিত ও অবিকৃতভাবে এর আসলরূপে বিদ্যমান রয়েছে। সামান্যতম পরিবর্তন ছাড়াই এ কিতাবটি শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে আছে- এ অর্থে এটি একটি জীবন্ত অলৌকিক জিনিস Miracle বা মু'জিযাহ্। এর প্রতিটি শব্দ- প্রতিটি বর্ণ ও ধ্বনি- হাজার হাজার মুসলমানের অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে যাঁরা এ কিতাবটি মুখস্ত (হেফ্য) করে রেখেছেন ও রাখছেন এবং প্রতিদিন তেলাওয়াত (পাঠ) করছেন। এতে এর মূল অংশে (Text) কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। তোমরা নিজেরাও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের কুর'আন তেলাওয়াত শুনে তুলনা করে এ বিষয়ে পরখ করে দেখতে পার।

অন্যান্য আসমানী কিতাব যে সব ভাষায় নাযিল হয়েছিল তার বিপরীতে আরবী ভাষা-কুর'আনের ভাষা-এখনো একটি জীবন্ত, গতিশীল ও সমৃদ্ধ ভাষা। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে আরবী ভাষা ব্যবহার করে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এমন কি আজকের পৃথিবীতেও কুর'আনের বাস্তবায়ন এবং এ কিতাব থেকে সার্বজনীন কল্যাণ হাসিল করা সম্ভব।

কুর'আন মজীদের মাধ্যমে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাথে কথা বলেন। এ থেকে সমগ্র সৃষ্টিলোকের ওপর তাঁর সার্বভৌমত্বের এবং তিনি যে সর্বজ্ঞানী ও সব কিছু দেখতে পান তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

কুর'আন মজীদের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ ও তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল দিকই কুর'আনের আওতাভুক্ত। মানুষের কর্মতৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধেই এতে নীতিমালা, শিক্ষা ও হেদায়াত রয়েছে। কুর'আনের মূল বক্তব্য প্রধানতঃ তাওহীদ, রিসালাহ্ ও আখিরাহ্ এই তিনটি মৌলিক

ধারণা সম্পর্কে। কুর'আনের মূল মর্ম হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাঠানো সকল নবী-রাসূলই (আঃ) মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত অনুগত বান্দাহ্‌দেরকে যে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে কুর'আন মজীদ তার এক প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছে। তেমনি পাপাচারীদেরকে যে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে কুর'আন মজীদে তারও জ্বলন্ত ও ভয়াবহ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কুর'আন মজীদ তার হেদায়াত ও শিক্ষা অনুসরণের জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বস্তুতঃ কুর'আন মজীদের শিক্ষা অনুসরণের মধ্যেই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। আমরা যদি কুর'আনের অনুসরণ না করি তো আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কুর'আন আমাদেরকে আমাদের সমাজে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও পাপাচারকে উৎখাত করার আহ্বান জানায়।

কুর'আন মজীদের চমৎকার প্রকাশভঙ্গি এর পাঠক-পাঠিকাদের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। যারা কুর'আন মজীদে ঈমান রাখে ও এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে কুর'আন তাদের জীবনধারাকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে দেয়। এমন কি কুর'আন তেলাওয়াতকারী (পাঠকারী) ব্যক্তি যদি এর অর্থ পুরোপুরি বুঝতে না-ও পারে তথাপি কুর'আন তেলাওয়াত তেলাওয়াতকারীর অন্তরে এক অনাবিল প্রশান্তি সৃষ্টি করে। এর অবিশ্বাস্য প্রভাব মানুষের বর্ণনাশক্তির উর্ধে। কুর'আন তেলাওয়াতের প্রভাব সঠিকভাবে অনুধাবন একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সম্ভব।

## কুর'আনের নাযিল, সংগ্রহ ও সংকলন

কুর'আন মজীদ জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর নাযিল হয়। কুর'আন এক সঙ্গে নাযিল হওয়া কোন কিতাব নয়। কুর'আনের আয়াতসমূহ পর্যায়ক্রমে ও প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয় এবং দীর্ঘ তেইশ বছরে কুর'আন নাযিল সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট কুর'আন মজীদের যে কোন আয়াত বা সূরাহ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তার প্রতিটি শব্দ লিখে রাখা হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর যুগের মুসলমানদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময়ে কুর'আনের আয়াত ও সূরাহসমূহ নাযিল করা হয়। কোন্ সূরাহর পর কোন্ সূরাহ এবং কোন্ আয়াতের পর কোন্ আয়াত বসবে জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশ্‌তা অত্যন্ত

সাবধানতার সাথে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে শিক্ষা দেন। কুর'আনের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময়ের ভিত্তিতে সাজানো হয় নি বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেও সাজানো হয় নি। বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী এর আয়াত ও সূরাহগুলোকে সাজানো হয়। বস্তুতঃ এ-ও কুর'আন মজীদের আরেকটি আকর্ষণীয় অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বেশ কয়েকজন সচিব ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত যায়েদ্ বিন্ সাবিত্ (রাঃ) অন্যতম। তিনি কুর'আনের আয়াত লিখে রাখার কাজ করতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেভাবে বলতেন যায়েদ্ বিন্ সাবিত্ (রাঃ) ঠিক সেভাবে কুর'আনের আয়াতসমূহ লিখে রাখতেন। লেখা শেষ হলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পড়ে শোনাতেন।

কুর'আন মজীদে ১১৪টি সূরাহ রয়েছে। (سُوْرَةٌ বহুবচনে 'সুওয়ার্' - سُوَار) কুর'আন মজীদের ভূমিকাস্বরূপ বা উদ্বোধনী হিসেবে একটি ছোট সূরাহকে স্থান দেয়া হয়েছে। এর নাম সূরাহ আল্-ফাতিহাহ্ (سُوْرَةُ اَلْفَاتِحَة) (অত্র পুস্তকের ৪৫ নং পৃষ্ঠায় সূরাহটি ছাপা হয়েছে)। এরপরেই স্থান দেয়া হয়েছে কুর'আন মজীদের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরাহকে; এর নাম সূরাহ আল্-বাকারাহ্ (سُوْرَةُ اَلْبَقَرَة - بَقَرَة মানে গাভী)। এতে ২৮৬টি আয়াত রয়েছে। এরপর একেরপরএক অপেক্ষাকৃত ছোট সূরাহগুলোকে স্থান দেয়া হয়েছে। কুর'আন মজীদের সব চেয়ে ছোট সূরাহর নাম 'সূরাহ আল্-কাউছার' (سُوْرَةُ اَلْكَوْثَر-كَوْثَر মানে আধিক্য বা প্রাচুর্য)। এ সূরাহ-টিতে মাত্র তিনটি আয়াত রয়েছে।

কুর'আন মজীদে সর্বমোট ৬ হাজার ২৩৬টি আয়াত রয়েছে। (اَيَة- -একবচন, اَيَات- -বহুবচন) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় বসবাসকালে যেসব সূরাহ নাযিল হয় সেগুলোকে মাক্কী (Makkan) সূরাহ এবং তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর নাযিল হওয়া সূরাহগুলোকে মাদানী (Madinan) সূরাহ বলা হয়।

এছাড়া তেলাওয়াতের সুবিধার জন্য কুর'আন মজীদকে মোটামুটি সমান তিরিশ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রতিটি ভাগকে 'পারা' বলা হয়। (আরবী ভাষায় জয্‌য়্ جُزْء- -বহুবচন اَجْزَاء)

প্রথম যুগের মুসলমানদের অনেকেই কুর'আনের আয়াত বা সূরাহ নাযিল হলে সাথে সাথেই মুখস্ত করে নিতেন। কুর'আন মুখস্তকারীকে 'হাফিয' (حافظ) বলা হয়; বহুবচনে حُفَّاظ (হুফ্‌ফায্)। রাসূল (সাঃ) এর সময়কার কয়েকজন বিখ্যাত হাফিযের নাম ঃ

হযরত মু'আয বিন্ জাবাল্, হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ আস্-সামিত্, হযরত আবুদ্-দার্দা', হযরত আবু আইয়ুব আল-আনছারী ও হযরত উবাই বিন্ কা'ব,(রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম্)।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরেই হযরত 'উমার্ (রাঃ) খলীফাহ্ হযরত আবু বকর্ (রাঃ)-কে কুর'আন মজীদকে একটি কিতাব আকারে সংকলন করার প্রস্তাব দেন। ঐ সময় পর্যন্ত কুর'আন বিভিন্ন ভাগে আলাদা আলাদা লেখা ছিল। হযরত আবু বকর্ (রাঃ) এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কুর'আনকে একখণ্ডে সংকলন করার জন্য হযরত যায়েদ্ বিন্ সাবিত্ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কুর'আন মজীদ সংকলনের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কুর'আন মজীদ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময়ে যেভাবে লেখা হয়েছিল ঠিক সেরূপ নিখুঁতভাবে লেখা হয়। লেখার পর তা সতর্কভাবে পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা করে একটি কিতাবাকারে সংকলিত করা হয়। ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ)-র খিলাফাহ্র সময় কুর'আন মজীদের এ কপিটি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্যতম বিধবা স্ত্রী হযরত হাফসাহ্ (রাঃ)-র নিকট রাখা হয়।

পরবর্তীকালে মুসলিম অধ্যুষিত সকল এলাকায় কুর'আন শিক্ষা দেয়ার জন্য দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসাহ্) গড়ে ওঠে। হযরত 'উমার (রাঃ)-র সময় বিখ্যাত হাফিযদের অন্যতম হযরত আবুদ্-দার্দা' (রাঃ) দামেশ্কে এ ধরনের একটি মাদ্রাসাহ্ পরিচালনা করতেন। এর ছাত্রসংখ্যা ছিল এক হাজার ছয় শ'।

ইসলামী হুকুমাতের সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন এলাকার লোকেরা স্থানীয় উচ্চারণ ও সুরে কুর'আন তেলাওয়াত করতে শুরু করে। এর ফলে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির আশঙ্কা করে তৃতীয় খলীফাহ্ হযরত 'উসমান (রাঃ) কুরাইশদের উচ্চারণে কুর'আন মজীদের একটি আদর্শ কপি তৈরীর নির্দেশ দেন। কারণ, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরাইশ্ গোত্রেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত যায়েদ্ বিন্ সাবিত্, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আয্-যুবায়র, হযরত সা'ঈদ্ বিন্ আল্-আস্ ও হযরত আবদুর রহ্মান বিন্ আল্-হারিস্ (রাঃ)কে হযরত হাফসাহ্ (রাঃ)-র নিকট সংরক্ষিত কপি থেকে একটি আদর্শ কপি করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কপি তৈরী হলে সকলকে এ থেকে পুনঃ কপি করার বা নিজ নিজ কপি এর সাথে মিলিয়ে নিয়ে সংশোধন করার নির্দেশ দেয়া হয়।

হযরত 'উসমান (রাঃ)-র এ দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে কুর'আন মজীদের অভিন্ন তেলাওয়াত সম্ভবপর হয়। খলীফাহ্ হযরত 'উসমান (রাঃ)-র সময়কার কুর'আন মজীদের

দু'টি মূল কপি এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে একটি কপি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের তোপ্‌কাপী যাদুঘরে ও অপর কপিটি উযবেকিস্তানের তাশখন্দ শহরে রয়েছে। পাকিস্তানের করাচী নগরীর দ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাশখন্দের কপিটির একটি ফটোকপি আছে।

৬১০ খৃস্টাব্দে মক্কাহ শরীফের জাবালুন্‌ নূর্‌ (নূর্‌ পাহাড়)-এর হিরা' গুহায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট কুর'আন নাযিল শুরু হয়। সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয় তা হচ্ছে

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.
خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ.
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.
اَلَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.
عَلَّمَ الْإِنْسَنَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

(ইকরা' বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক,
খালাকাল ইন্‌সানা মিন 'আলাক
ইকরা' ওয়া রাব্বুকাল্‌ আক্‌রাম্‌,
আল্‌লাযী 'আল্লামা বিল্‌কালাম্‌,
'আল্লামাল্‌ ইনসানা মা লাম্‌ ইয়া'লাম্‌।)
–"তোমার রবের (প্রভুর) নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন,
মানুষকে 'পরস্পর জড়িত বস্তু' (প্রাথমিক ভ্রূণ) থেকে সৃষ্টি করেছেন,
পড়, আর তোমার রব বড়ই মহানুভব,
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"
(সূরাহ আল্‌-'আলাক – ৯৬ ঃ ১-৬)

জাবালুন নূরের হিরা' গুহায় নাযিল শুরু হবার পর দীর্ঘ ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিনে পুরো কুর'আন মজীদ নাযিল সমাপ্ত হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের অল্প

কিছুদিন আগে কুর'আন মজীদের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيْنًا

(আল্‌ইয়াওমা আক্‌মাল্‌তু লাকুম্‌ দীনাকুম্‌
ওয়া আত্‌মাম্‌তু 'আলাইকুম্‌ নি'মাতী
ওয়া রাদীতু লাকুমুল্‌ ইস্‌লামা দীনা।)

–"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম,
আর তোমাদের ওপর আমার নি'আমাত্‌ (نِعْمَةٌ- -দান/অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করে দিলাম,
এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনবিধান নির্ধারণ করলাম।"

(সূরাহ আল্‌-মায়িদাহ্‌– ৫ ঃ ৩)

কুর'আন মজীদের অনেক শব্দ বাংলাসহ অন্যান্য ভাষায় তরজমা (অনুবাদ) করা প্রায় অসম্ভব। তা সত্ত্বেও আহাদীছ্[১] ও সীরাহ্ [২] থেকে সাহায্য নিয়ে বিশ্বের অনেক ভাষায় কুর'আন মজীদের তরজমা– ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আরবী ও অন্যান্য ভাষায় কুর'আন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য মুসলমান আলেমগণ বছরের পর বছর চেষ্টা-সাধনা করেছেন। এইসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে 'তাফসীর' বলা হয়। তাফসীর আমাদেরকে কুর'আন বুঝতে সহায়তা করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর কালাম (كَلَام- কথা) বুঝতে ও তার ভিত্তিতে আমল করার তাওফীক দিন। আমিন।

## মৃত্যু اَلْمَوْت

প্রতিটি প্রাণী বা প্রাণশীল সৃষ্টিকেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের নিকটই মৃত্যু আসবে। আমাদের সকলকেই মরতে হবে। মৃত্যু চিরন্তন সত্য।

এ সম্বন্ধে কুর'আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ–

–"প্রতিটি নাফ্‌স্‌ (প্রণসত্তা)-ই মৃত্যুবরণ করবে।" (সূরাহ আলে 'ইম্‌রান্‌–৩ ঃ ১৮৫, সূরাহ আল্‌-আম্বিয়া'– ২১ ঃ ৩৫, সূরাহ আল্‌-'আন্‌কাবুত্‌– ২৯ ঃ ৫৭) মনে রাখতে হবে, নাফ্‌স আর রূহ (رُوْح) এক কথা নয়।

পৃথিবীর বুকে আমাদের এ জীবন নিতান্তই সাময়িক। মৃত্যু আমাদের এ জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়। মৃত ব্যক্তির প্রিয়জনদের জন্য তার মৃত্যু একটি দুঃখ-বেদনার ঘটনা। ইসলামী রীতি অনুযায়ী মুসলমানরা কুর'আন তেলাওয়াত ও দু'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করে।

ইসলাম আমাদেরকে এ কথাটি মনে রাখতে বলে যে, মৃত্যু যে কোন সময় এসে হাযির হতে পারে। কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন কখন তাঁর বান্দাহ্‌রা মারা যাবে। মৃত্যু আমাদের দেহকে ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু আমাদের রূহকে (رُوْح) ধ্বংস করতে পারে না। মৃত্যুর ফেরেশতা (مَلَكُ الْمَوْت- 'ইযরাঈল বা 'আয্‌রাঈল) আমাদের রূহ্‌গুলোকে নিজের দায়িত্বে–আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যান। (সূরাহ আস্‌-সাজ্‌দাহ্‌– ৩২ ঃ ১১)

যে ব্যক্তি মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করে সে অবশ্যই ভাল কাজ করবে এবং আল্লাহ্‌ তাআ'লার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির লাশ (মৃতদেহ)-কে কবর দেয়ার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে গোসল দেয়া হয়। এরপর লাশটিকে কয়েক টুকরা সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং এর ওপর সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়া হয়। কবর দেয়ার আগে মৃতব্যক্তির জন্যে জামা'আতে বিশেষ ধরনের ছালাত আদায় করা হয়, একে ছালাতুল জানাযাহ্‌ বলা হয়।

## আখিরাহ أخرة

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিশ্বাস হচ্ছে তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ব), রিসালাহ্‌ (আল্লাহ্‌র বাণী বাহকের পদ) ও আখিরাহ্‌ (মৃত্যুপরবর্তী জীবন)।

আখিরাহ্‌-তে বিশ্বাস মুসলমানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন অস্থায়ী, স্বল্পকালীন। এর মানে হচ্ছে আমাদেরকে আখিরাহ্‌র অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

একবার ভেবে দেখো তো, ভাল কাজের পুরস্কার না পেলে ও মন্দ কাজের শাস্তি না হলে এ পৃথিবীর জীবন কি অর্থহীন নয়? অবশ্যই। আমরা যে স্কুলে যাতায়াত করি সেখানে যদি

খারাপ আচরণের জন্য শাস্তি দেয়া না হয় এবং আমাদের চেষ্ট-সাধনা-অধ্যবসায়ের কারণে বছরের শেষে পুরস্কার দেয়া না হয় তাহলে কেন আমরা স্কুলে যাব? একইভাবে আমরা যদি মত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে (ইয়াওমূল আখিরাহ্ বা ইয়াওমুদ্দীন-এ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়বিচারের আদালতে দাঁড়িয়ে আমাদের দুনিয়ার জীবনের কাজকর্মের ভাল-মন্দ ফলাফল না পাই তাহলে এ দুনিয়ার জীবনটা একেবারেই অর্থহীন। তাই মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত জীবনে দুনিয়ার জীবনের ভালো-মন্দ কাজকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্র আদালতে হাযির হবার জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হলে আমাদেরকে নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পাঠানো হেদায়াতের অনুসরণ করতে হবে। বস্তুতঃ মৃত্যুর পরে যদি কোন জীবন না থাকত এবং থাকলে তাতে দুনিয়ার জীবনের ভাল-মন্দ কাজকর্মের পুরস্কার ও শাস্তি না থাকত তাহলে নবী-রাসূলগণকে (আঃ) পাঠানোর কোন প্রয়োজনই থাকত না।

অনেক লোক আছে যারা মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কিনা তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। আর অনেকে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের কথা অবিশ্বাস করে। এসব লোককে তাদের এ উদাসীনতা বা অবিশ্বাসের জন্যে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সম্ভবতঃ কোন মানুষই বলতে পারে না যে, মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই। কেউ হয়ত এ ব্যাপারে বড়জোর সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু তার সন্দেহ যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই সতর্কতার জন্যে এ ব্যাপারে নবী-রাসূলগণ (আঃ) যা বলেছেন তা বিশ্বাস করা উচিত। বস্তুতঃ আখিরাহ্ সম্বন্ধে উদাসীনতা একটা বড় ধরনের ব্যর্থতা। আমরা নিশ্চিত জানি যে, সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করবে। তাই মৃত্যুপরবর্তী সেই চিরকালীন জীবনের জন্য তৈরী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত কাজ। কারণ এরূপ একটি জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করার পক্ষে কোনই যুক্তি নেই।

কাফিররা (যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না) মৃত্যুপরবর্তী জীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আসলে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তিদের কিভাবে জীবিত করবেন তা তারা বুঝতে পারছে না। কিন্তু যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাই তাঁর পক্ষে মৃত মানুষদের পুনরায় জীবন দান করা কোনই কঠিন ব্যাপার নয়। (আল্-কুর'আন ঃ সূরাহ আল্-হাজ্জ–২২ ঃ ৫-৭, সূরাহ ইয়া-সীন্– ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)

কুর'আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلَى قَدِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ -

"মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা (তাদের পঁচে মাটিতে মিশে যাওয়া) অস্থিগুলোকে একত্রিত করব না? অবশ্যই; আমরা তার একটি আঙ্গুলের ডগাকেও নিখুঁতভাবে (আগের মতই) বানাতে সক্ষম।" (সূরাহ্ আল্-কিয়ামাহ্ - ৭৫ ঃ ৩-৪)

সকল মনুষই যদি মনে করত যে, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই তাহলে এ পৃথিবীর জীবনে শান্তির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না, বরং দুনিয়ার জীবন হতো চরম অশান্তিতে পরিপুর্ণ একটি ভয়ঙ্কর জীবন। কারণ সে ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল-খুশী মাফিক চলার পথে কোন বাধা বা নিয়ন্ত্রণ থাকত না।

বস্তুতঃ আখিরাহ্-তে বিশ্বাস একজন মুসলিমের জীবনের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কারণ সে জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল কাজকর্মের ওপর দৃষ্টি রাখছেন এবং শেষ বিচারের দিনে তাকে তার কাজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং তার কাজকর্ম ও আচরণ অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত এবং দায়িত্বশীলতা ও সতর্কতার সাথে সম্পাদিত হবে। সে সব সময়ই সেই সব কাজ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তা'আলা যা পছন্দ করেন এবং যে সব কাজ তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিকে অনিবার্য করে তুলবে সে সব কাজ পরিত্যাগ করে চলবে।

একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, এ পৃথিবীর জীবনে সে যে সব ভাল কাজ করবে মৃত্যুপরবর্তী জীবনে সে জন্য তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। সে চিরকালীন সুখ-শান্তির জায়গা জান্নাতে বসবাস করবে।

যারা তাওহীদ, রিসালাহ্ ও আখিরাহ্-তে অবিশ্বাস করে বা বিশ্বাস করলেও পাপাচারে লিপ্ত থাকে শেষ বিচারের দিনে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। আর জাহান্নাম হচ্ছে কঠিন শাস্তি ও অবর্ণনীয় দুঃখ- দুর্দশার জায়গা।

শেষ বিচারের দিনের জন্যে তৈরী হওয়া এবং সেদিনে দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে পুরস্কার লাভের জন্যে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশকৃত সকল কাজ করতে হবে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ তথা সকল খারাপ কাজ ও অভ্যাস

পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট যে হেদায়াত পাঠানো হয়েছে কেবল তা অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে পারি। আখিরাহ্-তে সাফল্যের জন্যে এটাই একমাত্র নিরাপদ কর্মনীতি।

## পাদটীকা ঃ

১। أَحَادِيْث- হাদীছসমূহ; একবচনে حَدِيْث (হাদীছ)। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর সামনে তাঁর ছাহাবীদের (সঙ্গী-সাথীদের) কৃত কাজের প্রতি তাঁর মৌন সম্মতির বিবরণ।

২। سِيْرَة- হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের (রাঃ) জীবন-কাহিনী।

# অনুশীলনী (এক ঃ ঘ)

৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১) কুর'আন কি?

২) কুর'আনে কতটি অংশ (পারা) রয়েছে?

৩) কুর'আন মজীদের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতগুলো কখন নাযিল হয়?

৪) মৃত্যু সম্বন্ধে কুর'আন কি বলে?

৫) কুর'আনের হাফিয্ মানে কি?

৬) ইয়াওমুদ্দীন কি? ইয়াওমুদ্দীনের জন্য কিভাবে তৈরী হতে হবে?

৭) কুর'আন কিভাবে বর্তমান রূপ পেয়েছে বর্ণনা কর।

৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১) কার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট কুর'আন নাযিল হয়?

২) কে এবং কেন কুর'আন সংকলনের প্রস্তাব দেন?

৩) কুর'আন নাযিল সমাপ্ত হতে কতদিন লেগেছিল?

৪) কুর'আন মজীদের কোন্ আয়াতগুলো সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল?

৫) "আখিরাতে বিশ্বাস সবকিছুকে যথাযথ রাখতে সাহায্য করে।" ইসলাম সম্পর্কে তোমার ধারণার আলোকে এ কথার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

৬) কুর'আন মজীদের মূল বাণী কি এবং আধুনিক বিশ্বে কিভাবে তা আমাদের জীবনকে যথাযথ রূপ দিতে পারে?

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১) "চৌদ্দ শ' বছর আগে নাযিল হলেও কুর'আনের বাণী সর্বজনীন।" পত্রিকার জন্যে একটি প্রবন্ধ লিখে এ কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ কর।

২) "আজকের দিনটি উপভোগ করো, আগামী কালের জন্য চিন্তা করো না।" এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতি কি ব্যাখ্যা কর এবং আখিরাহ্-তে বিশ্বাস কিভাবে এ ধরনের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩) "মৃত্যুর স্মরণ আমাদেরকে পার্থিব বস্তুসমূহের চাকচিক্যের দ্বারা সম্মোহিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষায় সহায়তা করে।" এ কথার তাৎপর্য কি? আলোচনা কর।

## দুই ঃ ইসলামের বুনিয়াদী কর্তব্য

ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী অবশ্য পালনীয় রয়েছে। মুসলমানদের জন্য এ কাজগুলো বাধ্যতামূলক। এ কাজগুলো ইসলামের স্তম্ভ (আর্কানুল্ ইসলাম) হিসেবে পরিচিত। নিম্নলিখিত হাদীছে (হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাণীতে) ইসলামের এ পাঁচ মৌলিক কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

(বুনিয়াল্ ইসলামু 'আলা খাম্সিন্ : শাহাদাতি আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ রাসূলুল্লাহি ওয়া ইকামিছ্ ছালাতি ওয়া ঈ'তায়িয্ যাকাতি ওয়াল্ হাজ্জি ওয়া ছাওমি রামাদান্।)

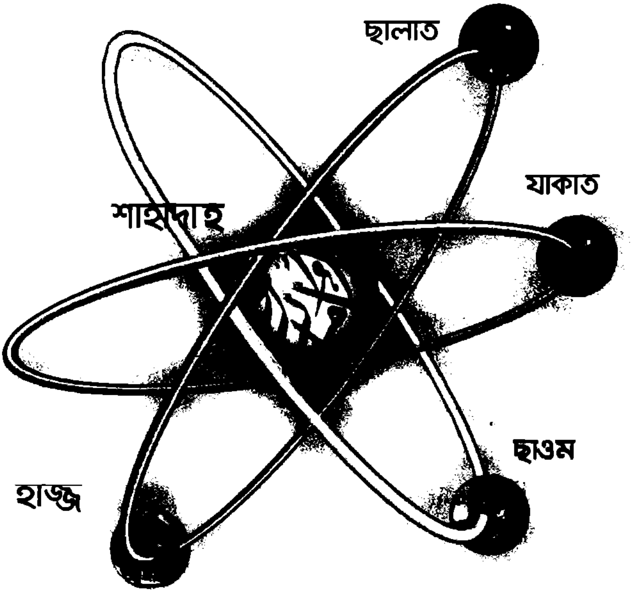

"ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তিশীল ঃ এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই" এবং (এ মর্মে) যে, "মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল", আর ছালাত কায়েম করা, যাকাত্ দেয়া, হজ্জ ও রামাদানের সাওম।" (আল্-বুখারী)

হাদীসে উল্লেখকৃত পাঁচ রোকন (স্তম্ভ) হচ্ছে ঃ

| | | |
|---|---|---|
| শাহাদাহ[১] | (ঈমানের ঘোষণা) | اَلشَّهَادَةُ |
| ছালাত[১] | (দৈনিক পাঁচবার বাধ্যতামূলক 'ইবাদত) | اَلصَّلَاةُ |
| যাকাত[১] | (দরিদ্রদের কল্যাণে নির্ধারিত বাধ্যতামূলক ব্যয়) | اَلزَّكَاةُ |
| হজ্জ | (মক্কায় গমন ও বিশেষ ধরনের ইবাদত) | اَلْحَجُّ |
| ছাওম | (রামাদান মাসের রোযা) | اَلصَّوْمُ |

## শাহাদাহ اَلشَّهَادَةُ

একজন মুসলমানকে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করে তার ঈমানের ঘোষণা দিতে হয় ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।)

এ আরবী কথাটির অর্থ হচ্ছে ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই; মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল।"এ কথাটিকে 'কালিমাহ্ তাইয়্যিবাহ্ (পবিত্র বাক্য) বলা হয়। এতে ইসলামের পুরো বিশ্বাস নিহিত রয়েছে। এর দু'টি অংশ। প্রথম অংশে অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অংশে আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের কথা বলা হয়েছে– যাকে আরবী ভাষায় বলা হয় তাওহীদ। আর দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ "মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্" অংশে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর রিসালাহ্‌র কথা বলা হয়েছে।

---

১। শব্দগুলোর সঠিক উচ্চারণ যথাক্রমে ঃ আশ্-শাহাদাহ, আছ্-ছালাহ ও আয্-যাকাহ। শব্দগুলো অন্য শব্দের সাথে মিলিত হলে উচ্চারণ হবে ঃ আশ্-শাহাদাতু, আছ্-ছালাতু ও আয্-যাকাতু (যেমন ঃ আছ্-ছালাতুল ফাজ্‌র, আয-যাকাতুল ফিত্‌র)। ভাষার গতিশীলতার স্বার্থে এখানে সর্বজনীনভাবে প্রচলিত উচ্চারণ ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে সঠিক উচ্চারণ জানা থাকা সকলের জন্যেই জরুরী।

প্রথম অংশে যে চারটি শব্দ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম শব্দ হচ্ছে 'লা', এর মানে 'না' বা 'নেই'। দ্বিতীয় শব্দ 'ইলাহ্', এর মানে 'উপাস্য'। তৃতীয় শব্দ 'ইল্লা', এর মানে 'ব্যতীত'। আর চতুর্থ শব্দ হচ্ছে 'আল্লাহ্'। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে তিনটি শব্দ ঃ প্রথম শব্দ 'মুহাম্মাদ', দ্বিতীয় শব্দ 'রাসূল' অর্থাৎ 'বাণীবাহক বা দূত' এবং শেষ শব্দ 'আল্লাহ্' দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ যুক্ত হয়েছে 'রাসূলুল্লাহ্' মানে 'আল্লাহ্র রাসূল'।

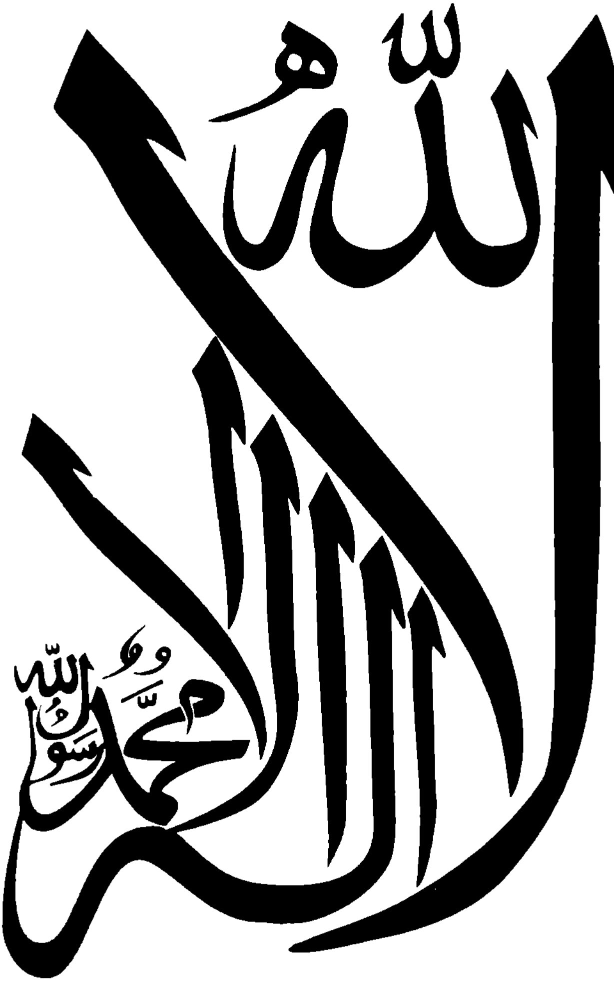

শাহাদাহ বা ঈমানের ঘোষণা

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে, এই শাহাদাহ্ অর্থাৎ তাওহীদ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর রিসালাহ্ সম্বন্ধে সাক্ষ্য। অপর চারটি স্তম্ভ ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য– যাকে ‘ইবাদাত্ বলা হয়। ‘ইবাদাত্ একটি আরবী শব্দ। এতে আল্লাহ্ তা’আলর সন্তুষ্টির জন্যে করা যে কোন কাজই অন্তর্ভুক্ত। ছালাত, যাকাত্, হজ্জ্ ও ছাওম্ হচ্ছে প্রধান চার ধরনের নির্ধারিত ‘ইবাদাত্। আমরা যদি নিয়মিত ও ঠিকভাবে এ কাজগুলো করি তাহলে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা’আলার ঘনিষ্ঠতা হাসিল করতে পারব।

বস্তুতঃ এই চারটি মৌলিক কর্তব্য অর্থাৎ ছালাত, যাকাত্, হজ্জ্ ও ছাওম্ হচ্ছে ইসলামের প্রশিক্ষণকর্মসূচী। শাহাদহ্‌কে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার জন্যে এ প্রশিক্ষণকর্মসূচী দেয়া হয়েছে। আমরা জানি যে, আমরা আল্লাহ্ তা‘আলারই সৃষ্টি এবং তিনিই আমাদের মালিক ও প্রভু। তাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা মালিকের দাস হিসেবে চলা ও আচরণ করার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিকভাবে ও আন্তরিকতার সাথে ছালাত, যাকাত্, হজ্জ্ ও ছাওমের কর্তব্য পালন করতে হবে।

## ছালাত اَلصَّلٰوةُ

ছালাত হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। মুসলমানদের জন্যে দৈনিক পাঁচবার ছালাত আদায় বাধ্যতামূলক (ফরয) করা হয়েছে। ছালাত ব্যক্তিগতভাবেও আদায় করা যায়। তবে বয়স্ক পুরুষলোক ও বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) কিশোর-তরুণদের জন্য জামা‘আতে (একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে) ছালাত আদায়কেই বেশী পছন্দ করা হয়েছে। অবশ্য সম্ভব হলে মহিলা ও বালিকারাও জামা‘আতে শরীক হয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। আমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্যে ছালাত আদায় করি। ছালাত আমাদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে ঘনিষ্ঠ করে দেয়। এ সম্পর্কে কুর’আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ–

–“নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহ্; আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। অতএব, আমার ‘ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণের জন্যে ছালাত কায়েম কর।” (সূরাহ্ তা-হা–২০ ঃ ১৪)

ছালাত হচ্ছে আল্লাহ্ ও ইসলামে আমাদের ঈমানের কার্যতঃ প্রমাণ। সুনির্দিষ্ট সময়ে এ ছালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا-

-"নিঃসন্দেহে মু'মিনদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।" (সূরাহ্ আন্-নিসা-৪ ঃ ১০৩)

মুসলমানদের জন্যে যে দৈনিক পাঁচবার ছালাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ফাজ্র্ | (ছুবহে ছাদেক্ব বা ঊষার সূচনাকাল থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত) | صَلاَةُ الْفَجْرِ |
| যুহ্র্ | (মধ্য-দুপুরের পর থেকে বিকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত) | صَلاَةُ الظُّهْرِ |
| 'আছ্র্ | (বিকাল থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত) | صَلاَةُ الْعَصْرِ |
| মাগ্‌রিব্ | (সূর্যাস্তের পর থেকে দিনের আলো পুরোপুরি বিলীন না হওয়া পর্যন্ত) | صَلاَةُ الْمَغْرِبِ |
| 'ইশা' | (রাত হওয়ার পর থেকে মধ্যরাত বা ঊষার পূর্ব পর্যন্ত) | صَلاَةُ الْعِشَاءِ |

এ পর্যায়ে এসে তোমাদের জানা প্রয়োজন যে, কিভাবে ছালাত আদায় করতে হয়। তবে তার আগে তোমাদের ভালভাবে জেনে নেয়া দরকার আমাদের ছালাত আদায়ের প্রয়োজন কি? আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও রহমত লাভের জন্যে ছালাত আদায় করি।

ছালাত আদায়ের জন্যে তোমাদেরকে অবশ্যই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে নিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেছন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

-"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীদেরকে (পাপকাজ পরিত্যাগ করে অনুতাপসহকারে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে) এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরাহ্ আল্-বাকারাহ্- ২ ঃ ২২২)

শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতাকে 'তাহারাহ্' (طَهَارَةٌ) বলা হয় এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয় 'নাযাফাহ্' (نَظَافَةٌ)। এ দু'টি বিষয় এক নয়, তবে দু'টি বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তুমি হয়ত বাহ্যিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পার, কিন্তু সে অবস্থায় পবিত্র না-ও হতে পার।

ছালাত আদায়ের সময় পরিধানে যে কাপড়-চোপড় থাকবে তাতে যেন পায়খানা-প্রস্রাব না লেগে থাকে; কোনভাবে লেগে থাকলে তা পুরোপুরি পরিস্কার করে নিয়ে তারপর অন্ততঃ কাপড়ের ঐ অংশটুকু ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে যাতে নাপাক বস্তুর রং বা গন্ধ না থাকে।

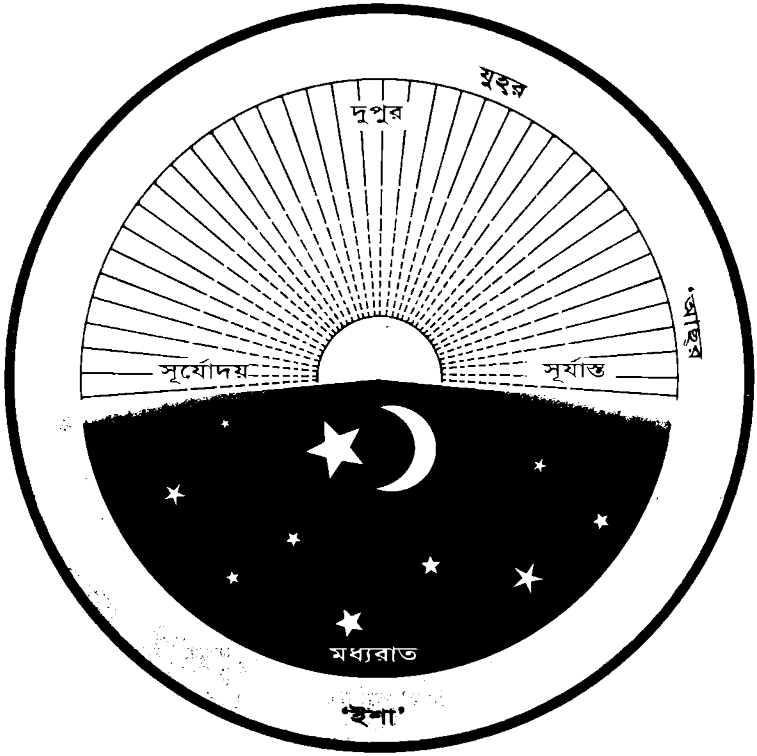


দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়

আমরা আমাদের শরীরকে কিভাবে পবিত্র করবো? পবিত্রতার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সারা শরীর ধুয়ে ফেলতে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুতে হয়। (তবে উভয় ক্ষেত্রেই শরীরে কোন নাপাক বস্তু লেগে থাকলে তা আগে সাফ করে নিতে হবে।) শরীর পুরোপুরি ধোয়ার নাম গোসল এবং আংশিক ধোয়ার নাম উযূ'।

মনে রাখবে মুসলমানদের জন্যে অন্য লোকদের সামনে নগ্ন হয়ে গোসল করার অনুমতি নেই– তা পুকুরে, নদীতে বা শাওয়ারের নীচেই হোক বা তোলা পানি দ্বারাই হোক।

## উযূ' اَلْوُضُوْءُ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে হাশরের দিনে আমার অনুসারীদেরকে উযূ'র চিহ্নের ভিত্তিতে 'আল্-গুর্‌রুল মুহাজ্জালুন' (জ্যোর্তিময় শরীফ লোকগণ) বলে সম্বোধন করা হবে। অতএব যে-ই পারে সে যেন তার এ জ্যোতির আওতা বৃদ্ধি করে (অর্থাৎ নিয়মিত উযূ' করে)।" (আল্-বুখারী)

ছালাত আদায় শুরু করার আগে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে এ জন্যে তৈরী করে নিতে হবে। আর নিজেদেরকে তৈরী করে নেয়ার মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে, নিজেদের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। উযূ' করার মাধ্যমে আমরা এ পবিত্রতা হাসিল করে থাকি।

ছালাত আদায়ের জন্যে উযূ' বাধ্যতামূলক। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ছালাতের জন্যে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধোও এবং মাথা মাসেহ্ কর (ভিজা হাত মাথায় ওপরে টানবে) ও পা দু'টি গোড়ালি পর্যন্ত ধোও।" (সূরাহ আল্-মায়িদাহ্-৫ ঃ ৬)

এ আয়াতে উযূ' করার ফরয অংশগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উযূ'তে আরো কতোগুলো অতিরিক্ত কাজ করতেন যেগুলোকে সুন্নাহ্ বলা হয়; এ সম্পর্কে আহাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

উযূ'র কাজগুলো পর্যায়ক্রমে এরূপ ঃ

(ক) প্রথমেই উযূ'র নিয়্যত করো অর্থাৎ তুমি যে উযূ' করবে এ ব্যাপারে মনস্থির করবে। এরপর তাস্‌মীয়াহ্ (বিসমিল্লাহ্) বলে উযূ' শুরু করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

(পরম দয়াময় মেহ্‌রবান আল্লাহ্‌র নামে)

এরপর প্রথমে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধুয়ে নাও। লক্ষ্য রাখবে যাতে আঙ্গুলের ফাঁকে ঠিকমতো পানি পৌঁছে।

(খ) ডান হাত দিয়ে আঁজলা ভরে মুখে পানি দাও এবং তিনবার কুলি কর।

(গ) নাকের ছিদ্র দিয়ে তিনবার পানি টেনে নাও ও নাকের ছিদ্র পরিষ্কার করো। এরপর নাকের ডগা ধুয়ে ফেলো।

(ঘ) ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত এবং কপালের চুল ওঠার জায়গা থেকে গলার কাছ পর্যন্ত তিনবার ধোও।

(ঙ) কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত তিনবার ধোও।

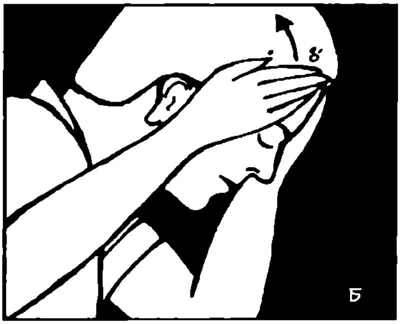


(চ) উভয় হাতের ভিজা তালু কপালের উপরে চুল ওঠার জায়গা থেকে মাথার ওপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত টেনে নাও।

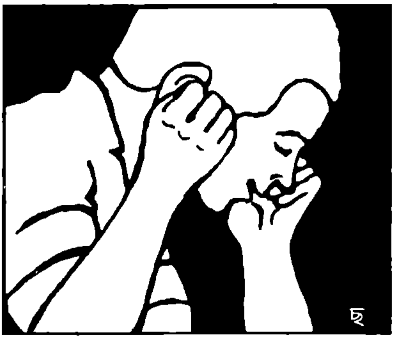

(ছ) ভিজা আঙ্গুলগুলো দিয়ে উভয় কানের সামনের দিক ও ছিদ্র মুছে নাও এবং ভিজা বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের পিছন দিক মুছে নাও।

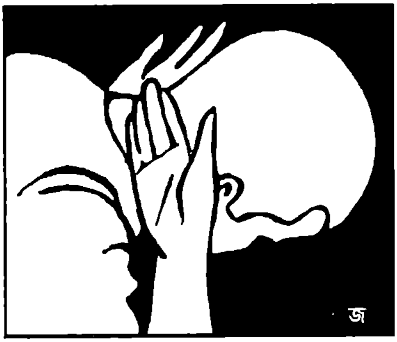


(জ) ভিজা হাতের পিঠ ঘাড়ের ওপর দিয়ে টেনে নাও। ( 'আল্লামাহ শাওকানী লিখিত 'নাইলুল্ আওতার', ১৯৭৩ সালে মুদ্রিত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩ দ্রষ্টব্য।)

(ঝ) প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা গোড়ালি পর্যন্ত ধুয়ে নাও; খেয়াল রাখবে যাতে পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ঠিকমত পানি প্রবেশ করে।

তুমি যদি মোযা পরার আগে পুরোপুরি উযূ' করে থাকো তাহলে পুনরায় প্রতিবার উযূ' করার সময় মোযা খুলে নিতে হবে না। বরং সে ক্ষেত্রে মুছে নিলেই চলবে। এ জন্যে চামড়ার মোযাই সবচেয়ে ভাল। তবে যে কোন টেকসই মোযার ওপর এ মাসেহ্ চলবে যদি তা ছেঁড়া না হয়। এ ধরনের মাসেহ্ চব্বিশ ঘন্টার জন্যে (সফরে থাকলে তিন দিন) কার্যকর।

উযূ'র সকল কাজ শেষ হবার পর পড়বে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্।)

–"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং তিনি এক ও তাঁর কোন শরীক নেই, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল।"

নিম্নলিখিত অবস্থার পরে তোমাকে নতুন করে উযূ' করতে হবে ঃ

১) প্রাকৃতিক কর্ম (অর্থাৎ পায়খানা, পেশাব, বায়ু বের হওয়া ও এ ধরনের অন্যান্য অবস্থা)।

২) শরীরের যে কোন জায়গা থেকে রক্ত বা পুঁজ বেরিয়ে গড়িয়ে গেলে।

৩)	মুখভরে বমি হলে।

৪)	ঘুমিয়ে পড়লে বা বেহুশ হয়ে পড়লে।

৫)	গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলে।

## তায়াম্মুম্ (বা শুকনা উযূ') اَلتَّيَمُّمُ

নিম্নলিখিত যে কোন অবস্থায় তুমি তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারো (আল্-কুর'আন ঃ সূরাহ আন্-নিসা'-৪ ঃ ৪৩) ঃ

১)	মোটেই পানি পাওয়া না গেলে।

২)	প্রাপ্ত বা মওজুদ্ পানি যথেষ্ট না হলে (অর্থাৎ কেবল পান করার জন্যে যথেষ্ট হলে এবং পান করা ও উযূ' করা উভয় কাজের জন্যে যথেষ্ট না হলে)।

৩)	পানি ব্যবহার করা ক্ষতিকর হলে (অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায়)।

### নিম্নলিখিত নিয়মে তায়াম্মুম্ করতে হবে ঃ

১)	(ক) 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম্' বলে নিয়্যত করো,
	(খ) এরপর তোমার উভয় হাত আলতোভাবে মাটি, বালি, পাথর বা ধুলাযুক্ত অন্য যে কোন বস্তুর ওপর রাখো।

২)	তোমার হাত ঝাড়া দিয়ে আলগা ধুলা ফেলে দাও এবং উযূ'র নিয়মে একবার চেহারার ওপর উভয় হাত বুলিয়ে নাও।

৩)	'১-এর (খ)'-তে যা করেছো তা পুনরায় করো এবং বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত ও ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত মুছে নাও।

যে কারণে পুনরায় উযূ' করতে হয় একই করণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয় ও পুনরায় তায়াম্মুম করতে হয়। এছাড়া যেসব কারণে তায়াম্মুম করা যায় সে কারণ দূর হয়ে গেলে (অর্থাৎ পানি পাওয়া গেলে বা যথেষ্ট পাওয়া গেলে অথবা রোগ ভাল হয়ে গেলে) তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়; অতঃপর ছালাত আদায় করতে হলে উযূ' করতে হয়।

## আযান اَلْأَذَانُ

(ছালাতের জন্যে আহ্বান)

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যেমন বলেছেন তেমনি তাঁর কাজের মাধ্যমেও দেখিয়েছেন যে, মুসলিম পুরুষ ও বালেগ ছেলেদের জন্যে তাদের ফরয ছালাত মসজিদে গিয়ে

জামা'আতের সাথে আদায় করা উচিত। মহিলা ও বালিকারাও চাইলে মসজিদে গিয়ে তাদের ছালাত আদায় করতে পারে। অন্য সব রকমের ছালাত একা একা বাড়ীতে আদায় করা যায়।

মুসলমানদেরকে ছালাতের দিকে ডাকার জন্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আযানের প্রচলন করেন। 'আযান' মানে 'আহ্বান'। যিনি আযান দেন তাঁকে 'মুআয্যিন' (আহ্বানকারী) বলা হয়। আযান দেয়ার সময় মুআয্যিনকে কিবলাহ্‌র দিকে (মক্কাহ্ নগরীর কা'বাহ্ গৃহের দিকে) মুখ করে দাঁড়াতে হয়। মুআয্যিন তাঁর দুই হাত কান পর্যন্ত উঁচু করে উঁচু গলায় বলেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ!

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ্! আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ্

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্। আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

হাইয়্যা 'আলাছ্ ছালাহ্। হাইয়্যা 'আলাছ্ ছালাহ্।

ছালাতের দিকে ছুটে এসো। ছালাতের দিকে ছুটে এসো।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্। হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্।

সাফল্যের দিকে ছুটে এসো। সাফল্যের দিকে ছুটে এসো।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ
আল্লাহু আকবার।
আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ!

اَللّٰهُ اَكْبَرُ
আল্লাহু আকবার।
আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ!

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

ফজরের ছালাতের আযানে "হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্" বলার পরে নীচের কথাগুলো অতিরিক্ত বলতে হয় ঃ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
আছ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম।
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল।

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
আছ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম।
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল।

## ইকামাহ اَلْاِقَامَةُ

মসজিদের ভিতরে জামা'আতে ফরয ছালাত শুরু করার ঠিক আগ মুহূর্তে আযানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে ছালাতের জন্য যে আহ্বান জানানো হয় তাকে ইকামাহ্ বলা হয়। মুছাল্লীগণ (ছালাত আদায়কারীগণ) যখন ফরয ছালাত আদায়ের জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তখন মুআয্যিন ইকামাহ্ দেন।

ইকামাহ্ ও আযানের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে ইকামাহ্র সময় "হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্" বলার পরে নীচের কথাটি বলতে হয় ঃ

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ
কাদ্ কামাতিছ্ ছালাহ্
ছালাত শুরু হচ্ছে।

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ
কাদ্ কামাতিছ্ ছালাহ্
ছালাত শুরু হচ্ছে।

## ফরয (বাধ্যতামূলক) ছালাত

একজন মুসলমানের জন্যে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। আরবী ভাষায় বাধ্যতামূলক ছালাতকে বলা হয় ফরয ছালাত।

ছালাতের প্রতিটি একককে বলা হয় রাক'আহ্(رَكْعَة) বহুবচনে রাক্'আত্(رَكْعَات) বিভিন্ন ওয়াক্তের ফরয ছালাতের রাক্'আত্ সংখ্যা নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

| | |
|---|---|
| ফজর | ২ রাকা'আত্ |
| যুহ্র | ৪ রাকা'আত্ |
| 'আছ্র | ৪ রাকা'আত্ |
| মাগরিব ............................................ | ৩ রাকা'আত্ |
| 'ইশা' ............................................ | ৪ রাকা'আত্ |
| | মোট ঃ ১৭ রাকা'আত |

| | |
|---|---|
| জুমু'আহ্............................................ | ২ রাকা'আত্ |
| *(শুক্রবার যুহ্রের পরিবর্তে)* | |

## সুন্নাত ছালাত

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বিভিন্ন ওয়াক্তে ফরয ছালাতের সাথে অতিরিক্ত কয়েক রাক্'আত্ ছালাত আদায় করতেন। একে সুন্নাত ছালাত বলা হয়। তিনি সব সময়ই ফাজ্রের ওয়াক্তে ফরয ছালাতের আগে দুই রাক্'আত্ ও 'ইশা'র ওয়াক্তে ফরয ছালাতের পরে তিন রাক্'আত্ ছালাত আদায় করতেন। এমনকি সফরের সময়ও তিনি এ ছালাত বাদ দিতেন না। 'ইশা'র ফরয ছালাতের পরবর্তী তিন রাক্'আত্ ছালাতকে 'বিত্র্' (বেজোড়) ছালাত বলা হয়।

মুসলমানরা ফরয ও সুন্নাত ছালাত ছাড়াও বিভিন্ন সময় আরো কয়েক রাক্'আত্ ছালাত আদায় করে থাকে। এধরনের ছালাতকে নফল ছালাত বলা হয়। নফল ছালাত আদায় করা না-করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

# পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের রাকা'আত-সংখ্যা

| ফজর | যুহ্‌র | 'আছর | মাগরিব | 'ঈশা' |
|---|---|---|---|---|
| ২ সুন্নাত | ৪ সুন্নাত | ৪ সুন্নাত ※১ | | ৪ সুন্নাত ※১ |
| **২ ফরয** | **৪ ফরয** | **৪ ফরয** | **৩ ফরয** | **৪ ফরয** |
| | ২ সুন্নাত | | ২ সুন্নাত | ২ সুন্নাত |
| | ২ নফল | | ২ নফল | ২ নফল |
| | | | | ৩ বিত্‌র |
| | | | | ২ নফল |
| ৪ | ১২ | ৮ | ৭ | ১৭ |

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ছাড়াও অন্যান্য উপলক্ষে আরো ছালাত আদায় করতে হয়। যেমন ঃ প্রতি শুক্রবার ছালাতুল জুমু'আহ, দুই ঈদের সময় ছালাতুল 'ঈদুল ফিত্‌র ও ছালাতুল 'ঈদুল আয্‌হা এবং রামাদান মাসের রাতে ছালাতুত্‌ তারাবীহ। এসব ছালাতের রাক্‌'আত্‌-সংখ্যা নীচে দেয়া হল ঃ

| জুমু'আহ | 'ঈদুল ফিত্‌র | 'ঈদুল আয্‌হা | তারাবীহ |
|---|---|---|---|
| ৪ সুন্নাত | ২ ওয়াজিব | ২ ওয়াজিব | ২০ সুন্নাত |
| ২ ফরয | | | |
| ৪ সুন্নাত | | | |
| ২ সুন্নাত | | | |
| ২ নফল | | | |
| ১৪※২ | ২ | ২ | ২০ |

১ আছ্‌র ও 'ঈশা' ফরয ছালাতের পূর্ববর্তী এই সুন্নাত ছালাত হচ্ছে গায়েরে মুআক্কাদাহ (যা আদায় করার জন্যে তাকিদ করা হয়নি) তাই এ ছালাত নিয়মিত আদায় করা হয় না, মাঝে মাঝে আদায় করা হয়।

২ ছালাতুল জুমু'আহ এর চেয়ে বেশী রাকা'আত ও পড়া যেতে পারে।

‘ওয়াজিব’ কথাটি হানাফী ফিকাহ্তে এমন ধরনের বাধ্যতামূলক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় যা ফরয-এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। হানাফী ফিকাহ্র অনুসারীরা ছালাতুল জানাযাহ্, ছালাতুল ‘ঈদুল ফিত্র, ছালাতুল ‘ঈদুল আযহা ও ছালাতুল বিত্র্কে ওয়াজিব বলে গণ্য করে।

ছালাতুত্ তারাবীহ্ ‘ইশা’র দুই রাকা‘আত্ সুন্নাত ছালাতের পরে ও ছালাতুল বিত্রের আগে আদায় করতে হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ‘ইশা’র ছালাতের পরে ও ফজরের ছালাতের আগে এক ধরনের ছালাত নিয়মিত আদায় করতেন। একে তাহাজ্জুদ ছালাত বলা হয়। এ ছালাত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। ‘মুত্তাকী (আল্লাহ্প্রেমিক) মুসলমানগণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণে নিয়মিত এ ছালাত আদায়ের চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ যেসব লোক আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার আনন্দ লাভে আগ্রহী কেবল তাঁরাই তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এ থেকে কল্যাণ হাছিলের চেষ্টা করেন।

## যে সময় ছালাত আদায় করা অনুচিত ঃ

নিম্নলিখিত কয়েকটি সময়ে ছালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা উচিত ঃ

১। সূর্যোদয়ের শুরু থেকে সূর্য পুরোপুরি উঠার পর ১৫/২০ মিনিট পর্যন্ত।

২। সূর্য পুরোপুরি মধ্য আকাশে থাকাকালে।

৩। সূর্যাস্ত শুরু হওয়ার সময় থেকে সূর্য পুরোপুরি অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

৪। মহিলাদের জন্য মাসিক ঋতুস্রাব চলাকালে এবং সন্তান জন্মদানের পর যে রক্তপাত হয় তা চলাকালে সর্বোচ্চ ৪০ দিন পর্যন্ত, ছালাত আদায় করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

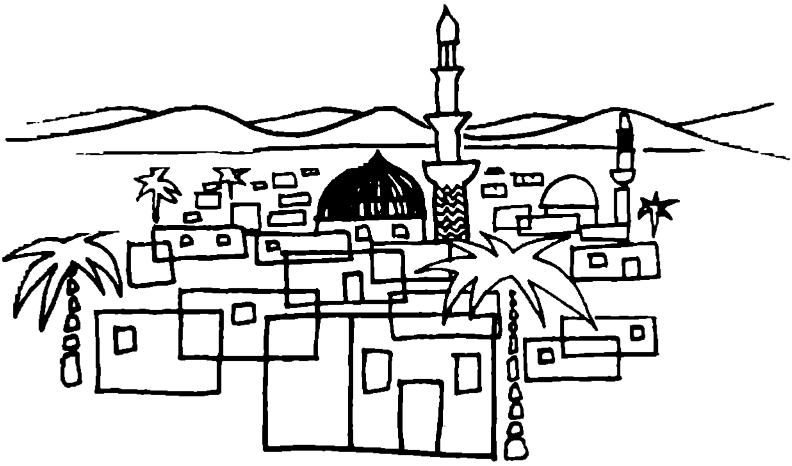

## ত আদায়ের নিয়ম

ছালাত আদায়ের জন্যে প্রথমেই তোমাকে এজন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, অন্য কথায়, ছালাতের পূর্বশর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে। তা হচ্ছে, তোমার 'উযূ' থাকতে হবে বা করে নিতে হবে এবং তোমাকে এব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তোমার শরীরের কোথাও কোন নাপাকী লেগে নেই, তোমার পরিধানের কাপড়-চোপড় পাক ও তুমি যেখানে ছালাত আদায় করবে সে জায়গাটি পাক। এরপর তোমাকে নীচের নিয়মে ছালাত আদায় করতে হবে ঃ

১। প্রথমে কা'বাহ্‌র দিকে মুখ করে দাঁড়াও। আরবী ভাষায় একে 'কিয়াম' বলা হয় এবং যে দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হয় সে দিককে বলা হয় 'কিবলাহ্'। বাংলাদেশ থেকে কিবলাহ্ প্রায় সোজা পশ্চিম দিকে। অন্যান্য দেশে কিবলাহ্‌র দিক হবে আলাদা। ছালাত শুরু করার আগে অবশ্যই তোমাকে কিবলাহ্‌র দিক সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে।

২। এরপর তোমাকে নিয়্যত করতে হবে, অর্থাৎ তুমি যে ছালাত শুরু করছ এ ব্যাপারে মনস্থির করতে হবে। তুমি চাইলে শুধু মনে মনে নিয়্যত করতে পারো, চাইলে নীচু স্বরে শব্দ ও বাক্যযোগেও নিয়্যত করতে পারো। নিয়্যতে কোন্ ওয়াক্তের কোন্ ধরনের ও কত রাকা'আত ছালাত তা উল্লেখ করতে হবে। যেমন ঃ ফজরের ফরয ছালাত আদায়ের নিয়্যত উল্লেখ করা হলো ঃ

"আমি আল্লাহ্‌র জন্যে কিবলাহ্-মুখী হয়ে ফজরের* দুই রাকা'আত* ফরয* ছালাত আদায়ের নিয়্যত করছি।"

৩। তোমার দুই হাত কান পর্যন্ত উঁচু কর। (মহিলাদের ও বালিকাদের কাঁধ পর্যন্ত উঁচু করতে হবে।) এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্‌বার– আল্লাহ্ সর্ব শ্রেষ্ঠ) বল। একে তাক্‌বীরাতুল ইহ্‌রাম বলা হয়। এর মানে হচ্ছে, এ তাক্‌বীর বলার সাথে সাথে দুনিয়ার কাজকর্ম তোমার জন্য হারাম হয়ে গেল।

---

* অন্যান্য ছালাতের ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য সেটি উল্লেখ করতে হবে।

৪। তোমার নাভীর ঠিক নীচে তোমার বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখ। (মহিলা ও বালিকাদেরকে বুকের ওপরে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখতে হবে।) এরপর ছানা' (ثَنَاء) পড় ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ
وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

সুব্‌হানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা
জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।

"হে আল্লাহ্! তোমারই পবিত্রতা ও তোমারই প্রশংসা। তোমার নাম বরকতময়,
তোমার মহিমা সুমহান, আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।"

এরপর পড়বে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

"আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।"

এরপর পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম

"সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।"

৫। সূরাহ আল্-ফাতিহাহ্ (কুর'আন মজীদের প্রথম সূরাহ) পড় ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল্ 'আলামীন। আর্-রাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি ইয়াউমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন, ইহ্‌দিনাছ্ ছিরাতাল মুস্‌তাকীম। ছিরাতাল্লাযীনা আন্'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগ্‌দুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ দাল্লীন।

"সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্‌র যিনি পরম দয়াময় ও মেহেরবান এবং শেষবিচার দিনের মালিক। আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদাত করি এবং শুধু তোমারই নিকট সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথে চালাও– তাদের পথে যাদেরকে তুমি নে'আমত দিয়েছ, তাদের পথে নয় যারা তোমার গযবের শিকার হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় **যারা গোমরাহ** হয়েছে।"

**এরপর নীচু স্বরে** বলবে آمين। (আমীন)।

মনে রাখবে, যে কোন ছালাতেই সূরাহ ফাতিহাহ পড়া বাধ্যতামূলক।

৬। এরপর কুর'আন মজীদের যে কোন সূরাহ (বা বড় সূরাহর অংশ, কমপক্ষে দুই আয়াত) পড়। যেমন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ .
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ .

**কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্ ছামাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়া লাম্ ইয়ুলাদ্। ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ্।**

"বল ঃ তিনিই আল্লাহ্! তিনি এক। আল্লাহ্ চিরন্তন অবিনশ্বর। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তিনি জন্ম নেন নি। আর তাঁর মত কেউই নেই।" (সূরাহ আল্-ইখলাছ-১১২)

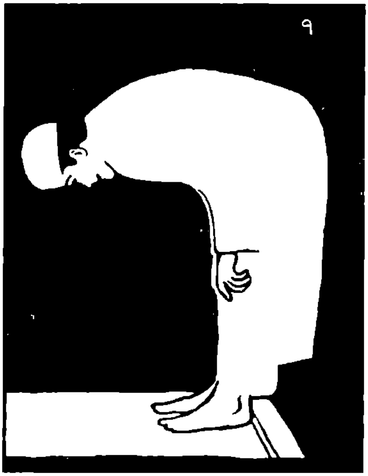


৭। اَللّٰهُ اَكْبَرُ –"আল্লাহু আক্‌বার" বলে মাথা ও শরীরের উপরের অংশ নীচু কর। তোমার হাতের দুই তালু দুই হাঁটুর ওপর রাখ। এবার তিন বার পড়

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

সুব্‌হানা রাব্বিয়াল 'আযীম (সব পবিত্রতা আমার রবের যিনি সুমহান)। এ অবস্থাটিকে রুকূ' (رُكُوْع) বলা হয়।

৮। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

– সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্ (যারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তা শোনেন) বলতে বলতে দাঁড়াও। দাঁড়িয়েই বলো ॥ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ – রাব্বানা লাকাল্ হাম্‌দ্ (হে আমাদের রব! তোমারই সকল প্রশংসা)। এভাবে কিয়ামের অবস্থায় ফিরে আসাকে ই'তিদাল্ (اعْتِدَال) বলা হয়।

৯। اَللّٰهُ اَكْبَرُ – "আল্লাহু আক্‌বার" বলে সিজদায় চলে যাও। সিজ্‌দাহ্‌র সময় কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মেঝে বা জায়নামায স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় তিনবার পড় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى – সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্‌ আ'লা (সব পবিত্রতা আমার রবের যিনি সর্বোচ্চ)। এ অবস্থাকে সিজ্‌দাহ্‌ বা সাজ্‌দাহ্‌ বলা হয়। সতর্ক থাকবে, সিজ্‌দাহ্‌র সময় যেন বাহু মেঝে স্পর্শ না করে।

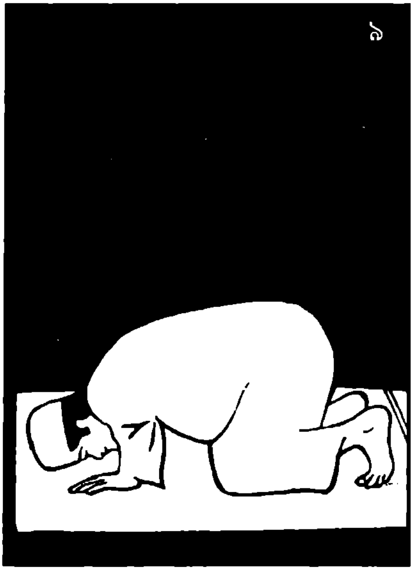


১০। اَللّٰهُ اَكْبَرُ – "আল্লাহু আক্‌বার" বলে মেঝে থেকে মাথা ও হাত তুলে হাঁটু ভাঁজ করে সোজা হয়ে বস এবং উভয় হাতের তালু হাঁটুর ওপর রাখ। কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ– "আল্লাহু আক্‌বার" বলে সিজ্‌দাহ্‌ কর ও তিনবার ঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى – "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্‌ আ'লা" পড়। এর পর اَللّٰهُ اَكْبَرُ– "আল্লাহু আক্‌বার" বলে সিজ্‌দাহ্‌ থেকে ওঠ।

দুই সিজ্দাহ্র মাঝখানের বিরতির সময় ইচ্ছা করলে নীচে পড়তে পার ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

রাব্বিগ্ফির্লী ওয়ার্হাম্নী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আফিনী ওয়ার্যুক্নী।

"হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হেদায়াত কর, আমাকে মাফ কর, আমাকে রিযিক দান কর।"

দ্বিতীয় সিজ্দাহ্ থেকে ওঠার সাথে সাথে এক রাকা'আত্ শেষ হলো। এরপর একই নিয়মে দ্বিতীয় রাক্'আত্ আদায় করবে। তবে এ ক্ষেত্রে ছানা' (সুবহানাকা ......) তা'আওউয্ ('আউযু বিল্লাহ্ ......) ও তাস্মীয়াহ্ (বিস্মিল্লাহ্ .....) পড়তে হবে না। দ্বিতীয় রাক্'আতের দ্বিতীয় সিজ্দাহ্র পরে সোজা হয়ে বস এবং নীরবে নীচের তাশাহ্হুদ পড় ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ.

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাত্। আস্সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিছ্ ছালেহীন। আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহূ।

"সকল উত্তম সম্বোধন, ছালাত ও যাকিছু উত্তম তা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার ওপর সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত। আমাদের ওপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাহ্দের ওপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল।" (বুখারী ও মুসলিম)

ছালাত তিন রাকা'আত্ হলে (যেমন ঃ মাগরিবের ক্ষেত্রে) বা চার রাকা'আত্ হলে (যেমন ঃ যুহ্র্, আছ্র ও 'ইশা'য়) দ্বিতীয় রাক্'আতে তাশাহুদ পড়ার পর পরবর্তী রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু দুই রাক্'আতের ছালাতের ক্ষেত্রে তাশাহ্হুদের পরে না উঠে বসে থাকবে এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) এর ওপর ছালাত বা দরূদ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

আল্লাহুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীম। ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম্। ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর রহমত ও বরকত দান কর ঠিক যেভাবে ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের ওপর রহমত ও বরকত দান করেছিলে। নিঃসন্দেহে তুমি চিরপ্রশংসিত ও চিরমহীয়ান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর বরকত নাযিল কর ঠিক যেভাবে বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের ওপর। নিঃসন্দেহে তুমি চিরপ্রশংসিত ও চিরমহীয়ান।" (মুসলিম)

এরপর নীচের দু'আ দু'টি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ
أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ .

আল্লাহুম্মা ইন্নী যালাম্তু নাফ্সী যুলমান্ কাছিরাঁও ওয়া লা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্তা। ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম্ মিন ইন্দিকা ওয়ারহাম্নী। ইন্নাকা আন্তাল্ গাফুরুর রাহীম।

"হে আল্লাহ্! নিঃসন্দেহে আমি আমার নিজের ওপর অনেক অন্যায় করেছি এবং তুমি ছাড়া কেউই গুনাহ্ মাফ করতে পারে না। অতএব, তোমার নিজের পক্ষ থেকে আমাকে পুরোপুরি মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।" (বুখারী ও মুসলিম)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.
رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

রাব্বীজ্‌'আল্‌নী মুকীমাছ্‌ ছালাতি ওয়া মিন্‌ যুর্‌রিয়াতী। রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল্‌ দু'আ। রাব্বানাগ্‌ ফির্‌লী ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল্‌মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল্‌ হিছাব।

"হে আমার রব! আমাকে ও আমার বংশধরদেরকে ছালাত কায়েমকারী বানাও। হে আমাদের রব! আমাদের দু'আ কবুল কর। হে আমাদের রব! শেষবিচারের দিনে আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মু'মিনদেরকে ক্ষমা কর।" (সূরাহ ইব্‌রাহীম- ১৪ ঃ ৪০-৪১)

১১। এবার তোমার মুখ ডান দিকে ফিরিয়ে বল ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌।

"আপনাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।"

তারপর বাম মুখ ফিরিয়ে উপরের কথাটি পুনরায় বল।

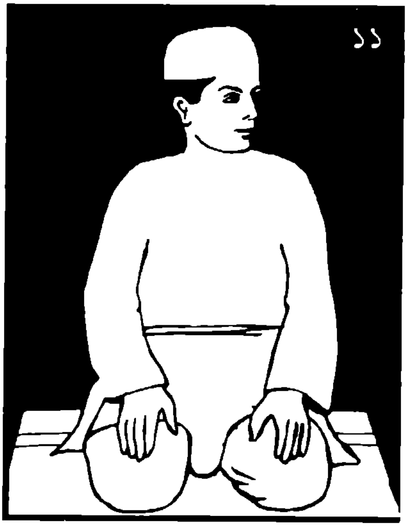


দুই রাকা'আত্‌ ছালাত আদায়ের এটাই নিয়ম।

যুহ্‌র, 'আছ্‌র ও 'ইশা'র চার রাকা'আত্‌ ফরয ছালাত, মাগরিবের তিন রাকা'আত্‌ ফরয ছালাত ও বিত্‌রের তিন রাকা'আত্‌ ছালাতের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট এক বা দুই রাকা'আত্‌ ছালাত একই নিয়মে আদায় করবে। তবে ফরয ছালাতের শেষ দুই রাকা'আত্‌ বা মাগরিবের শেষ রাক্‌'আতের ক্ষেত্রে সুরাহ্‌ আল্‌-ফাতিহার পরে অন্য সূরাহ পড়তে হবে না। কিন্তু বিত্‌র্‌ ও চার রাকা'আত্‌ সুন্নাত ছালাতের বেলায় প্রথম দুই রাকা'আতের পরের দুই বা এক রাক্‌'আতেও সুরাহ্‌ আল্‌-ফাতিহার পরে অন্য সূরাহ পড়তে হবে।

ফজর্‌, মাগ্‌রিব ও 'ইশা'র ফরয ছালাতের প্রথম দুই রাকা'আতে অন্যদের শোনার মত শব্দ করে কুরআন পড়তে হয়। কিন্তু যুহ্‌র্‌ ও 'আছ্‌রের ছালাতে নীরবে পড়তে হয়। সব রকম ছালাতেই তাস্‌বীহ্‌ (সুব্‌হানা রাব্বীয়াল 'আযীম ও সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা) তাশাহ্‌হুদ ও দরূদ নীরবে পড়তে হয়।

ফজর, মাগরিব ও 'ইশা'র ছালাত জামা'আতে আদায় করার সময় শুধু ইমাম সাহেব শব্দ করে কুর'আন পড়বেন। জুমু'আহ اَلْجُمُعَة ছালাতের বেলায়ও তাই।

## ছালাতুল বিত্‌র صَلاَةُ الْوِتْرِ

বিত্‌র (বেজোড়) ছালাত তিন রাকা'আত্‌। এর প্রথম দুই রাকা'আত্‌ মাগরিবের প্রথম দুই রাকা'আতের মতো। এরপর তাশাহ্‌হুদ শেষ হবার সাথে সাথে আল্লাহু আক্‌বার বলে তৃতীয় রাক্‌'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। সুরাহ্‌ আল্‌-ফাতিহাহ্‌ ও অন্য একটি সূরাহ বা কয়েকটি আয়াত পড়বে। এরপর রুকূতে যাবার আগে আল্লাহু আক্‌বার বলে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে নামিয়ে আনবে ও নিয়ম মত বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখবে। তারপর নীচের দু'আটি পড়বে। এটিকে দু'আ আল্‌-কুনুত্‌ বলা হয়।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা'ঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু

'আলাইকা ওয়া নুছ্নী 'আলাইকাল খাইরা ওয়া নাশ্কুরুকা ওয়া লা নাক্ফুরুকা ওয়া নাখ্লা'উ ওয়া নাত্রুকু মাইঁ-ইয়াফ্জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাস্জুদু ওয়া ইলাইকা নাস'আ ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নার্জু রাহ্মাতাকা ওয়া নাখ্শা 'আযাবাকা ইন্না 'আযাবাকা বিল্ কুফ্ফারি মুল্হিক।

"হে আল্লাহ্! অবশ্যই আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ঈমান পোষণ করি, তোমারই ওপর নির্ভর করি, তোমারই প্রতি শুকরিয়া জানাই, আর তোমার প্রতি অকৃজ্ঞতা করি না এবং পাপাচারীদের থেকে দূরে থাকি ও তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই 'ইবাদাত করি ও তোমারই জন্যে ছালাত আদায় করি ও তোমাকেই সিজ্দাহ্ করি, তোমারই দিকে ধাবিত হই, আমরা তোমারই রহমতের আশা করি এবং তোমারই 'আযাবকে ভয় করি। নিঃসন্দেহে তোমার 'আযাব কাফিরদেরকেই গ্রাস করবে।" (বাইহাকী)

এ দু'আর পর "আল্লাহু আক্বার" বলে রুকূতে যাবে এবং মাগরিব ছালাতের মত ছালাত শেষ করবে।

হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা উপরের দু'আটি পড়ে থাকে। অনেকে এর পরিবর্তে অপর একটি দু'আ পড়ে থাকে। তা হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي
فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ،
فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফীমান্ হাদাইত, ওয়া 'আফিনী ফীমান্ 'আফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইত, ওয়া বারিক্লী ফীমা আ'তাইত, ওয়া কিনী শার্রা মা কাদাইত। ফা ইন্নাকা তাক্বদী ওয়া লা ইউক্দা 'আলাইক। ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান্ ওয়ালাইত। তাবারাক্তা রাব্বানা ও তা'আলাইত।

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার পথে চালিত কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছ। আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করে ক্ষমা কর যাদেরকে তুমি ক্ষমা করেছো, তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ

করেছো, আমাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বরকত দান কর। তুমি যে ক্ষতির ফায়সালা করে রেখেছো তা থেকে আমাকে রক্ষা কর, কারণ কেবল তুমিই ফায়সালাকারী, তোমার ওপর কেউ ফায়সালা করতে পারে না। নিঃসন্দেহে তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ সে অপদস্থ হয় না। হে আমাদের রব! তুমি পরম বরকতময় ও সমুন্নত মহান।" (আবুদাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ্)

## সাজ্দাতুস সাহ্ও ঃ سَجْدَةُ السَّهْوِ

## (ভুলের জন্য সিজ্দাহ্)

যেহেতু আমরা মানুষ, তাই আমরা ভুলত্রুটির উর্ধে নই। আমরা যদি ছালাতের করণীয় কাজগুলোর মধ্যে কোন কাজ আঞ্জাম দিতে ভুলে যাই তাহলে দু'টি অতিরিক্ত সিজ্দাহ্ করে আমাদেরকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। একে সাজ্দাতুস্ সাহ্ও (প্রচলিত কথায় সোহু সেজ্দাহ্) বলা হয়।

এই সিজ্দাহ ছালাতের অন্যান্য সিজ্দাহর অনুরূপ। ছালাতের শেষ রাক্'আতে বসে থাকা অবস্থায় এ সিজ্দাহ করতে হয়। তাশাহ্হুদ পড়ার পরে (দরূদ না পড়ে) ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে "আস্সালামু 'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্" বলে মুখ সামনের দিকে করে দু'টি সিজ্দাহ করবে। উভয় সিজ্দায়ই নিয়ম মাফিক "সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা" পড়বে। এরপর বসা অবস্থায় তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দু'আ পড়বে। সবশেষে প্রথমে ডানে ও পরে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে "আস্সালামু 'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্" বলবে।

কোন কোন মতের অনুসারী মুসলমানরা কিছুটা ভিন্ন নিয়মে সাজ্দাতুস্ সাহ্ও করে থাকে। তারা ছালাতের শেষ রাক্'আতে বসা অবস্থায় প্রথমে তাশাহ্হুদ ও দরূদ পড়ে। এরপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে "আস্সালামু 'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্" বলে এবং মুখ সামনের দিকে ফিরিয়ে দু'টি অতিরিক্ত সিজ্দাহ্ করে যাতে "সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা" পড়ে। এরপর প্রথমে ডানে ও পরে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে "আস্সালামু 'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্" বলে।

ছালাতের মধ্যকার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে ভুলে গেলে বা বড় ধরনের ভুল কাজ করলে সাজ্দাতুস্ সাহ্ও করতে হয়। যেমন ঃ সুরাহ্ আল্-ফাতিহার পর কুরআনের অন্য সূরাহ বা কতক আয়াত পড়তে ভুলে গেলে, বা চার রাক্'আত্ ছালাতে দ্বিতীয় রাক্'আতে তাশাহুদ পড়তে ভুলে গেলে বা চার রাক্'আত্ ছালাতের দ্বিতীয় রাক্'আত্ শেষে সালাম বললে।

কিন্তু মনে রাখবে, নীচে উল্লেখকৃত ভুলগুলোর যে কোন একটি হলেই ছালাত বাতিল হয়ে যাবে।

১। নিয়্যত করতে ভুলে গেলে।

২। তাক্বিরাতুল ইহ্রাম বলতে ভুলে গেলে।

৩। সুরাতুল্ ফাতিহাহ্ পড়তে ভুলে গেলে।

৪। রুকূ' বা সিজ্দাহ্ না করলে বা করতে ভুলে গেলে।

৫। কিবলাহ্-মুখী না হলে।

৬। 'উযূ' না থাকলে।

৭। ছালাতের মধ্যে কথা বললে।

৮। ছালাতের মধ্যে থাকাকালে কিছু খেলে বা পান করলে।

৯। তাশাহ্হুদের জন্যে না বসলে।

এসব ক্ষেত্রে সাজ্দাতুস্ সাহ্ও দ্বারা ভুলের ক্ষতিপূরণ হবে না। বরং নতুন করে ছালাত আদায় করতে হবে।

## ছালাতুল্ জুমু'আহ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

ছালাতুল জুমু'আহ মানে শুক্রবারের ছালাত। (অনেকে ভুলবশতঃ জুম্মা বা জুমা বলে থাকে।) শুক্রবার যুহ্রের ওয়াক্তে যুহ্রের চার রাক্'আত্ ফরয ছালাতের পরিবর্তে জামা'আতে দুই রাকা'আত্ ছালাত আদায় করা হয়। একে ছালাতুল্ জুমু'আহ বলা হয়। সকল বালেগ ও সুস্থ মুসলমান পুরুষের জন্য ছালাতুল্ জুমু'আহ ফরয। মহিলাদের জন্য ছালাতুল্ জুমু'আহ ফরয নয়। তবে ঘরের কাজ-কর্মে অসুবিধা না হলে তারাও ছালাতুল্ জুমু'আয় শরীক হতে পারে।

ছালাতুল্ জুমু'আহ আদায় করার জন্য শুক্রবার মধ্যদুপুরের পর থেকে মুছাল্লীরা মসজিদে জমায়েত হতে থাকে। মসজিদে আসার পর তারা চার রাকা'আত্ বা বেশী সুন্নাত ছালাত আদায় করে। এরপর ইমাম সাহেব খুৎবাহ্ (ভাষণ) দেন। খুৎবাহ্র পরে তাঁর ইমামতিতে সকলে দুই রাকা'আত্ ফরয ছালাত আদায় করে। ফরয ছালাতের পর মুছাল্লীরা একা একা ছয় রাকা'আত্ বা তার বেশী সুন্নাত ও নফল ছালাত আদায় করে।

মুসলমানরা একটি সংঘবদ্ধ আদর্শিক জনগোষ্ঠী (উম্মাহ্)। ছালাতুল জুমু'আহ্ হচ্ছে একটি সমষ্টিগত ছালাত। এক একটি এলাকার মুসলমানরা প্রতি সপ্তাহে একবার অর্থাৎ প্রতি

শুক্রবার, নিকটবর্তী মসজিদে জমায়েত হয়ে এ ছালাত আদায় করে। শুক্রবার মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক 'ঈদের মত।

হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সময় মসজিদ ছিল মুসলমানদের সকল ইসলামী কর্মতৎপরতার কেন্দ্র। কিন্তু বর্তমানে মসজিদগুলোর সে অবস্থা নেই।

ছালাতুল জুমু'আহ একটি এলাকা বা মহল্লার মুসলমানদের জন্য একত্রিত হওয়ার উপলক্ষ্যস্বরূপ। ছালাতুল জুমু'আহ্ তাদেরকে পরস্পরের সাথে দেখা- সাক্ষাত, আলোচনা ও তাদের সামষ্টিক সমস্যাবলী সমাধানের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও সমঝোতা গড়ে ওঠে।

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি বা স্থানীয় নেতা রাজধানীর বা সংশ্লিষ্ট জনপদের প্রধান মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জামা'আতে ও ছালাতুল জুমু'আয় ইমামতী করবেন এটাই নিয়ম। কারণ মদীনায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তা-ই করেছিলেন। বর্তমানেও ইসলামী রাষ্ট্রে এ নিয়মই হওয়া উচিত।

এমন একটি মুসলিম দেশে বসবাস করা কতই না আনন্দের যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি বা স্থানীয় নেতা রাজধানীর বা সংশ্লিষ্ট শহর-জনপদের কেন্দ্রীয় মসজিদে ছালাতের জামা'আতে ইমামতী করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলিম দেশে পুনরায় এ অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করুন। আমীন।

## ছালাতুল্ জানাযাহ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ

আমরা ইতিপূর্বে 'মৃত্যু' উপশিরোনামে মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করেছি ও প্রসঙ্গতঃ ছালাতুল জানাযাহর কথা উল্লেখ করেছি।

আমাদের সকলকেই মরতে হবে। একজন মুসলমান ইন্তেকাল করলে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত সহজ সরল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে কবর দেয়া হয়। প্রথমে তাকে গোসল দেয়া হয় ও কাফন পরানো হয়, এরপর জামা'আতে ছালাতুল জানাযাহ (মৃতের সৎকারের ছালাত) আদায় করা হয়। ছালাতুল জানাযাহর নিয়ম অন্যান্য ছালাত থেকে আলাদা। এতে রুকূ' ও সিজ্দাহ করতে হয় না এবং তাশাহ্হুদ পড়তে হয় না।

ছালাতুল্ জানাযাহ হচ্ছে ফর্যে কিফায়া অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর সমষ্টিগত ফরয যা সমষ্টির পক্ষ থেকে কিছু লোক আদায় করলেই আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউই যদি তা

আদায় না করে তাহলে সংশ্লিষ্ট মহল্লা বা জনপদের সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহ্‌গার হবে।

## ছালাতুল্ জানাযাহ আদায়ের নিয়মাবলী নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

১। এই মর্মে নিয়্যত কর যে, তুমি মৃত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আর উদ্দেশ্যে ছালাতুল জানাযাহ আদায় করবে।

২। কিবলাহ্ মুখী হয়ে ছালাতের কাতারে দাঁড়াও। উল্লেখ্য, জানাযাহর কফিন একটি মুর্দা-খাটের ওপরে ছালাতুল্ জানাযাহর জামা'আতের সামনে রাখা হয়।

৩। ইমাম সাহেব শব্দ করে 'আল্লাহু আক্‌বার' বলার পর সাথে সাথে সকলের সাথে 'আল্লাহু আক্‌বার' বল ও দুই হাত কান পর্যন্ত উঁচু কর। (মনে রাখবে, একে তাক্‌বীরাতুল ইহ্‌রাম বলা হয়। এরপর আরো তিনটি তাক্‌বীর বলতে হবে।) হাত নামিয়ে এনে নাভীর নীচে বা বুকের উপর বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখ। এরপর নীচের দু'আটি পড় ঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ
ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

সুব্‌হানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।

"হে আল্লাহ্! তোমারই পবিত্রতা ও তোমারই প্রশংসা, আর তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহিমা সুমহান, তোমার প্রশংসা সমুদ্ভাসিত এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।"

(কোন কোন মতের অনুসারী মুসলমানরা এ দু'আর পরিবর্তে সুরাতুল্ ফাতিহাহ্ পড়ে)।

৪। এরপর ইমাম সাহেব শব্দ করে 'আল্লাহু আক্‌বার' বলবেন। তখন তোমাকেও চুপে চুপে এই তাক্‌বীর বলতে হবে। (এ সময় কান পর্যন্ত হাত তোলার প্রয়োজন নেই) এরপর দরুদ পড় ('ছালাত আদায়ের নিয়ম' উপশিরোনামে দরুদ উল্লেখ করা হয়েছে; দেখে নাও)।

৫। এরপর ইমাম সাহেব শব্দ করে তাক্‌বীর বলবেন এবং ছালাতুল জানাযায় অংশগ্রহণকারী অন্য সকলে চুপে চুপে তাক্‌বীর বলবে। অতঃপর মৃতব্যক্তি বালেগ পুরুষ লোক হলে চুপে চুপে নীচের দু'আটি পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا . اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ .

আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্ লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ও কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্‌না ফাআহ্‌য়িহি 'আলাল ইস্‌লাম। ওয়া মান্ তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্‌না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল ঈমান।

"হে আল্লাহ্! আমাদের জীবিতদের ও মৃতদের, আমাদের উপস্থিতদের ও অনুপস্থিতদের, আমাদের ছোটদের ও বড়দের এবং আমাদের পুরুষদের ও নারীদের ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্য থেকে যাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে ইসলামের ওপর বাঁচিয়ে রাখ, আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দাও।" (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

মৃত ব্যক্তি বালেগা স্ত্রীলোক হলে উক্ত দু'আর দ্বিতীয় বাক্যটি এভাবে পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهَا مِنَّا فَأَحْيِهَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهَا مِنَّا فَتَوَفَّهَا عَلَى الْإِيْمَانِ .

আল্লাহুম্মা মান্ আহ্‌ইয়াইতাহা মিন্না ফাআহ্‌য়িহা 'আলাল্ ইস্‌লাম। ওয়া মান্ তাওয়াফ্‌ফাইতাহা মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহা 'আলাল্ ঈমান।

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্য থেকে যে নারীকে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে ইসলামের ওপর বাঁচিয়ে রাখ, আর আমাদের মধ্য থেকে যে নারীকে মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দাও।"

মৃত ব্যক্তি নাবালেগ ছেলে হলে পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَآ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا .

আল্লাহুম্মাজ্'আল্‌হু লানা ফারাত্বাওঁ ওয়াজ'আল্‌হু লানা আজরাওঁ ওয়া যুখ্‌রাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা শাফি'আওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফা'আ।

"হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী বানিয়ে দাও। তাকে আমাদের জন্য পুরস্কার ও সঞ্চয় স্বরূপ কর। তাকে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী বানাও এবং তাকে এ মর্যাদা দাও যে, তার শাফা'আত যেন কবুল হয়।"

মৃত ব্যক্তি নাবালিকা মেয়ে হলে পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً.

আল্লাহুম্মাজ্‌'আল্‌হা লানা ফারাত্বাওঁ ওয়াজ'আলহা লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ'আল্‌হা লানা শাফি'আতাওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফা'আহ্।

"হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তিনী বানিয়ে দাও। তাকে আমাদের জন্য পুরস্কার ও সঞ্চয় স্বরূপ কর, তাকে আমদের জন্য শাফা'আতকারিনী বানাও এবং তাকে এ মর্যাদা দাও যে, তার শাফা'আত যেন কবুল হয়।"

৬। মৃত ব্যক্তির জন্য যে দু'আটি প্রযোজ্য তা পড়ার পর ইমাম সাহেব শব্দ করে চতুর্থ তাক্‌বীর বলবেন এবং ছালাতুল জানাযায় শরীক অন্য সকলে চুপেচুপে তাক্‌বীর বলবেন।

৭। এরপর ইমাম সাহেব প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে ও পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে 'আস্‌সালামু আলাইকুম্ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ' বলবেন। অন্যরাও ইমামের অনুসরণে ডান-বামে মুখ ফিরিয়ে সালামের কথাগুলো চুপেচুপে বলবে।

এভাবে ছালাতুল্ জানাযাহ্ শেষ হবে।

## ছালাত-পরবর্তী কয়েকটি দু'আ

## بَعْضُ الْاَدْعِيَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

ছালাতের পরে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়া ও তাঁর অনুগ্রহের জন্যে আবেদন জানানো খুবই ভাল কাজ। এ ধরনের আবেদন-নিবেদনকে আরবী ভাষায় দু'আ বলা হয়। তুমি তোমার নিজের ভাষায় অর্থাৎ নিজের তৈরী বাক্য

দ্বারা মাতৃ-ভাষায়ও দু'আ করতে পার। তবে আরবী ভাষায় কতগুলো দু'আ মুখস্ত করে রাখা খুবই ভাল। নীচের কয়েকটি দু'আ ও তার অর্থ উল্লেখ করা হল ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা 'আযাবান্নার।

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার বুকে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও, আর আমাদেরকে দোজখের 'আযাব থেকে রক্ষা কর।" (সুরাহ্ আল্-বাকারাহ্– ২ ঃ ২০১)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

রাব্বানা যালাম্‌না আন্‌ফুসানা ওয়া ইল্লাম্ তাগ্‌ফির্‌লানা ওয়া তারহাম্‌না লানাকুনান্‌না মিনাল্ খাসিরীন্।

"হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। অতএব, তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর ও দয়া না কর তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (সূরাহ আল্-আরাফ ৭ ঃ ২৩)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালাম, ওয়া মিন্‌কাস্ সালাম, তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্ জালালি ওয়াল ইক্‌রাম।

"হে আল্লাহ্! তুমিই শান্তি ও তোমার নিকট থেকেই শান্তি, তুমি পরম বরকতময়, হে পরাক্রমশালী ও মহাসম্মানিত।" (মুসলিম)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহ্। লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদির। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়া লা ইয়ানফা'উ যাল্‌জাদ্দি মিন্‌কাল্ জাদ্দ্।

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপরই শক্তিমান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান করতে চাও তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও তাও কেউ দিতে পারে না। তুমি কল্যাণ না দিলে, সম্পদ কোন সম্পদশালীকে কল্যাণ দিতে পারে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

## কাযা' (বাদপড়া ছালাত আদায়) (قَضَاء)

আমাদের অবশ্যই যথাসময়ে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করা উচিত। কোন ওয়াক্তের ফরয ছালাতই যাতে বাদ না পড়ে সেজন্যে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে। তারপরও কোন কারণে যদি তুমি যথাসময়ে কোন ছালাত আদায় করতে না পার, তাহলে অবশ্যই তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করবে। বাদ পড়ে যাওয়া ফরয ছালাতকে পরে আদায় করাকে কাযা' বলা হয়। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ফরয ছালাত আদায় করতে হবে।

## অনুশীলনী (দুই ঃ ক)

### ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১ -১৪ বছর)

১। ইসলাম নির্ধারিত পাঁচটি মৌলিক কর্তব্যের নাম উল্লেখ কর এবং একজন মুসলমানের জীবনে এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।

২। শাহাদাহ বা ঈমানের ঘোষণাটি লিখ।

৩। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম লিখ এবং বিভিন্ন ওয়াক্তের মধ্যকার ব্যবধানের কারণ ব্যাখ্যা কর।

৪। ফরয মানে কি? দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে ছালাতে কত রাক্'আত্ ফরয ছালাত আছে উল্লেখ কর।

৫। তাহারাহ বলতে কি বুঝ?

৬। কোন্ কোন্ সময় আমাদের ছালাত আদায় করা উচিত নয়?

৭। নীচের শব্দগুলোর অর্থ লিখ ঃ

ক) কিবলাহ খ) কিয়াম গ) রুকূ' ঘ) সাজ্দাহ

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। 'ইসলামের ফরয কাজসমূহ' অধ্যায়ের শুরুর দিকে উল্লেখকৃত 'ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তিশীল'– হাদীছটি পড়। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অনুসরণ কিভাবে একজন মুসলমানের জীবনকে বদলে দিতে পারে। এ হাদীছের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। "নিয়মিত ছালাত আদায় করা সত্ত্বেও যদি আমাদের জীবনে তার কোন প্রভাব না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় কোন ভুল রয়ে গেছে।" ব্যাখ্যা কর।

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। "মৃত্যুর পরে আমরা যখন আল্লাহ্র সামনে হাযির হব তখন সব কিছুর আগে আমাদেরকে ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" ছালাতের সুফল সম্পর্কে এ উক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। ছালাতের শুরুতে নিয়্যত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজেই নিয়্যত এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

## অনুশীলনী (দুই ঃখ)

### ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম লিখ এবং তার সময় উল্লেখ কর।

২। 'উযূ' শেষ করার পর তোমার কি পড়া উচিত? বাংলায় এর অর্থ লিখ।

৩। কি কারণে নতুন করে 'উযূ' করা প্রয়োজন হয়?

৪। একজন মুসলমানের জীবনে তাহারাহ্ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৫। তায়াম্মুম কি? একজন মুসলমানকে কি জন্য তায়াম্মুম করতে হয়?

৬। নীচের বাক্য দু'টির অর্থ লিখ ঃ

ক) বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

খ) আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম।

# অনুশীলনী (দুই ঃ গ)

## ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। রুকূ'তে যে তাস্‌বীহ্ পড়া হয় তার অর্থ কি?

২। আমরা সিজ্‌দায় কি পড়ি?

৩। সাজ্‌দাতুস্ সাহ্ও কি? যে কারণে সাজ্‌দাতুস্ সাহ্ও করতে হয় এমন দু'টি কারণ উল্লেখ কর।

৪। ছালাত বাতিল হয়ে যায় এমন চারটি কারণ উল্লেখ কর।

৫। ছালাতুল্ জুমু'আর গুরুত্ব উল্লেখ কর।

৬। কখন ছালাত আদায় করা ঠিক নয়?

৭। ছালাতুল্ জানাযাহ কি? কোন্ অবস্থায় ছালাতুল্ জানাযাহ না পড়লে গুনাহ হবে?

# কুরআন মজীদের এগারটি সূরাহ

# إِحْدَى عَشَرَ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ

## ১। সূরাহ আল্-ফাতিহাহ্ (সূরাহ নং-১) سُوْرَةُ الْفَاتِحَة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আর্-রাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন। ইহ্‌দিনাস্ ছিরাতাল মুস্‌তাকিম। ছিরাতাল্‌লাযীনা আন্'আম্‌তা 'আলাইহিম। গাইরিল মাগ্‌দূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বাল্লীন।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্‌র জন্যে,

(যিনি) পরম দয়াময় মেহেরবান,

শেষ বিচার দিনের মালিক।

আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদত করি এবং আমরা কেবল তোমারই নিকট সাহায্য চাই।

আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে চালাও– তাদের পথে যাদের ওপর তুমি নি'আমত বর্ষণ করেছ, তাদের পথে নয় যারা তোমার গযবের শিকার হয়েছে ও যারা গোমরাহ হয়েছে।

## ২। সূরাহ আন্-নাস (সূরাহ নং-১১৪) سُوْرَةُ النَّاس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. اِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِى يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ নাস্। মালিকিন্-নাস্। ইলাহিন্-নাস্। মিন শার্রিল ওয়াছ্ওয়াছিল্-খান্নাস্। আল্লাযী ইউওয়াছবিছু ফী ছুদূরিন্-নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্-নাস্।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে।

বল ঃ আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির রবের নিকট যিনি মানব- জাতির মালিক ও মানবজাতির ইলাহ্ (উপাস্য)- (আমি আশ্রয় চাই) গোপনে কুমন্ত্রণাদানকারীর (শয়তানের) কুমন্ত্রণার অনিষ্টতা থেকে- যে মানবজাতির অন্তরে গোপনে কুমন্ত্রণা দেয়- জিন ও মানবজাতির মধ্যকার (সেই কুমন্ত্রণাদানকারীদের থেকে আশ্রয় চাই)।

## ৩। সূরাহ আল্-ফালাক্ (সূরাহ নং-১১৩) ঃ سُوْرَةُ الْفَلَق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِيْ الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

কুল্ আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক্। মিন্ শার্রি মা খালাক্। ওয়া মিন্ শার্রি গাছিকিন্ ইযা ওয়াকাব্। ওয়া মিন্ শার্রিন্-নাফ্ফাছাতি ফিল্ উকাদ। ওয়া মিন্ শার্রি হাছিদিন্ ইযাহাছাদ্।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

বল ঃ আমি আশ্রয় চাই ঊষার রবের নিকট– তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর সেই অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়ে যায়, আর (সূতার) গিঁটে ফুৎকারদানকারিনী (যাদুকর)দের অনিষ্ট হতে, এবং হিংসুকদের অনিষ্ট হতে যখন তারা হিংসা করে।

৪। সূরাহ আল্-ইখ্‌লাছ (সূরাহ নং- ১১২) ঃ سُوْرَةُ الإِخْلَاص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ .اَللهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ .
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্-ছামাদ। লাম ইয়ালিদ্ ওয়া লাম্ ইয়ূলাদ্। ওয়া লাম ইয়াকু'ল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ্।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

বল ঃ তিনিই আল্লাহ্, তিনি এক। আল্লাহ্ চিরন্তন অবিনশ্বর। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তিনি (কারো মাধ্যমে) জন্ম নেন নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

৫। সূরাহ আল্-লাহাব (সূরাহ নং-১১১) ঃ سُوْرَةُ اللَّهَب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ . مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَمَا كَسَبَ .
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهٗ حَمَّا لَةَ الْحَطَبِ . فِيْ
جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

তাব্বাত্ ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ ওয়া তাব্ব্। মা আগ্‌না 'আন্‌হু মালুহু ওয়া মা কাছাব্। ছাইয়াছলা নারান্ যাতা লাহাব্। ওয়াম্‌রাআতুহু হাম্মালাতাল্ হাতাব্, ফী জীদিহা হাব্‌লুম মিম্ মাছাদ্।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হয়েছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। তার ধনসম্পদ আর সে যা কিছু উপার্জন করেছে তা তাকে আল্লাহ্ হতে বাঁচাতে পারে নি। সে অতি শীঘ্রই লেলিহান শিখাময় আগুনে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। আর তার জ্বালানী কাঠ আহরণকারিনী স্ত্রীও (তাতে প্রবেশ করবে); তার ঘাড়ে জড়ানো থাকবে খেজুর পাতার তৈরী রশি।

৬। সূরাহ আন্-নাছ্‌র (সূরাহ নং- ১১০) ঃ سُوْرَةُ النَّصْر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ
اللّٰهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

ইযা জায়া নাছরুল্লাহি ওয়াল্‌ফাত্‌হ। ওয়া রাআইতান্নাছা ইয়াদ্‌খুল্‌না ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগফির্‌হু ইন্নাহু কানা তাউয়াবা।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তোমার রবের প্রশংসাসহ তাস্‌বীহ্ কর এবং তাঁর নিকট ইস্তিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কর। নিঃসন্দেহে তিনি (তাঁর বান্দাহ্‌দের প্রতি) ক্ষমা প্রদর্শনকারী।

৭। সূরাহ আল্-কাফিরুন (সূরাহ নং-১০৯) سُوْرَةُ الْكَافِرُوْن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ.
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন্। লা আ'বুদু মা তা'বুদুন্। ওয়া লা আনতুম্ 'আবিদুনা মা আ'বুদ্। ওয়া লা আনা 'আবিদুম্ মা 'আবাদ্‌তুম। ওয়া লা আনতুম্ 'আবিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়া লিয়া দীন্।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

বল ঃ হে কাফিরগণ! তোমরা যার 'ইবাদাত কর আমি তার 'ইবাদাত করি না। আর আমি যার 'ইবাদত করি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার 'ইবাদাত করছ আমি তার 'ইবাদাতকারী নই। আর আমি যার 'ইবাদাত করছি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী নও। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য।

৮। সূরাহ্ আল্-কাওছার (সূরাহ নং-১০৮) سُوْرَةُ الْكَوْثَر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

ইন্না আ'তাইনাকাল-কাওছার। ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্‌হার। ইন্না শানিআকা হুয়াল্-আব্‌তার।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে কাওছার (আধিক্যের উৎস) দিয়েছি। অতএব, (শুকরিয়াস্বরূপ) ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতি বিদ্বেষী ব্যক্তিই লেজকাটা (উত্তরাধিকারীবিহীন)।

৯। সূরাহ আল্-মা'উন (সূরাহ নং-১০৭) ঃ سُوْرَةُ الْمَاعُوْن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আ'রাআইতাল্লাযী ইউকায্‌যিবু বিদ্‌-দীন। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'উল্‌ ইয়াতীম, ওয়া লা ইয়াহুদ্দু 'আলা তা'আমিল্‌ মিস্‌কীন। ফাওয়াইলুল্লিল-মুছাল্লিন। আল্লাযিনা হুম 'আন ছালাতিহিম ছাহূন। আল্লাযীনা হুম ইউরাউনা, ওয়া ইমনা'উনাল্‌ মা'উন।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

তুমি কি তাকে দেখেছ যে ব্যক্তি দ্বীনকে (শেষ বিচারকে) অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং দরিদ্রদের ও অভাবীদের খাবার দিতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করে না। অতএব, সেই মুছাল্লীদের জন্যে পরিতাপ যারা তাদের ছালাতের প্রতি অমনোযোগী, যারা কেবল (লোকদের সামনে ছালাতের) প্রদশনী করে এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী অন্যদের ধার দিতে অস্বীকৃতি জানায় (ক্ষুদ্রতম জিনিষও অন্যদেরকে দিতে চায় না)।

১০। সূরাহ কুরাইশ (সূরাহ নং ১০৬) ঃ سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ. إِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ. اَلَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

লিঈলাফি কুরাইশ। ঈলাফিহিম রিহলাতাশ্‌ শিতায়ী ওয়াছ্‌-ছাইফ। ফাল্‌ইয়া'বুদূ রাব্বা হাযাল্‌ বাইত। আল্লাযি আত্‌'আমাহুম মিন জু'য়িওঁ ওয়া আমানাহুম মি্ন খাওফ্‌।

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে।

কুরাইশদের ঐতিহ্যের (বা অভ্যস্ততার) জন্যে– শীত ও গ্রীষ্মে তাদের সফরের চিরাচরিত ঐতিহ্যের জন্যে। অতএব, তারা যেন এই গৃহের (কা'বাহ্‌র) রবের 'ইবাদাত করে– যিনি তাদেরকে খাবার দিয়ে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করেছেন ও ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।

১১। সূরাহ্ আল্-ফীল (সূরাহ্ নং-১০৫) ঃ سُوْرَةُ الْفِيْل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বি আছ্হাবিল ফীল্? আলাম ইয়াজ্'আল কাইদাহুম ফী তাদ্লীল্? ওয়া আর্সালা 'আলাইহিম তাইরান্ আবাবীল্। তার্মিহীম বিহিজারাতিম্ মিন সিজ্জিল। ফাজা 'আলাহুম কা'আছ্ফিম্ মা'কুল্?

অনুবাদ ঃ পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে।

তুমি কি দেখ নি তোমার রব হাতীওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করলেন? তিনি কি তাদের অপকৌশলকে ব্যর্থ করেন নি? এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠালেন যারা তাদের ওপর পোড়ামাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করে, এভাবে তাদেরকে ভক্ষিত খড়কুটার মত (ছিন্নভিন্ন) করে ফেলে।"

## ছালাতের (নামাযের) শিক্ষা

ইসলামের নির্ধারিত পাঁচটি মৌলিক কর্তব্যকাজের মধ্যে শাহাদাহ্ বা ঈমানের ঘোষণার পর ছালাতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝে ছালাত নিয়মিত ও সঠিকভাবে আদায়ের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পারি।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সদাসচেতন থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর 'ইবাদাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কুরআন মজীদের

এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

–"আমি জিন্ ও মানব জাতিকে কেবল আমার 'ইবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" (সূরাহ আয্-যারিয়াত– ৫১ ঃ ৫৬)

অতএব, আমরা যে কর্তব্যকাজই করি না কেন আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমরা তা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই করছি। কেবল তাহলেই আমরা ছালাত আদায়ের কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে পারি।

## ছালাতের শিক্ষাসমূহ হচ্ছে ঃ

১। ছালাত মানুষকে আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।

২। ছালাত মানুষকে অশ্লীল লজ্জাস্কর ও হারাম কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। (সূরাহ আল্-আনকাবুত– ২৯ ঃ ৪৫)

৩। ছালাত হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে এক ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

৪। ছালাত হৃদয়কে নির্মল করে, মনকে বিকশিত করে এবং আত্মাকে প্রশান্তি দেয়।

৫। ছালাত সদাসর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর মহানত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৬। ছালাত শৃঙ্খলাবোধ ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত করে।

৭। ছালাত হচ্ছে সবচেয়ে সহজ সরল ও সুস্পষ্ট জীবনের পথনির্দেশ।

৮। ছালাত হচ্ছে প্রকৃত সাম্য, সুদৃঢ় ঐক্য ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ বা নিদর্শন।

৯। ছালাত হচ্ছে ধৈর্য, সাহস, আশা ও আত্মপ্রত্যয়ের উৎস।

১০। ছালাত হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যম।

১১। ছালাত কৃতজ্ঞতা, বিনয় ও সংশোধনের বিকাশ ঘটায়।

১২। ছালাত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আমাদের আনুগত্যের প্রদর্শনী।

১৩। ছালাত হচ্ছে আমাদের কথার সাথে আমাদের কাজের মিল ঘটানোর কর্মসূচী।

১৪। ছালাত হচ্ছে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা তথা জিহাদের জন্য তৈরী করার এক সুদৃঢ় কর্মসূচী।

আমাদের ছালাত যদি আমাদের আচার-আচরণ ও কাজকে সংশোধন ও উন্নত না করে তাহলে অবশ্যই আমাদের মনে করতে হবে যে, আমরা ভুল করে যাচ্ছি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করছি না।

# যাকাত زَكَاةٌ

যাকাত হচ্ছে সঞ্চিত সম্পদের সুনির্দিষ্ট অংশ যা দরিদ্র ও অভাবীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। আরবী শব্দ 'যাকাহ্' زَكَاةٌ মানে 'পবিত্র করা' (বাংলায় প্রচলিত উচ্চারণ 'যাকাত')। সঞ্চিত সম্পদের ওপর বছরে একবার যাকাত দিতে হয়। যাকাতের হার হচ্ছে বার্ষিক শতকরা আড়াই ভাগ। নগদ অর্থ, ব্যাঙ্কে রাখা টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা ও সোনা-রূপার অলঙ্কারের ওপর এ হারে যাকাত দিতে হয়। গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া এবং ফসলের যাকাতের হার আলাদা।

কম পক্ষে যে পরিমাণ সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হয় তাকে নিছাব বলা হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের ধনসম্পদের নিছাব ও তার যাকাতের হার উল্লেখ করা হল ঃ

নিছাব ও যাকাতের হার

| যে সম্পদের যাকাত দিতে হবে | কম পক্ষে যে পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে (নিছাব) | যাকাতের হার |
|---|---|---|
| ১। কৃষিজাত দ্রব্য | প্রতি ফসলে ৫ আওসাক* (১ আওসাক = ৬৫৩ কেজি) | সেচ ব্যবস্থাধীন জমি হলে ৫% ভাগ, বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০% ভাগ। |
| ২। সোনা, রূপা ও সোনা বা রূপার অলঙ্কার | ৮৫ গ্রাম সোনা বা ৫৯৫ গ্রাম রূপা* | মূল্যের ২.৫% ভাগ। |
| ৩। নগদ বা ব্যাঙ্কে রাখা টাকা-পয়সা | ৫৯৫ গ্রাম রূপার মূল্যের সমান* | মূল্যের ২.৫% ভাগ। |
| ৪। ব্যবসায়ের জিনিস | ৫৯৫ গ্রাম রূপার মূল্যের সমান* | মূল্যের ২.৫% ভাগ। |
| ৫। গরু ও মহিষ | ৩০টি | প্রতি ৩০টির জন্যে ১ বছর বয়স্ক ১টি এবং প্রতি ৪০টির জন্য ২ বছর বয়স্ক ১টি। |
| ৬। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা | ৪০টি | প্রথম ৪০টির জন্য ১টি; ১২০টির জন্য ২টি, ৩০০টির জন্য ৩টি; পরবর্তী প্রতি ১০০টির জন্য ১টি। |
| ৭। খনি থেকে তোলা | যে কোন পরিমাণ | মূল্যের ২০% |

| | | |
|---|---|---|
| ৮। উট | ৫টি | ক) ২৪টি পর্যন্ত = প্রতি ৫টি উটের জন্য ১টি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা।<br>খ) ২৫-৩৫টি = ১টি ১বছর বয়স্ক মাদী উট।<br>গ) ৩৬-৪৫টি= ১টি ২বছর বয়স্ক মাদী উট।<br>ঘ) ৪৬-৬০টি= ১টি ৩বছর বয়স্ক মাদী উট।<br>ঙ) ৬১-৭৫টি= ১টি ৪বছর বয়স্ক মাদী উট।<br>চ) ৭৬-৯০টি= ২টি ২বছর বয়স্ক মাদী উট।<br>ছ) ৯১-১২০টি= ২টি ৩বছর বয়স্ক মাদী উট।<br>জ) ১২১টি বা তার বেশী= অতিরিক্ত প্রতি ৪০টির জন্য ১টি ২বছর বয়স্ক বা প্রতি ৫০টির জন্য ১টি ৩বছর বয়স্কা মাদী উট। |

লোভ ও আত্মস্বার্থপরতার কলুষ-কালিমা থেকে আমাদের সম্পদকে পবিত্র করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যাকাত। এছাড়া যাকাত আমাদেরকে আয়-উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সততার আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করে।

মনে রাখতে হবে, যাকাত একটি বাধ্যতামূলক বা ফরয কর্তব্য। অতএব তা কোন দান-খয়রাত বা কর নয়। দান-খয়রাত হচ্ছে ঐচ্ছিক ব্যপার। অন্যদিকে কর হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার: রাষ্ট্র বা সরকার যে কোন কাজের জন্যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করতে পারে। কিন্তু যাকাত কেবল ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। এ খাতগুলো হচ্ছে ঃ দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করা, যাকাত আদায়কারীদের বেতন প্রদান, বন্দী মুক্তকরণ, ঋণী ব্যাক্তিকে ঋণমুক্ত করণ, আর্থিক অসুবিধায় পড়েছে এমন মুসাফিরকে সাহায্য করা, নও মুসলিমদের অন্তর জয় করা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায়। (সূরাহ আত-তাওবাহ্‌- ৯ ঃ ৬০)

যাকাত প্রদান একটি ‘ইবাদাত। ‘ইবাদাত একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে উপাসনা ও আনুগত্য। আমরা যদি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করি তাহলে আমাদের জীবনের সকল কাজই ‘ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের জন্য যাকাত দেই।

যাদের জীবন ধারণের ন্যূনতম ধনসম্পদ নেই যাকাত ব্যবস্থা তাদেরকে আমাদের অতিরিক্ত ধনসম্পদে অংশীদার করার সুযোগ করে দেয়। বস্তুতঃ আমাদের ও আমাদের ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ্‌। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত মালিক, আর আমরা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর সম্পদের আমানতদার মাত্র। আমরা যখন বাধ্যতামূলক ‘ইবাদত হিসেবে যাকাত প্রদান করি তখন

※ তথ্যসূত্র ঃ ফিক্‌হুয্‌ যাকাহ (فقه الزكاة) ইউসুফ আল্‌-কারাযাভী। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০, ৩৭২-৩৭৩ (বৈরুত, ১৯৭৭)। ইংরেজী অনুবাদ ঃ মানযার কাহ্‌ফ, পৃঃ ২৩২-২৩৬ (লন্ডন, ১৯৯৯)।

কার্যতঃ আমরা আমানতদার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করি মাত্র। (কুরআন মজীদে 'যাকাত' ও 'ছাদাকাহ' শব্দ দুটি পরস্পরের প্রতিশব্দ বা সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে)।

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে মানবজীবনের অন্যান্য দিকের সাথে অর্থনৈতিক দিকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইসলামের নিজস্ব অর্থনৈতিক মূলনীতি রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি যাকাত– যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজকল্যাণ ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন। বাধ্যতামূলক যাকাত দেয়া ছাড়াও মুসলমানদেরকে দরিদ্র ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণে ঐচ্ছিক দান ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক লক্ষ্যে অর্থ ব্যয়ের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ধরনের ঐচ্ছিক দানকে ছাদাকাহ্ বলা হয়েছে।

সম্পদশালীরা যাকাত দেয়ার মাধ্যমে তাদের সম্পদে দরিদ্র ও অভাবীদের অংশীদার করে নেয়। এভাবে ইনসাফসম্মত বন্টন নিশ্চিত হয়। যেসব খাতে যাকাত ব্যয় করতে হবে কুরআন মজীদে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরাহ আত্-তাওবাহ্– ৯ ঃ ৬০)

## ছাওম صَوم

ছাওম (রোযা) ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। ছাওম আরেকটি বাধ্যতামূলক 'ইবাদাত। ইসলামী বর্ষপঞ্জীর নবম মাস হচ্ছে রামাদান; এ মাসের দিনগুলোতে প্রত্যূষের (ছুব্হে সাদেক) শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছাওম পালন করা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরয। ছাওম মানে ঐ সময় পানাহার ও স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা। মুসাফির ও অসুস্থ লোকেরা রামাদান মাসে ছাওম পালন করতে না পারলে বছরের অন্য সময় তাদেরকে তা পালন করতে হবে।

ছাওম আমাদের মধ্যে আত্মসংযম সৃষ্টি করে এবং আমাদেরকে স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, আলসেমী ও অন্যান্য ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য ছাওম আমাদের চেতনাকে সতেজ করে। ছাওম আমাদের জন্য একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

ছাওম আমাদেরকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট অনুভব করতে সাহায্য করে। না খেয়ে থাকার কষ্ট কি রকম তা আমরা ছাওমের মাধ্যমে বুঝতে পারি। ফলে বিশ্বে প্রতিদিন যে কোটি কোটি দরিদ্র ও হতভাগ্য মানুষ না খেয়ে থাকে তাদের কষ্ট ও যাতনা আমরা বুঝতে পারি এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমরা উদ্বুদ্ধ হই। ছাওম আমাদের মধ্যে সংযম তৈরী করে

এবং আমাদেরকে শুধু আরাম-আয়েশের চিন্তায় ডুবে না থাকার শিক্ষা দেয়। তাছাড়া ছাওম আমাদেরকে যৌন কামনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। বস্তুতঃ আমাদের অনিয়ন্ত্রিত পানাহারের প্রতি আগ্রহ, আরাম-আয়েশপ্রিয়তা ও যৌন কামনা-বাসনা ইত্যাদি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি বান্দাহ্ হিসেবে জীবন যাপন করতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই অবশ্যই এসব মানবীয় দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরী।

ছাওম আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত থাকতে সাহায্য করে। একারণেই কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

–"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর ছাওম বাধ্যতামূলক করা হল। ঠিক যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার"। (সূরাহ আল্-বাকারাহ্- ২ ঃ ১৮৩)

একজন খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমানকে মুত্তাকী (তাকওয়ার অধিকারী) বলা হয়। আর ছাওমের মাধ্যমে গড়ে ওঠা–আল্লাহ্র প্রকৃত আনুগত্য বা খোদাভীতিকেই–ইসলামে তাকওয়া বলা হয়। তাকওয়া একজন মুসলমানকে গুনাহ্র কাজ থেকে দূরে রাখে।

রামাদান মাস হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে মাগফিরাত, রহমত ও বরকত লাভের এবং জাহান্নামের আযাবথেকে বাঁচার অন্যতম মাধ্যম।

ছাওম কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যেই পালন করা হয়। মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য পরকালীন জীবনে ছাওমের বিনিময়ে অত্যন্ত আনন্দ- জনক ও চমৎকার পুরস্কার রেখেছেন।

নিম্নলিখিত কাজগুলো করলে আমাদের ছাওম বা রোযা ভেঙ্গে যাবে ঃ

ক) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু খাওয়া বা পান করা।

খ) নাক বা মুখ দিয়ে কোন কিছু শরীরে প্রবেশ করানো; ধুমপান ও নাক দিয়ে নস্যি বা অন্য কোন ধরনের গুড়া জাতীয় দ্রব্য টেনে নেয়াও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

গ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন।

ছাওম-এর অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনে মাংসপেশীর মধ্যে ইনজেকশন নেয়া যাবে, তবে পুষ্টি বা শক্তি বৃদ্ধিকারক ইনজেকশন নেয়া যাবে না। ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে ফেললে বা

পান করলে ছাওম ভঙ্গ হয় না। তেমনি উযূ, গোসল ও চোখে ওষুধ দেয়ার কারণেও ছাওম ভঙ্গ হয় না।

ছাওমের অবস্থায় একজন মুসলমানের জন্য সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা বা যে কোন ধরনের প্রতারণামূলক কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

ছাওমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মুসলমানকে তার কামনা-বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা যাতে সে একজন ভাল মানুষে পরিণত হয় যার চিন্তা, কথা ও কাজ সবই হবে উত্তম। ক্রোধের মত সাধারণ মানবিক দূর্বলতাও ছাওমের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

রামাদান মাসের ফরয ছাওম ছাড়াও একজন মুসলমান বছরের অন্যান্য সময় ছাওম পালন করতে পারে। এ ধরনের ছাওম সুন্নাত ছাওম বলে গণ্য হবে।

মহিলাদের জন্য হায়েয (ঋতুস্রাব) ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী রক্তপাত (নেফাছ) চলাকালে ছাওম পালন নিষিদ্ধ। এ সময়ে তারা যে কটি ছাওম পালন করতে পারবে না সেগুলো অন্য সময় পালন করতে হবে।

নীচে উল্লেখকৃত দিনগুলোতে যে কোন ধরনের ছাওম পালন নিষিদ্ধ ঃ

ক) ‘ঈদুল ফিত্‌রের দিন

খ) ‘ঈদুল আয্‌হা ও কুরবানীর দিন

কুর’আন মজীদ সর্ব প্রথম রামাদান মাসে নাযিল হয়। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা “হাজার মাসের চেয়ে উত্তম” (সূরাহ আল্‌-কাদ্‌র- ৯৭ ঃ ৩) এ রাতটিকে লাইলাতুল কাদ্‌র (শক্তির রজনী বা মর্যাদার রজনী) বলা হয়।

হাদীস অনুযায়ী রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে কোন এক রাত হচ্ছে লাইলাতুল কাদ্‌র। (যথাসম্ভব কোন বেজোড় রাত্রি)। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে আমাদের পক্ষে যত বেশী সম্ভব ‘ইবাদাত করা উচিত।

রামাদান মাসে ছালাতুল ‘ইশার পরে একটি অতিরিক্ত ছালাত আদায় করতে হয়। একে ছালাতুত্‌তারাবীহ্‌ বলা হয়। ছালাতুত্‌তারাবীহ ২০ রাকা‘আত; কেউ কেউ ৮, ১০, ১২ বা ১৬ রাক্‘আতও পড়ে থাকেন। এটি হচ্ছে সুন্নাত ছালাত। ছালাতুত্‌তারাবীহ্‌তে সমগ্র কুর’আন খতম করার চেষ্টা করা হয় বা যত বেশি অংশ সম্ভব পড়া হয়। ছালাতুত্‌তারাবীহ্‌ সাধারণত মসজিদে জামা‘আতে আদায় করা হয়। যারা জামা‘আতে আদায় করতে পারে

না তাদের বাড়ীতে আদায় করা উচিত।

রামাদান মাসে ছুবহে ছাদিকের পূর্বে খানাপিনা করা সুন্নাত। একে সাহূর্ (سَحُوْر)বলা হয়। (আমাদের দেশে সেহ্‌রী বলা হয়)।

রামাদান শেষ হবার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে মুসলমানরা 'ঈদুল ফিত্‌র উদযাপন করে। এ দিনটি হচ্ছে আনন্দ-উৎসব ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের দিন। 'ঈদুল ফিত্‌র মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসবসমূহের অন্যতম। এ দিন মুসলমানরা জামা'আতে 'ঈদের ছালাত আদায় করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তাঁর দয়া ও রহমতের জন্য শুকরিয়া জানায়।

## হাজ্জ حَجّ

হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। হাজ্জ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সময়ে মক্কাহ্‌ শরীফের কা'বাহ্‌ ঘরের তাওয়াফ (চারদিকে পরিক্রমণ) ও তার নিকটবর্তী 'আরাফাত নামক স্থানে অবস্থানসহ কতগুলো বিধিবদ্ধ কাজ আঞ্জাম দেয়ার নাম। হাজ্জের সফরে যাওয়ার জন্যে শারীরিক ও

আল-কা'বাহ—মক্কাহ শরীফে 'আল্লাহ্‌র ঘর' اَلْكَعْبَة

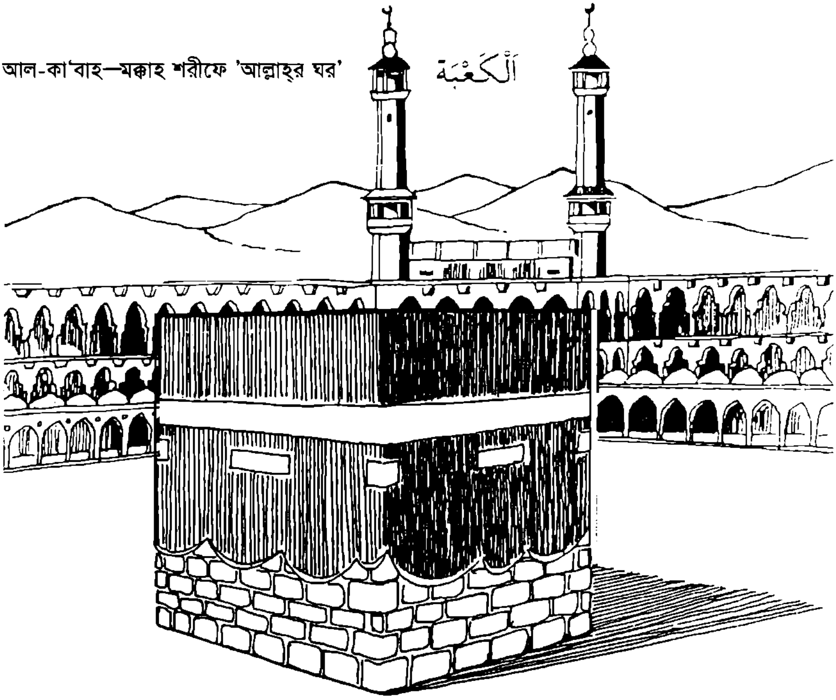

আর্থিক সামর্থ্য আছে এমন প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য জীবনে একবার হাজ্জ করা ফরয। ইসলামী বর্ষপঞ্জীর দ্বাদশ মাস যুলহিজ্জাহর ৮ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি উদযাপিত হয়। (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ৯৭, সূরাহ আল্-হাজ্জ– ২২ ঃ ২৭ - ৩০, সূরাহ আল্-বাকারাহ– ২ ঃ ১৯৭)

মক্কাহ্ শরীফে অবস্থিত পবিত্র গৃহ আল্-কা'বাহ্ 'বাইতুল্লাহ' (আল্লাহ্র ঘর) নামেও পরিচিত। কা'বাহ্ হচ্ছে এমন একটি একতলা ভবন যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। এটি মূলতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) নির্মাণ করেছিলেন। শুধু আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাতের জন্যে নির্মিত এটিই প্রথম গৃহ। (সূরাহ আলে 'ইমরান-৩ ঃ ৯৬)

আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাহ্কে বরকতময় করেছেন। যে সব মুসলমান হাজ্জের সমর্থ্যের অধিকারী তাঁরা প্রতি বছর সারা দুনিয়া থেকে হাজ্জের জন্য মক্কাহ শরীফে এসে সমবেত হন।

প্রকৃত অর্থে হাজ্জ হচ্ছে মুসলমানদের বার্ষিক আন্তর্জাতিক সমাবেশ (Annual International Muslim Assembly)। হাজ্জের সময় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চিত্র বিশেষভাবে ফুটে ওঠে এবং এতে অংশগ্রহণকরী প্রত্যেকে এক নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তা অনুভব করতে পারেন। এখানে ভাষা, অঞ্চল, বর্ণ ও গোত্রের ব্যবধান দূর হয়ে যায় এবং ঈমানের বন্ধন সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান লাভ করে। আল্লাহ্র ঘরে সকলেই একই মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের সকলেই আল্লাহ্র বান্দাহ হিসেবে হাযির হন। এখানে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মালিক ও চাকরের মধ্যে কোন তফাত থাকে না। সকলেই আল্লাহ্র বান্দাহ এবং সকলেরই একই বৈশিষ্ট্য।

হাজ্জের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১। ইহ্রাম পরিধান করা (সূরাহ আল্-বাকারাহ– ২ ঃ ২০০) অর্থাৎ হাজ্জের জন্যে নির্ধারিত পোশাক পরিধান করা।

২। কা'বাহ্র চারদিকে সাতবার তাওয়াফ করা। (সূরাহ আল্- বাকারাহ– ২ ঃ ২০০)

৩। কা'বাহ্র নিকট ছাফা ও মারওয়াহ নামক দু'টি পাহাড়ের মাঝে দ্রুতগতিতে আসা-যাওয়া করা যাকে সা'ঈ বলা হয়। (সূরাহ আল্-বাকারাহ–২ ঃ ১৫৮)

৪। 'আরাফাহ, মুযদালিফাহ ও মিনায় গমন ও অবস্থান (সূরাহ আল্-বাকারাহ– ২ ঃ ১৯৮)

৫। মিনায় তিনটি নির্দিষ্ট স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করা (সূরাহ আল্- বাকারাহ– ২ ঃ ২০০)

৬। মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করা। (সূরাহ আল্-বাকারাহ–২ঃ ২০০)

৭। পশু কুরবানী করা। (সূরাহ আল্-বাকারাহ–২ ঃ ১৯৬, ২০০)

হাজ্জের মওসুমে একজন হাজ্জযাত্রী যখন মক্কা শরীফের উদ্দেশে রওয়ানা হন তখন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্থানের কোন একটিতে পৌছার পূর্বে তাঁকে ইহ্‌রাম পরিধান করতে হয়। এ জায়গাগুলোকে মীকাত (স্টেশন) বলা হয়। পুরুষদের জন্য ইহ্‌রাম হচ্ছে দুই খণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড়। একজন হাজ্জযাত্রী অন্য সময় তাঁর দৈনন্দিন জীবনে যে পোশাক পরিধান করেন তার পরিবর্তে তাঁকে অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের এ পোশাক পরিধান করতে হয়। তবে মহিলাদের জন্যে তাঁদের সাধারণ মামুলী পোশাকই হচ্ছে ইহ্‌রাম।

এই পরিবর্তনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোশাকের এই পরিবর্তন হাজ্জযাত্রীকে আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তার মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি তার সৃষ্টিকর্তার একজন বাধ্যগত দাস। এ পোশাক তাকে আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত্যুর পরে তাকে কয়েক খন্ড সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে এবং তার প্রিয় দামী পোশাক পরিচ্ছদ পড়ে থাকবে।

ইহ্‌রাম পরিধান করার সময় হাজ্জযাত্রীকে হাজ্জের নিয়্যত করতে হয়। তাঁকে মনে মনে বলতে হয় ঃ "আমি হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম পরিধান করছি।" মুখে বলতেও বাধা নেই।

ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় হাজ্জযাত্রীর জন্য কতগুলো বিধিনিষেধ রয়েছে। তাঁকে এগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। ইহ্‌রাম অবস্থায় নীচের কাজগুলো নিষিদ্ধ ঃ

| | নিষিদ্ধ কাজ | নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| ক) | সুগন্ধি ব্যবহার করা। | দৈনন্দিন জীবনের ভোগ-বিলাসিতা ভুলে যেতে সহায়তা করা। |
| খ) | কোন প্রাণীকে, এমনকি মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গকে হত্যা করা বা আঘাত করা। | এ সত্য অনুভব করা যে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র। |
| গ) | গাছ-পালা ও উদ্ভিদ ভাঙ্গা বা উপড়ানো। | হিংস্রতা বা আগ্রাসী প্রবণতাকে দমন করা ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা অনুভব করা। |
| ঘ) | শিকার করা। | দয়া-অনুগ্রহের অনুভূতি সৃষ্টি। |
| ঙ) | বিবাহ করা বা বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। | স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভুলে যাওয়া ও আল্লাহ্‌র চিন্তায় ডুবে থাকা। |
| চ) | অসততামূলক বা গুনাহের কোন কাজ করা। | আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌র ন্যায় আচরণ করা। |

| | | |
|---|---|---|
| ছ) | অস্ত্র বহন করা। | আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিত্যাগ করা। |
| জ) | মাথা ঢাকা (পুরুষদের)। | বিনয় বৃদ্ধি করা। |
| ঝ) | মুখ ঢাকা (মহিলাদের)। | একটি পবিত্র পরিবেশ অনুভব করা। |
| ঞ) | গোড়ালীঢাকা জুতা পরা। | সাদামাটা জীবনের প্রকাশ ঘটানো। |
| ট) | চুল বা নখ কাটা। | প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ না করার মনোভাব প্রকাশ করা। |
| ঠ) | যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। | দুনিয়ার ভোগ-আনন্দ ভুলে যাওয়া। |

এসব বিধিনিষেধ একজন হাজ্জযাত্রীকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ও তাঁর জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী জীবনে সাফল্য সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং অন্য কোন কিছুর সম্পর্কে চিন্তা না করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইহ্রাম অবস্থায় হাজ্জযাত্রীকে তালবীয়াহ্ পড়তে হয়। তালবীয়াহ্ হচ্ছে ঃ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল-হামদা ওয়ান্-নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক, লা শারীকা লাক্।

"আমি হাযির, হে আল্লাহ্! আমি হাযির, আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। অবশ্যই সকল প্রশংসা ও নি'আমাত তোমারই, আর রাজত্ব-সার্বভৌমত্বের মালিকও তুমিই, তোমার কোন শরীক নেই।"

হাজ্জযাত্রীরা যে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কা'বাহ্‌র দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যমযম (زمزم) কূপ থেকে পানি পান। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী ও হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)-এর মাতা হযরত হাজর (هاجر) (আঃ) শিশু ইসমা'ঈল (আঃ)-এর জন্য পানির সন্ধানে ছাফা-মারওয়াহ পাহাড়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করার সময় এ কূপটি আবিষ্কার করেন। (আমাদের দেশে হযরত হাজারকে 'বিবি হাজেরা' বলা হয়)।

বস্তুতঃ ছালাত, যাকাত ও ছাওমে যেসব শিক্ষা রয়েছে তার সবই হাজ্জে রয়েছে। তোমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আমরা কেন ছালাত আদায় করি, যাকাত দেই ও ছাওম পালন করি। আমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্যে ছালাত আদায় করি, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যাকাত দেই এবং কেবল তাঁরই জন্যে ছাওম পালন করি। ছালাত আদায়ের সময় আমরা দৈনিক পাঁচ বার আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযির হই, কিন্তু হাজ্জের সময়

আমাদেরকে সর্বক্ষণই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়। ছালাতের সময় আমাদেরকে কা'বাহ্‌র দিকে মুখ করতে হয়। কিন্তু হাজ্জের সময় আমরা সশরীরে কা'বাহ্‌র সামনে হাযির থাকি। যাকাত আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে আমাদের সঞ্চিত সম্পদের একটি অংশ জনকল্যাণমুলক ও অন্যান্য ভাল উদ্দেশ্যে ব্যয়ের শিক্ষা দেয়। আর হাজ্জের সময় আমরা  আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করে থাকি।

হাজ্জের মওসূম ছাড়া অন্য সময় দুনিয়ার যে কোন অংশের যে কোন মুসলমান কা'বাহ্ যিয়ারত করতে আসতে পারেন। একে 'উম্‌রাহ (সূরাহ আল্-বাকারাহ– ২ ঃ ১৮৫) বলা হয়। প্রচলিত কথায় 'ছোট হাজ্জ' বলা হয়। যিনি 'উম্‌রাহ করবেন তাঁকে ইতিপূর্বে উল্লেখকৃত হাজ্জের করণীয়সমূহের মধ্য থেকে ১,২,৩, ও ৬ নম্বর কাজ করতে হয়। অর্থাৎ তাঁকে ইহ্‌রাম পরিধান, কা'বাহ্‌র তাওয়াফ, সা'ঈ ও মাথামুণ্ডন বা চুল ছোট করতে হয়।

ছাওম আমাদেরকে দিনের বেলা পানাহার, ধুমপান ও যৌন সংসর্গ থেকে বিরত রাখে। অন্যাদিকে ইহ্‌রাম আমাদের ওপর আরো অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করে (যদিও ইহ্‌রাম অবস্থায় পানাহার করা নিষিদ্ধ নয়)।

হাজ্জের সময় এসব আনুষ্ঠানিকতা ও বিধিনিষেধ থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? আমরা এ শিক্ষা লাভ করি যে, আমরা আল্লাহ্‌র, আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব এবং আমরাদেরকে অবশ্যই তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলতে হবে। আমরা যদি তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলি তাহলে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালের জীবনে আমরা অবশ্যই সফল হব।

## জিহাদ جهاد

'জিহাদ' মানে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো। 'জিহাদ' একটি আরবী শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে 'সর্বশক্তিতে চেষ্টা করা'। জিহাদ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। জিহাদের প্রথম পর্যায়ে একজন মুসলমান তার কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এ লক্ষ্যে পৌছার জন্যে আমাদের কঠোর চেষ্টা-সাধনা করা প্রয়োজন। এটা হচ্ছে মানুষের আভ্যন্তরীন জিহাদ যা বাইরের সর্বাত্মক জিহাদের ভিত্তিস্বরূপ।

বাইরের জিহাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের সমাজে ও জীবনে মা'রূফ (ভাল কাজ ও ন্যায়)-এর প্রতিষ্ঠা এবং মুনকার (অন্যায় ও পাপাচার)-এর উৎখাত। একাজের জন্যে আমাদের

সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানসিক সম্পদ ব্যবহার করা অপরিহার্য। এমন কি ইসলামের স্বার্থে আমাদের জীবন কুরবানী করাও প্রয়োজন হতে পারে।

জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে সকল ইসলামী চেষ্টা-সাধনার মূল ভিত্তি।

ইতিপূর্বে আমরা ইসলামের মৌলিক কর্তব্যসমূহ অর্থাৎ শাহাদাত, ছালাত, যাকাত, ছাওম ও হাজ্জ সম্বন্ধে জেনেছি। এসব কর্তব্য পালন করে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার মাধ্যমে তাঁর রহমত ও নে'আমত অর্জনের শিক্ষা পাই যাতে আমরা শেষ বিচারের দিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি এবং পুরস্কার স্বরূপ চিরন্তন সুখ শান্তি ও আনন্দের জায়গা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

ইসলামের উক্ত মৌলিক কর্তব্যকাজসমূহ আমাদেরকে শুধু ইসলামের জন্যে বাঁচতে ও ইসলামের জন্যে মরতে উদ্বুদ্ধ করে। আর আমরা জানি যে, পৃথিবীর জীবনে ও পরকালীন জীবনে নিশ্চিত সাফল্যের অধিকারী হবার জন্যে এটাই একমাত্র ও সুনিশ্চিত পথ। অন্য কথায়, ইসলামের নির্ধারিত সকল কর্তব্যকাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে জিহাদে নিয়োজিত থাকার জন্যে প্রস্তুত করা। আমাদের ছালাত, যাকাত, ছাওম ও হাজ্জের চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ বাদ দিয়ে ইসলামের কথা চিন্তাই করা যায় না।

আমরা তো এটাই দেখতে চাই যে, সত্য টিকে থাক ও মিথ্যা বিলুপ্ত হোক। কিন্তু আমরা জানি যে, এরূপ আপনা আপনিই হয় না। বরং এ লক্ষ্য হাসিল করতে হলে আমাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের অন্যান্য ফরয কাজ যদি আমাদেরকে জিহাদে নিয়োজিত হতে উদ্বুদ্ধ না করে তাহলে সে সব ফরয কর্তব্য অর্থহীন হয়ে যাবে।

জিহাদের পদ্ধতি হচ্ছে স্বয়ং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পদ্ধতি। তাঁর জীবন হচ্ছে আমাদের জন্য অনুসরণীয় পরিপূর্ণ আদর্শ। আমরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে পরে এ বইতে জানতে পারব।

মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং অন্যদেরকে তা মেনে চলার জন্যে আহ্বান জানানো। আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط

–"তোমরা হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত মানবজাতির জন্যে যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে; তোমরা ভাল ও ন্যায় কাজের আদেশ দাও ও মন্দ কাজ প্রতিহত কর, আর আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান পোষণ কর।" (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১১০)

আমাদের দায়িত্ব অন্যদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করতে বলা, তবে তা এমন পন্থায় হতে হবে যাতে মানুষ এজন্যে আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের জীবনধারাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা যা বলি আমাদের নিজেদের জীবনে তা অনুসরণ করি কিনা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদের কথা ও সকাজের মধ্যে মিল নেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

–"তোমরা কি লোকদেরকে সৎকর্মের আদেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভূলে যাও?" (সূরাহ আল্-বাকারাহ– ২ ঃ ৪৪)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ○

–"হে ঈমানদারগণ! কেন তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না? এটা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণার বিষয় যে, তোমরা তা বল যা তোমরা কর না।" (সূরাহ আছ্-ছফ্– ৬১ ঃ ২-৩)

এসব আয়াতে আমাদেরকে নিজেদের কাজকে আমাদের কথার সাথে মিলিয়ে দেখার নিদের্শ দেয়া হয়েছে। একারণে আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই ভাল কাজ করতে হবে এবং অন্যদের প্রতিও এজন্য আহ্বান জানাতে হবে। অন্যদেরকে ভাল কাজের দিকে আহ্বান করতে গেলে আমরা নিজেদের দুর্বল দিক সম্পর্কে সচেতন হব এবং এভাবে আমরা আমাদের দুর্বলতা ও ঘাটতি দূর করতে পারব। আমরা কেউই পূর্ণতার অধিকারী নই। তবে আমরা যদি আমাদের জিহাদের কর্তব্য পালনের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাই তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অপূর্ণতা কমে যাবে এবং আমরা উন্নতমানের অনুগত বান্দাহ হতে পারব এবং সমাজের অন্য মানুষদেরকেও আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত দিতে উৎসাহী হব।

## অনুশীলনী (দুই ঃ ঘ)

৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। 'যাকাহ' শব্দের অর্থ কি? কখন তা পরিশোধ করতে হয়?

২। তোমার সঞ্চিত অর্থের যাকাতের হার কত?

৩। রামাদান মাসে কোন্ সময়ে আমরা ছাওম পালন করি?

৪। লাইলাতুল কাদ্‌র এত গুরুত্বপূর্ণ রাত কেন?

৫। তোমার একজন বন্ধুকে 'ঈদুল ফিৎর সম্বন্ধে চিঠি লিখ।

৬। হাজ্জ কি এবং হাজ্জ আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?

৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। আমরা যাকাত দেয়া থেকে কি শিক্ষা লাভ করি?

২। আমাদের দেয়া যাকাত থেকে কারা উপকৃত হয়?

৩। ছাওম আমাদের মধ্যে কি গড়ে তোলে এবং কিভাবে তা একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী?

৪। কোন্ কোন্ কাজের ফলে আমাদের ছাওম ভঙ্গ হয়ে যায়?

৫। হাজ্জকে মুসলমানদের বার্ষিক আন্তর্জাতিক সমাবেশ বলা হয় কেন? ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ ধারণা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। "পবিত্র যুদ্ধ" কথাটিতে কি 'জিহাদ'-এর পুরো তাৎপর্যের সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? তোমার জবাবের ব্যাখ্যাস্বরূপ দৃষ্টান্ত পেশ কর।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। ছাওমের নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা কি কি? প্রশিক্ষণের মাস রামাদান কিভাবে আমাদের আচরণকে উন্নত করতে পারে? উদাহরণসহ এ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। হাজ্জের সময় ইহ্‌রাম পরিধানের গুরুত্ব কি ব্যাখ্যা কর।

৪। "একটি অমুসলিম সমাজে একজন মুসলমানের বসবাস করাকে জিহাদ হিসেবে গণ্য করা চলে।" বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

# তিন ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী

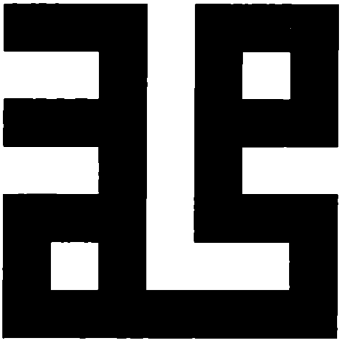

মুহাম্মাদ (সাঃ)

## সূচনা

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

–"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" (সূরাহ আল-আহযাব– ৩৩ ঃ ২১)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

–"আমি তোমাকে সমস্ত সৃষ্টির জন্য শুধু রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।" (সূরাহ আল-আম্বিয়া'– ২১ ঃ ১০৭)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

–"তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে দেন যদিও মুশরিকরা তা পসন্দ করে না।" (সূরাহ আছ্-ছাফ্- ৬১ ঃ ৯)

আমরা ইতিমধ্যেই ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের সাথে পরিচিত হয়েছি। এবার আমরা আমাদের প্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন সম্পর্কে জানব। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমেই ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। তিনি তাঁর অনুসারীদের জীবনের ওপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেছেন মানবজাতির ইতিহাসে অন্য কোন ব্যক্তিই তেমনটি পারেন নি। তাঁর জীবন আমাদের অনুসরণের জন্যে সর্বোত্তম নমুনা (উস্ওয়াতুন্ হাসানাহ)। তিনিই আমাদেরকে তাঁর আমলের দ্বারা দেখিয়েছেন কিভাবে বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও রব আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

–"বল (হে মুহাম্মাদ!) ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল মেহেরবান।" (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ৩১)

এর মানে হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যেভাবে ইসলামের অনুসরণ করেছেন আমরা ঠিক সেভাবেই ইসলামের অনুসরণ করলেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে তাঁকে رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (সমস্ত সৃষ্টির জন্যে রহমত) বলে উল্লেখ করেছেন। (সূরাহ আল-আম্বিয়া'– ২১ ঃ ১০৭)

কুর'আন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কর্তব্য ছিল সকল জীবনব্যবস্থার ওপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা (সূরাহ আছ্-ছাফ্– ৬১ ঃ ৯, সূরাহ আল-ফাৎহ– ৪৮ ঃ ২৮, সূরাহ আত্-তাওবাহ– ৯ ঃ ৩৩)। অন্য কথায় আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কর্তব্য ছিল সমাজের বুকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা ও মিথ্যাকে অপসারণ করা। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা ও সকল প্রকার অন্যায় ও পাপাচার উৎখাতের জন্য কাজ করা। আর একেই বলে জিহাদ– যে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে হেদায়াত লাভ করতেন, কিন্তু আমাদের নিকট ৎ নাযিল হয় না। (সূরাহ আল-কাহ্ফ- ১৮ ঃ ১১০) তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার পাঠা৷ সর্বশেষ নবী। (সূরাহ আল- আহযাব- ৩৩ ঃ ৪০) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শুধু একজ নবীই ছিলেন না, তিনি একজন মানুষও ছিলেন। তিনি কোন অতিমানবিক সত্তা ছিলেন না, বরং একজন মরণশীল মানুষ ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এমন ব্যতিক্রমধর্মী ও অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন যা তাঁকে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাঁকে সকলের জন্যে অনুসরণীয় প্রোজ্জ্বল নমুনায় পরিণত করেছে।

## জন্ম ও শৈশব কাল

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ৫৭১ খৃষ্টাব্দে[১] আরবের মক্কাহ নগরীতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। 'মুহাম্মাদ' নামের অর্থ 'প্রশংসিত'।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ তাঁর জন্মের আগেই ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা আমিনাহ ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্মের কয়েক দিন পরেই তাঁকে হালিমার নিকট লালন-পালন করতে দেয়া হয়। হালিমা তাঁকে পাঁচ বছর লালন-পালন করেন। এরপর তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেন। ঐ সময় সন্তান জন্মের পর বুকের দুধ পান করানো ও লালন-পালনের জন্যে অন্য মহিলাদের বিশেষ করে বেদুইন মহিলাদের নিকট দেয়া কুরাইশ গোত্রের মধ্যে প্রচলিত রীতি ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাতা ইন্তেকাল করলে তাঁর দাদা 'আবদুল মুত্তালিব তাঁকে লালন-পালন করেন। শৈশব কালের প্রথম দিক থেকেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একের পর এক মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হন। তাঁর বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন তাঁর দাদা ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। আবু তালিব ছিলেন কুরাইশ গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী।

## সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফর

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালিবের স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্নে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন বার বছর তখন তিনি চাচার সাথে এক ব্যবসায়িক সফরে আশ্-শামে যান। উল্লেখ্য, আশ্-শাম বলতে বৃহত্তর সিরিয়া বুঝায়। তাঁদের কাফেলা যখন বুস্রায় (بُصْرَى) গিয়ে পৌঁছে তখন সেখানে বসবাসরত (بَحِيرَى) বাহীরা নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী তাঁদেরকে রাতের খানা খাবার জন্যে দাওয়াত দেন।

---

১। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী লেখকগণ তাঁর জন্মের সন সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে, আবার কেউ ৫৭০ খৃষ্টাব্দ বলেছেন। আমার নিকট 'আল্লামা শিবলী নু'মানী কর্তৃক তাঁর 'সীরাতুন্নবী গ্রন্থে উল্লেখিত ৫৭১ খৃষ্টাব্দ সঠিক মনে হয়েছে।

এটা ছিল একটা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। ইতিপূর্বে আবু তালিব ও তাঁর কাফেলা বহুবার ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করেছেন। কিন্তু কখনোই এ সন্ন্যাসী তাঁদেরকে দাওয়াত করেন নি। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছাড়া কাফেলার সকল লোকই সেখানে রাতের খানা খেতে যান। সম্ভবতঃ মালপত্র ও উটগুলোর দেখাশোনা করার জন্যে তিনি থেকে যান। তখন বাহীরা তাঁকে খেতে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনিও খেতে আসেন।

পরে বাহীরা তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলে তিনি এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক জবাব দেন। বাহীরা ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি খৃস্টধর্ম ও তাঁদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। তাই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রশ্নগুলোর যে জবাব দেন তা থেকে বাহীরা বুঝতে পারেন যে, এই বালক মুহাম্মাদ (সাঃ) ভবিষ্যতে নবী হবেন। তিনি আবু তালিবকে তাঁর ভাতিজার প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নেয়ার জন্যে পরামর্শ দেন। তাই আবু তালিব তাঁর ব্যবসায়ের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আর মোটেই দেরী না করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে সাথে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন।

## রাখাল বালক বেশে

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছোটবেলা দুম্বার (মেষ) পালের দেখাশুনা করতেন। দুম্বা চরানোর সময় তিনি তাঁর পারিপাশিকক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। তিনি দুম্বার পাল নিয়ে আরবের বিশাল মরুর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। এর ফলে তিনি বিশাল প্রকৃতি দেখার সুযোগ পেতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি বিস্ময়কর প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি বাল্যকালে যে রাখাল বালক হিসেবে দুম্বা চরাতেন তাঁর জীবনের এ অধ্যায় সম্বন্ধে তিনি গর্ব করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আল্লাহ্ এমন কোন নবীকে পাঠান নি যিনি কখনোই রাখাল ছিলেন না। মূসা (আঃ) একজন রাখাল ছিলেন, দাউদ (আঃ)ও একজন রাখাল ছিলেন।"

এর কারণ হয়ত এই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা চাচ্ছিলেন, তাঁর নবী-রাসূলগণ (আঃ) রাখাল হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন যাতে তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আচরণ করতে পারেন। একপাল দুম্বা, ভেড়া, ছাগল, উটকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ এ প্রাণীগুলো ডান-বাম, ভাল-মন্দ কিছুই বুঝে না। তাই এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপরিসীম ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। নবী-রাসূলগণ (আঃ) রাখালের কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা তাঁদের প্রকৃত দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারে খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়।

## কৈশোরে ঃ হার্‌বুল ফিজার ও হিল্‌ফুল্‌ ফুযূল

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স যখন পনের বছর তখন হাজ্জের মওসূমে কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ বেধে যায়। মক্কার প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হাজ্জের জন্যে নির্ধারিত মাসগুলো পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য হত এবং এসময় যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এ সত্ত্বেও এ যুদ্ধ মাঝে মাঝে বিরতিসহ মোট চার বছর ধরে চলে। এ যুদ্ধের ফলে উভয় গোত্রর মানুষকেই চরম দুঃখদুর্দশা ও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। অযথা রক্তপাতের ফলে সকলের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। এ কারণে এ যুদ্ধকে 'হার্‌বুল্‌ ফিজার' বা 'অপবিত্র যুদ্ধ' বলা হয়।

এ যুদ্ধের কারণটি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট খুবই অর্থহীন বলে মনে হয়। এ ধরনের অর্থহীন রক্তপাত তাঁর নিকট খুবই খারাপ লাগে। আরো অনেকের মনে এ নিয়ে চিন্তা জাগে এবং তাঁরা যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন। ফলে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এক চাচা আয্‌-যুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিব-এর উদ্যোগে মক্কার অন্যতম প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন জুদ'আনের বাড়ীতে একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে অর্থহীন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের এবং মযলুম, দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সাহায্য করার জন্যে হিল্‌ফুল্‌ ফুযূল (কল্যাণের লক্ষ্যে মৈত্রী) নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং এ মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, "ইব্‌নে জুদ্‌'আন আমাদের সম্মানে যখন বিরাট ভোজের আয়োজন করেন তখন আমার উপস্থিতিতে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় আমি তাকে সমুন্নত রাখব। যখনই ডাকা হবে তখনই আমি সে ডাকে সাড়া দেব।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এ মৈত্রীচুক্তিতে অংশগ্রহণ করায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, এমন কি কিশোর বয়সেও তিনি জনকল্যাণমূলক কাজকর্মে আগ্রহী ছিলেন। এখানে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তা হচ্ছে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনকাহিনী অধ্যয়ন করে তোমাদেরকে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে তোমাদের সমবয়সী কিশোরদের কল্যাণের কাজে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী অধ্যয়ন করবে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবে অনুসরণ করবে। তোমরা যদি তোমাদের চারদিকে তাকিয়ে দেখ তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, সমাজে বহু অন্যায়-অবিচার চলছে এবং বহু ভুল জিনিস পাকাপোক্ত হয়ে আছে। এসব অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার ও পাপ কাজ প্রতিহত করার জন্যে তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবে। তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে এই পৃথিবীর জীবনে ও পরকালের জীবনে (আখিরাহতে) পুরস্কৃত করবেন।

# বিবাহ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন যুবক, তখন থেকে তিনি তাঁর চাচার পরিবারের ব্যয় বহনে সাহায্য করতেন। ঐ সময় তাঁর চাচা আবু তালিব অনেক কষ্টেসৃষ্টে তাঁর সংসার চালাতেন। ইতিমধ্যে খাদীজাহ বিনতে খুয়াইলিদ নামে শরীফ ঘরের এজন বিধবা মহিলা তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের দেখাশুনা করার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর দিতে চান। এ সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অত্যন্ত সৎ, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ যুবক হিসেবে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। একারণেই খাদীজাহ তাঁর ব্যবসায়ের ভার হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাতে তুলে দেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

হযরত মুহম্মাদ (সাঃ) এ কাজটি গ্রহণ করেন এবং হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর পণ্যসামগ্রী নিয়ে আশ্-শাম সফরে যান। হযরত খাদীজাহর ক্রীতদাস মাইসারাহও তাঁর সাথে যান। এটা ছিল আশ্-শামে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় বাণিজ্যিক সফর। তিনি সেখানে হযরত খাদীজাহর পণ্যসামগ্রী বিক্রি করেন এবং সেখান থেকে যে সব পণ্য কিনে আনতে বলা হয়েছিল তা কিনে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বুদ্ধিমত্তা, র্কদক্ষতা ও সততার কারণে তাঁর এ বাণিজ্যিক সফরের ফলে হযরত খাদীজাহ বিরাট মুনাফার অধিকারী হন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এ সফরের সময় তাঁর সফরসঙ্গী মাইসারাহ লক্ষ্য করে যে, তাঁর পথচলাকালে সব সময় মেঘের ছায়া সূর্যের প্রখর তাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করছে। মক্কায় ফিরে আসার সাথে সাথেই মাইসারাহ হযরত খাদীজাহর নিকট ছুটে যায় এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পথচলাকালে মেঘের ছায়াদানের যে বিস্ময়কর ঘটনা সে দেখেছে তা তাঁর নিকট বর্ণনা করে এবং সেই সাথে ব্যবসার বিরাট মুনাফার কথাও জানায়।

হযরত খাদীজাহ বিন্‌তে খুয়াইলিদ ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমতি ও মহীয়সী মহিলা। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র, কর্মক্ষমতা ও দক্ষতায় অভিভূত হন। তাই তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালিবের পরামর্শে এ প্রস্তাবে সম্মত হন। এ সময় বিধবা হযরত খাদীজাহর বয়স ছিল চল্লিশ বছর এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। বিবাহের পর তাঁরা নতুন জীবন শুরু করেন।

তাঁরা তাঁদের বৈবাহিক জীবনে ছয়টি সন্তানের অধিকারী হন– দুই পুত্র ও চার কন্যা। তাঁদের দুই পুত্রের নাম আল-কাসিম ও 'আবদুল্লাহ (তাঁরা যথাক্রমে তাহির ও তায়্যিব

নামেও পরিচিত) এবং চার কন্যার নাম যাইনাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমাহ। তাঁদের উভয় পুত্রই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তাঁদের কন্যাগণ নুবওয়াতের যুগে বেঁচে ছিলেন এবং তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন ও মদীনায় হিজরত করেন।

## দৈহিক বৈশিষ্ট্য

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন,। মাধ্যম গড়নের দেহের অধিকারী– না খুব লম্বা, না খাট। তাঁর মাথা ছিল বড়, চুল ছিল ঘন কালো, কপাল ছিল প্রশস্ত, ভ্রু ছিলো মোটা, চোখ ছিল বড় ও ঘন কালো এবং চোখের পাপড়ি ছিল লম্বা। তাঁর নাক ও দাঁত ছিল সুন্দর, দাড়ি ছিল ঘন কালো, ঘাড় ছিল লম্বা ও সুন্দর এবং তাঁর বুক ও কাঁধ ছিল প্রশস্ত। তাঁর শরীরের চামড়ার রং ছিল উজ্জ্বল এবং তাঁর হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল পুরু। তিনি যখন হেঁটে পথ চলতেন তখন দৃঢ়পদবিক্ষেপে হাঁটতেন। তাঁর চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ ছিল। তাঁর চোখের দিকে তাকালে তাঁকে একজন সেনাপতি ও স্বভাব-নেতা বলে মনে হত।

## কা'বাহর পুনঃনির্মাণ

হঠাৎ একবার মক্কায় প্লাবন হলে কা'বাহ ঘরের ক্ষতি হয়, বিশেষ করে এর দেয়ালে ফাটল ধরে। তাই কা'বাহর মেরামত বা পুনঃনির্মাণ জরুরী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কা'বাহ পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং কাজটি কুরাইশ গোত্রের চারটি শাখার মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কা'বাহর দেয়ালগুলোর নির্মাণকাজ এগিয়ে চলল। এক পর্যায়ে এসে কা'বাহর দেয়ালে পবিত্র কালো পথর (আল্-হাজারুল-আস্ওয়াদ) স্থাপনের পালা এল। ইতিপূর্বে পাথরটি কা'বাহর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপিত ছিল এবং সেখানেই পুনঃস্থাপন করতে হবে এটাই স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য, এই কালো পাথরটি কা'বাহ ঘর নির্মাণের সময় থেকেই পবিত্র হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। মক্কাবাসীদের নিকটও এটি অতি পবিত্র হিসেবে গণ্য হত। ইসলামের দৃষ্টিতেও এটি পবিত্র। হাজ্জের সময় হাজ্জযাত্রীগণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ভক্তিসহকারে এ পাথরটিকে চুম্বন করেন।

যেহেতু এ পাথরটি পবিত্র সেহেতু পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করার কাজটি বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়। তাই কুরাইশ গোত্রের চারটি শাখাই পাথরটি যথাস্থানে

স্থাপনের সুযোগ দাবী করে বসল। ফলে এ নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এ নিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য মক্কার সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আবু উমাইয়াহ একটি প্রস্তাব দেন এবং প্রস্তাবটি সকলের মনঃপূত হয়। তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বলেন, 'আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কা'বাহ ঘরে প্রবেশ করবে আমরা তাকেই আমাদের বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে নেব।"

পরদিন সকালে যা ঘটল তা যেমন অভাবনীয় তেমনি আনন্দজনক। কা'বাহ ঘরে যিনি প্রথম প্রবেশ করলেন তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। তখন সকলে সমবেত কণ্ঠে উচ্চস্বরে বলে উঠল ঃ "এ যে আমাদের আল্-আমীন (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি)! এ যে মুহাম্মাদ! আমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নেব।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন তাঁদের কাছে এলেন তখন তারা তাঁকে তাদের বিরোধ মিটিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। তিনি এতে সম্মত হলেন। তিন বললেন, "একটি চাদর নিয়ে এসো"। তাঁর জন্যে একটি চাদর নিয়ে আসা হলে তিনি চাদরখানি মেঝেতে বিছিয়ে তার ওপর কালো পাথরটি তুলে রাখলেন এবং বললেন ঃ "এবার প্রত্যেক শাখা গোত্রের মুরুব্বী চাদরটির এক এক কোণ ধরুন।" তারা চাদরটি ধরে যথাস্থানে নিয়ে গেলে মুহাম্মাদ (সাঃ) পাথরটি তুলে নিয়ে কা'বাহর দেয়ালে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

এভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন সালিসের ভূমিকা পালন করেন এবং কুরাইশ গোত্রকে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেন। এরপর কা'বাহ ঘরের পুনঃনির্মাণ কাজ এগিয়ে চলল ও একসময় সমাপ্ত হল। এ সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এমন কি নবুওয়াত লাভের আগে থেকেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তাদের আভ্যন্তরীন বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে সালিস বা বিচারক হিসেবে গণ্য করত। তিনি তাদের কাছ থেকে 'আল্-আমীন' অর্থাৎ 'বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য ও আমানতদার' এবং 'আছ্-ছাদিক' অর্থাৎ 'সত্যবাদী' উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই যে, তাঁর নবুওয়াত লাভের পর এই লোকদেরই অনেকে তাদের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে তাঁর বিরোধিতা করে। কারণ অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্য তাদের অন্তরকে পাথরের মত কঠিন করে ফেলেছিল। ফলে তারা সত্যের ডাকে সাড়া দান থেকে বিরত থাকে।

## সত্যের সন্ধান

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন একজন মিষ্টভাষী, ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। তিনি চিন্তা ও ধ্যান করতে ভালবাসতেন। তিনি তাঁর সমবয়সী অন্য লোকদের মত ছিলেন না। দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। আর এটা ছিল এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা গোটা মানবজাতির ভবিষ্যত পথপ্রদর্শক ও শিক্ষকের জন্যে পুরোপুরি মানানসই ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রায়ই নূর পাহাড়ে (আল্-জাবাল্-আন্-নূর)-এর হিরা নামক গুহায় গিয়ে একাকী থাকতেন এবং চিন্তা ও ধ্যান করতেন। বিশেষ করে রামাদান মাসে তিনি সেখানে থাকতেন এবং সৃষ্টিজগতের রহস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে কাটাতেন। তিনি তাঁর অন্তরে সত্যের জন্যে খুবই আগ্রহ অনুভব করতেন এবং আন্তরিকতার সাথে সত্যের সন্ধান করতেন।

তিনি কেন এরূপ করতেন? কারণ তাঁর অনুসন্ধানী মনে মানুষ, তার সৃষ্টি ও তার চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে যেসব প্রশ্নের উদয় হত তিনি তার জবাব পাচ্ছিলেন না। তেমনি তাঁর চারদিককার সমাজে যে ঝগড়া-ফাছাদ, বিরোধ-বিসম্বাদ ও অনৈক্য বিরাজ করছিল তা থেকে তিনি মনঃকষ্টে ভুগতেন।

তিনি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। তৎকালে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ছিল ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্ম। কিন্তু উভয় ধর্মের ধর্মনেতা ও পণ্ডিতগণ ধর্ম দু'টিকে এতই বিকৃত করে ফেলেছিলেন যে, বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানের কাছে এ দু'টি ধর্মের কোনই আবেদন ছিল না। তাঁর সমাজে তিনি দেখতে পান অর্থহীন রক্তপাত, গোত্রীয় বিরোধ, শক্তিমানদের দ্বারা দুর্বল-অসহায়দের ওপর জুলুম-নির্যাতন, মূর্তিপূজা ও নারীদের অমর্যাদা। তিনি এসবের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

মক্কার লোকেরা নিজেদের হাতে তৈরী মূর্তির পূজা করত। মূর্তিপূজা যে একটি বাজে ও ঘৃণ্য কাজ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সব সময়ই সে সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। তিনি দেখেন যে, মূর্তি নড়াচড়া করতে পারে না, কথা বলতে পারে না বা অন্য কোন কাজ করতে পারে না। তাহলে কি করে ওগুলোর পক্ষে মানুষের আবেদনে সাড়া দেয়া সম্ভব হতে পারে?

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চিন্তাশীল মনে এসব কিছুই অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে। তিনি তাঁর অন্তরে জাগ্রত এসব দৃঢ়মূল অনুভূতিসমূহের জবাব খুঁজে পাবার জন্যেই হিরা গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতেন। বস্তুতঃ তাঁর লক্ষ্য ছিল অন্তরে শান্তি, সান্ত্বনা ও

সঠিক পথনির্দেশ লাভ। এছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে? নিঃসন্দেহে না। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হৃদয় মক্কার লোকদের জন্যে গভীর দরদ ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ এবং তাদের কল্যাণের জন্য উদ্বেগাকুল ছিল। এ নগরীতে যখন বিশৃঙ্খলা, অন্যায়-অবিচার, মিথ্যাচার ও শোষণ শিকড় গেড়ে বসে ছিল তখন তাঁর নির্মল অন্তঃকরণ কিভাবে চুপ করে থাকতে পারে?

মক্কার লোকেরা বহু মূর্তির পূজা করত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল হুবাল, আল্-লাত্ ও আল্-'উয্যা। এগুলোসহ সকল মূর্তিই ছিল প্রাণহীন পাথরমাত্র। কেউ যদি এসব মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলত তখন নিজেদের রক্ষা করার মত ক্ষমতাও এগুলোর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মক্কার লোকেরা এগুলোর পূজা করত, এগুলোর কাছে সাহায্য চাইত, এগুলোর নামে শপথ গ্রহণ করত এবং এগুলোর জন্য লড়াই করত। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উৎসুক মন সত্যের সন্ধান করত, তাঁর সমাজে প্রচলিত সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে মুক্তির পথ খুঁজত এবং বিরাজমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করত। ঠিক এমনি এক অবস্থায় তিনি যখন রামাদান মাসে হিরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে তাঁর রহমতের দ্বারা ভূষিত করলেন– কুর'আন মজীদের প্রথম ওয়াহী নাযিল করলেন।

## সত্যলাভ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স তখন চল্লিশ বছর। পবিত্র রামাদান মাসের এক রাতের কথা। তিনি তখন হিরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন ফেরেশতা তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন।

"পড়ুন!" ফেরেশতা বললেন। "আমি পড়তে জানি না।" হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জবাব দিলেন। তাঁর এ জবাবের পর ফেরেশতা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং বুকের সাথে এমন শক্তভাবে চেপে ধরেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মনে হচ্ছিল যে, তিনি শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবেন। এরপর ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় বললেন ঃ "পড়ুন!" হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আগের জবাবই দিলেন। ফেরেশতা তাঁকে আবারো বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আগের চেয়েও জোরে চাপ দিলেন, তারপর ছেড়ে দিলেন। ফেরেশতা তাঁকে তৃতীয় বারের মত বললেন ঃ "পড়ুন!" হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবারও একই জবাব দিলেন ঃ "আমি পড়তে জানি না।" ফেরেশতা তাঁকে তৃতীয় বারের জন্য

বুকে জড়িয়ে ধরে আরো জোরে চাপ দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার ভয় আরো বেড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি কি পড়ব?" তখন ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরস্পর জড়িত বস্তু (প্রাথমিক ভ্রূণ) থেকে। পড়, তোমার রব বড়ই মহানুভব, যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।"– (সূরাহ্ আল্-'আলাক– ৯৬ ঃ ১-৫)

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এ আয়াতগুলো পড়ে গেলেন এবং তাঁর মনে হল যেন এর শব্দগুলো তাঁর হৃদয়ে লেখা হয়ে গেছে।

এ আয়াত ক'টিই হচ্ছে কুর'আন মজীদের সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াতসমষ্টি।

কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল হিসেবে এমন এক ব্যক্তিকে বেছে নিলেন যিনি উম্মী– যিনি লিখতে-পড়তে জানেন না (সূরাহ্ আল্-আ'রাফ– ৭ ঃ ১৫৭-১৫৮, সূরাহ্ আল-'আন্কাবুত– ২৯ ঃ ৪৮-৪৯, সূরাহ্ আল-জুমু'আহ– ৬২ ঃ ২)। সে যুগে গোটা আরব উপদ্বীপে খুব কম সংখ্যক লোকই লিখতে-পড়তে জানত। অথচ সেই সমাজে জন্মগ্রহণকারী উম্মী নবীর (সাঃ) মাধ্যমে যে মহাগ্রন্থ কুর'আন মানুষের নিকট পেশ করা হল তা মানগত দিক থেকে সে যুগের সকল ভাষার উন্নত মানের সকল সাহিত্যকে অতিক্রম করে যায় এবং আজ পর্যন্ত এর সমমান সম্পন্ন গ্রন্থ কোন ভাষায় রচিত হয়নি। বস্তুতঃ কুর'আন মজীদের বা তার কোন সূরাহ্র সমতুল্য রচনা পেশ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৮৮; সূরাহ্ আল-বাকারাহ্– ২ ঃ ২৩; সূরাহ্ ইউনুস– ১০ ঃ ৩৭-৩৮)। তাই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মুখে এমন অতুলনীয় মানসম্পন্ন ও জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে আরবরা যে বিস্মিত হয়েছিল তার কারণ সহজেই বুঝা যেতে পারে।

প্রথম বারের মত ফেরেশতার আগমন ও ওয়াহী নাযিলের এ ঘটনায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) খুবই বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যান। তিনি এদিক সেদিক তাকাতে থাকলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন এবং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন, যেন নড়াচড়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি যখন আকাশের দিকে তাকালেন তখন

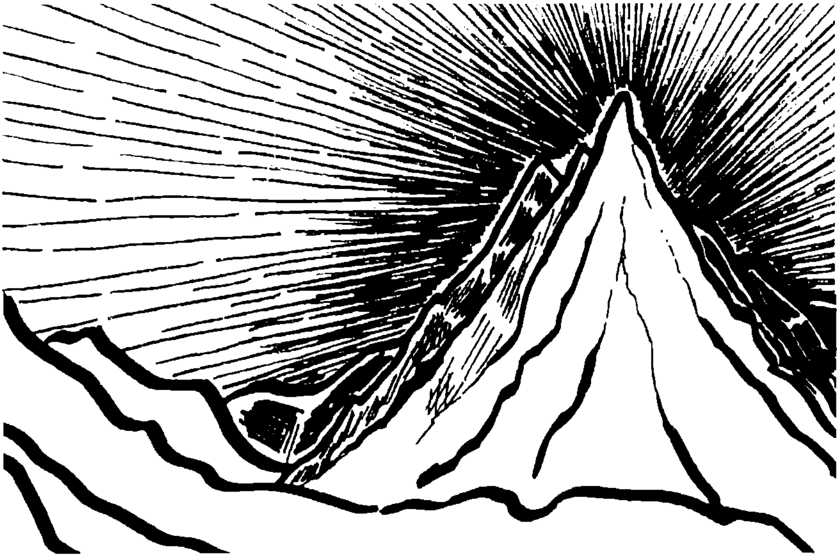

হিরা' গুহা– প্রথম ওয়াহী নাযিলের স্থান

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)কে একজন বিরাট আকারের মানুষের আকৃতিতে আসমানে উড়তে দেখলেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে ডেকে বললেন ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আর আমি জিবরাঈল।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যেদিকে তাকান সেদিকেই কিছুটা দূরে জিবরাঈল (আঃ)কে উড়তে দেখেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অত্যন্ত আতঙ্কিত অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেন এবং হযরত খাদীজাহর পাশে বসে পড়লেন। তিনি হযরত খাদীজাহ্‌র নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন।

মহীয়সী মহিলা খাদীজাহ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী– যিনি তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁর সেবাযত্ন করেন। স্বামীর উত্তম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাথে খাদীজাহ পুরোপুরি পরিচিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর স্বামীর ওপর পুরো বিশ্বাস রাখতেন। তাই তিনি তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন ঃ "হে আমার চাচার ছেলে! আনন্দিত হোন এবং খুশীমনে থাকুন। যার হাতে খাদীজাহ্‌র প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, নিঃসন্দেহে আপনি এ জাতির নবী হবেন বলে আমি আশা করছি। আপনি কখনো কারো কোন ক্ষতি করেননি। আপনি লোকদের প্রতি দয়ালু এবং

আপনি গরীবদেরকে সাহায্য করেন। অতএব, কিছুতেই আল্লাহ্ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়ার জন্যে হযরত খাদীজাহকে অনুরোধ করলেন। হযরত খাদীজাহ তাঁকে ঢেকে দিলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

এরপর হযরত খাদীজাহ তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ বিন নওফাল বিন আসাদ বিন আবদুল 'উয্যা-র নিকট গেলেন। ওয়ারাকাহ ছিলেন বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি খৃস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাওরাহ ও ইন্জীল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ওয়ারাকাহ হযরত খাদীজাহর নিকট থেকে সব কিছু শুনলেন, তারপর বললেন ঃ "পবিত্র! পবিত্র! যেই শক্তির হাতে ওয়ারাকাহর প্রাণ নিবদ্ধ তাঁর শপথ! হে খাদীজাহ! তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এ হচ্ছে সেই সত্তা (জিবরাঈল ফেরেশতা) যে সব গোপন রহস্যের সংরক্ষণ-কারী– আল্লাহ্ যাকে মূসার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তুমি তাঁকে (হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে) ধৈর্য ধারণ করতে ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে বল।"

হযরত খাদীজাহ ঘরে ফিরে এলেন ও ওয়ারাকাহ তাঁর নিকট যে সুসংবাদ দিয়েছেন তা তাঁর স্বামীকে জানালেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন ও সাহস যোগালেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট প্রথম বার ওয়াহী নাযিল হবার পর কয়েক দিন, মতান্তরে কয়েক মাস ওয়াহী নাযিল বন্ধ থাকল। এতে তিনি খুবই মনমরা হয়ে গেলেন। এরপর তিনি হঠাৎ করে একদিন আবার জিবরাঈল (আঃ)কে দেখতে পেলেন। জিবরাঈল (আঃ) একটি ভাসমান আসনে বসে আকাশে উড়ছিলেন। এতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হতচকিত হলেন ও ছুটে ঘরে চলে গেলেন। তিনি তাঁকে ঢেকে দেয়ার জন্যে হযরত খাদীজাহকে অনুরোধ জানালেন। হযরত খাদীজাহ তাঁকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন; হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন।

কয়েক মিনিট পরই হযরত খাদীজাহ দেখলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেঁপে কেঁপে উঠছেন, বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন ও ঘামছেন। এসময় জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট দ্বিতীয় ওয়াহী নিয়ে এলেন। এতে বলা হয় ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَأَنذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ○ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ○ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ○

–"হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! ওঠ ও সতর্ক কর। তোমার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাককে পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। আর অধিক প্রতিদানের আশায় দান করো না এবং আপন রবের ওয়াস্তে ছবর কর।" (সূরাহ আল-মুদ্দাছ্ছির – ৭৪ ঃ ১-৭)

হযরত খাদীজাহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এ অবস্থা দেখে তাঁকে আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বললেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবার তাঁর ওয়াহী লাভ সম্বন্ধে পুনরায় নিশ্চয়তা লাভ করেছেন। তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ঃ "হে খাদীজাহ! আমার তন্দ্রা ও বিশ্রামের যুগ অতীত হয়ে গেছে। জিবরাঈল আমাকে লোকদের সতর্ক করতে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে বলেছেন। কিন্তু আমি কা'দেরকে দাওয়াত করব? কে আমার কথা শুনবে?"

হযরত খাদীজাহ তাঁকে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁর সাফল্য সম্পর্কে দৃঢ় আশা প্রকাশ করলেন। আর তিনিই হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর ঈমান আনয়নকারী প্রথম ব্যক্তি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্য করার বিষয় যে, গোটা মানবজাতির মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত খাদীজাহ (রাঃ)।

এটা কতই না চমৎকার ব্যাপার যে, হযরত খাদীজাহ (রাঃ) তাঁর স্বামীর আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন! বস্তুতঃ একজন লোক কেন সে সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর চেয়ে আর কে বেশী ভালভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন? হযরত খাদীজাহ (রাঃ) অন্য যে কারো চেয়ে ভালভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে জানতেন। ফলে তাঁর পক্ষেই তাঁর স্বামীর সততা ও নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দেয়া সবার চেয়ে বেশী সম্ভব ছিল।

কোন লোকের পক্ষেই স্ত্রীর নিকট থেকে নিজের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ স্ত্রীই তাকে সবচেয়ে কাছে থেকে ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জানে। এযুগের প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষদের জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে আমরা যদি তা করতে পারি তাহলে এ পৃথিবী মানুষের বসবাসের জন্যে অধিকতর উপযোগী ও উত্তম জায়গায় পরিণত হবে।

## ইসলামী আন্দোলনের সূচনা

ওয়াহী নাযিলের সাথে সাথে আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ভূমিকা শুরু হল। তিনি তাঁর বাকী জীবনে যে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যান তারও সূচনা হয়

এখান থেকেই। তাঁর এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়টি ছিল তিন বছরের অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওয়াহী নাযিল হওয়ার পর থেকে ৬১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রথম দিকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেবল তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও বিশেষভাবে বিশ্বাস করার মত লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই হযরত 'আলী (আবু তালিবের পুত্র) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হলেন ইসলাম গ্রহণকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারিসাহ। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বন্ধুদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

পর পর চারজন লোক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলেন। তাঁদের পরিচিতি এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি লক্ষ্য করার মত। তাঁরা হলেন ঃ প্রথম– তাঁর স্ত্রী খাদীজাহ, দ্বিতীয় তাঁর চাচাত ভাই আলী, তৃতীয়– তাঁর ক্রীতদাস যায়েদ ও চতুর্থ – তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সম্মানিত ব্যবসায়ী আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হুম)। তাঁদের প্রত্যেকেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর খুবই কাছের মানুষ, তাঁর প্রিয়জন– যারা তাঁকে ভালভাবে জানতেন। তাঁরা কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

## হযরত 'আলীর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই হযরত 'আলী (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে পাঠিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে 'উযূ ও ছালাত আদায়ের নিয়ম শিখিয়ে দেন। এরপর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তা হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-কে শিখিয়ে দেন এবং সে নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা নিয়মিত ছালাত আদায় করতেন।

বালক হযরত 'আলী (রাঃ) তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজাহ (রাঃ)কে রুকূ'-সিজ্‌দাহ করতে ও কুর'আন তিলাওয়াত করতে দেখলেন। এ ব্যতিক্রমী দৃশ্যটি তাঁর নিকট খুবই ভাল লাগল। তাই ছালাত শেষ হলে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট এ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, "আপনারা কার উদ্দেশে সিজ্‌দাহ করলেন?"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সিজ্‌দাহ করেছি যিনি আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন এবং লোকদেরকে তাঁর দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে আদেশ করেছেন।"

এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত 'আলীকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের জন্যে এবং তাঁর ওপরে যে বাণী নাযিল হয়েছে তা গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দিলেন। এছাড়া তিনি ইতিমধ্যেই কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছিল তা থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন।

এতে হযরত 'আলী (রাঃ) নিজের মধ্যে খুব আবেগ-উত্তেজনা অনুভব করলেন। তিনি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর বললেন যে, তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পিতার সাথে আলোচনা করবেন।

হযরত 'আলী (রাঃ) অত্যন্ত আবেগ-উত্তেজনা, অস্থিরতা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে রাত কাটালেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে ভাবলেন।

পরদিন সকালে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং ইসলামে ঈমান আনার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌ আমার পিতা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ না করেই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আমি কেন আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করার ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করব?"

বালক বয়সে হযরত 'আলী (রাঃ)-র ইসলাম গ্রহণ কিশোর-তরুণদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। এ ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের উচিত এ পৃথিবীর জীবনকে প্রকৃতই অর্থবহ ও লক্ষ্যের অভিসারী করে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামের জন্যে কাজ করা। নিঃসন্দেহে এটাই হচ্ছে প্রকৃত শান্তি ও সুখী জীবনের পথ। প্রথম মুসলিম বালক হযরত 'আলী (রাঃ) এই শান্তির পথ ইসলামকে বেছে নিয়েছিলেন।

## প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য মুসলমানগণ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলাম প্রচার শুরু করার পর সেই প্রথম যুগে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অল্প সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হন। তোমাদের জানার জন্যে এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হল।

প্রাথমিক যুগের মুসলিম পুরুষদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ হযরত 'আলী বিন আবি তালিব, হযরত যায়েদ বিন হারিসাহ, হযরত আবু বকর বিন আবি কুহাফাহ,

হযরত 'উছমান বিন 'আফফান, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবদুর রহমান বিন 'আওফ, হযরত তাল্‌হা বিন 'উবাইদিল্লাহ, হযরত আবু যার আল-গিফারী, হযরত যুবাইর বিন আল-'আওয়াম, হযরত আবু 'উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ, হযরত আর্‌কাম বিন আবিল্‌-আর্‌কাম আল-মাখযুমী (যিনি আর্‌কাম বিন আব্‌দি মানাফ বিন আসাদ নামেও পরিচিত), হযরত সুহাইব আর-রুমী, হযরত 'আব্‌দুল্লাহ বিন মাস্‌'উদ, হযরত খাব্বাব বিন আল-আরাত্‌, হযরত 'উছমান বিন মায'উন, হযরত জা'ফার বিন আবি তালিব ও হযরত নু'আইম বিন 'আব্‌দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম)।

এযুগে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব মহীয়সী মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ হযরত খাদীজাহ বিন্‌তে খুয়াইলিদ, হযরত ফাতিমাহ বিন্‌তিল-খাত্তাব, হযরত আসমা বিন্‌তে আবি বাকর, হযরত ফাতিমাহ বিন্‌তিল মুজাল্লিল, হযরত ফুকাইহাহ বিন্‌তে ইয়াসার, হযরত আসমা বিন্‌তে উমাইস, হযরত আসমা বিন্‌তে সালামাহ, হযরত রাম্‌লাহ বিন্‌তে আবি 'আওফ ও হযরত হুমাইনাহ বিন্‌তে খালাফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুন্না)।

## প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি

ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন লোককে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে ধীরে ধীরে মক্কার সকল বয়সের লোকদের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে ইসলামের বিস্তার ঘটতে থাকে।

মক্কার লোকদের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর প্রচারিত বাণী আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। শুরুতে তারা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। তারা মনে করে যে, মুসলমানদের মনে একটা উদ্ভট কল্পনা জেগেছে এবং তা খুব শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে; শেষ পর্যন্ত মূর্তি-পূজার বিজয় হবে।

তিন বছর পার হয়ে গেল। মক্কাহ উপত্যকার প্রায় সর্বত্র আল্লাহ্‌র বাণীর প্রচার অব্যাহত থাকল।

## ইসলামী আন্দোলন প্রকাশ্য রূপ নিল

প্রথম ওয়াহী নাযিল হবার তিন বছর পর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি হুকুম নাযিল করলেন ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

–"যা তোমাকে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দাও এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"–(সূরাহ্ আল-হিজ্‌র্– ১৫ ঃ ৯৪)

এ ছিল প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ। এটা ছিল ইসলামী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়– প্রকাশ্য পর্যায়।

## হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নৈশভোজে 'আলী (রাঃ)-এর ঘোষণা

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ লাভের পর সম্ভাব্য নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ঈমানসহকারে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে নৈশভোজের আয়োজন করলেন। খানাপিনা শেষ হবার পর তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আমি এমন কোন আরবের কথা জানি না যে তার আপন লোকদের নিকট আমার চেয়ে উত্তম বাণী নিয়ে এসেছে। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু নিয়ে এসেছি যা ইহকালের জন্যেও সর্বোত্তম, পরকালের জন্যেও সর্বোত্তম। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমাদের মধ্যে কে এ ব্যাপারে আমার পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত আছ?"

নৈশভোজে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক লোকদের মধ্য থেকে কেউই জবাব দিল না। তারা উঠে সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হল। তখন কিশোর হযরত 'আলী (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ "আমি আপনাদের মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট, আমি একজন কিশোর হতে পারি, আমার পা যথেষ্ট মুযবুত না হতে পারে, কিন্তু হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার সাহায্যকারী হব। যে-ই আপনার বিরোধিতা করবে আমি তাকে জানের দুশমন গণ্য করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব।" এতে বয়স্ক লোকেরা অট্টহাসি হাসল। তারপর যে যার পথে চলে গেল।

## ছাফা পাহাড়ের ওপর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবার মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি ছাফা পাহাড়ের ওপর উঠে মক্কাবাসীদেরকে ডাক দিলেন। যারা তাঁকে দেখতে পেল তারা ছাফা পাহাড়ের নীচে এসে সমবেত হল। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমি যদি বলি যে, আমি পাহাড়ের ওপাশে একটি শত্রুবাহিনীকে দেখতে পাচ্ছি যারা তোমাদের ওপর হামলা চালাবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?"

জবাবে তারা বলল ঃ "হ্যা, অবশ্যই। কারণ আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি এবং তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি।"

তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন ঃ "তাহলে জেনে রাখ, আমি একজন সতর্ককারী এবং আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। হে বানু 'আব্দিল মুত্তালিব! হে বানু 'আব্দি মানাফ! হে বানু যুহ্‌রাহ! হে বানু তাইম! হে বানু মাখ্‌যুম! হে বানু আসাদ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে– আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করার জন্যে আমাকে আদেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা যদি ঘোষণা কর যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই তাহলে ইহকালে ও পরকালে তোমরা কল্যাণের অধিকারী হবে।"

একথা শুনে তাঁর চাচা আবু লাহাব ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে বলল ঃ "আজকেই তোমার দুই হাত ধ্বংস হয়ে যাক। তুমি এজন্যই কি আমাদেরকে জমায়েত করেছ?"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এতে মনে খুবই ক পেলেন এবং মুহূর্তের জন্যে তাঁর চাচার দিকে তাকালেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আবু লাহাবের জন্যে যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে তা ওয়াহী মারফত তাঁকে জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِيْ جِيْدِهَا
حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

–"আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও সে যা উপার্জন করেছে তা তাকে এ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সে খুব শ্রীঘ্রই শিখাযুক্ত আগুনে (জাহান্নামে) পৌঁছে যাবে, আর তার জ্বলানী কাঠ বহণকারিনী স্ত্রীও– যার গলায় খেজুর পাতার রশি থাকবে।"– (সূরাহ আল্-লাহাব– ১১১ ঃ ১-৫)

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার লোকদেরকে প্রকাশ্যেই আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ শুরু হয়ে গেল। এ সময় থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম যুগের অনুসারীরা অত্যন্ত সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সাথে এ শত্রুতা ও বিরোধিতার মোকাবিলা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে এ ধরনের ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত খুব কই চোখে পড়ে।

## তীব্র বিরোধিতা ও নির্যাতন

মক্কাবাসীরা এর আগে ইসলামের এ আন্দোলনের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত দিলে তারা তাঁর তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। তারা ইসলামকে তাদের পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি হুমকি বলে মনে করতে লাগলো। অন্যদিকে তারা দেখতে পেল যে, ইসলাম ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাই তারা ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকানোর জন্যে ইসলামের অনুসারীদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করল।

ঐ সময় প্রতিদিনই ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। এ কারণে মুসলমানদের প্রতি মূর্তিপূজকদের আক্রোশ আরো তীব্রতর হতে লাগল।

কুরাইশরা প্রথমে আবু তালিবের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করল। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে আর পৃষ্ঠপোষকতা না দেয়ার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করল। এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ গোত্রের প্রভাবশালী লোকদের দু'-দু'টি প্রতিনিধিদল দুইবার আবু তালিবের সাথে সাক্ষাত করে। তিনি শান্তভাবে তাদের কথা শুনলেন এবং কিছু সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন।

আবু তালিব ছিলেন কুরাইশদের নেতা এবং একই সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচা। একারণে কুরাইশরা তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই আবু তালিব হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে ডেকে বললেন যে, তিনি যেন এমন কিছু না করেন যাতে তাঁর ওপর বেশী চাপ সৃষ্টি হয়।

এটা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য একটা কঠিন পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু তিনি এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন ঃ " হে আমার চাচা! আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এবং আমাকে আমার এ দাওয়াতী মিশন পরিত্যাগ করতে বলে তবু আমি কিছুতেই তা পরিত্যাগ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ এ মিশনকে বিজয়ী করেন বা আমি এ কাজ করতে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।"

আবু তালিব হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দৃঢ়তা দেখে অভিভূত হয়ে যান এবং বলেন ঃ "যাও, তুমি যা খুশী তা-ই করতে পার। আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনোই তোমার ওপর থেকে আমার সমর্থন প্রত্যাহার করব না।"

মক্কার কাফিরদের হাতে সর্বপ্রথম যে মুসলমান নির্যাতন ভোগ করেন তিনি হচ্ছেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। একবার হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এক পাহাড়ী উপত্যকায় ছালাত আদায়কালে ইসলামের দুশমনরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে হযরত সা'দ বিন্ আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তলোয়ারের আঘাতে আহত হন।

আরেকবার হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কা'বাহ্ ঘরের নিকটে ইসলামের প্রচার করার সময় কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এ সময় হযরত হারিস বিন আবি হালাহ্ আক্রমণকারী জনতাকে থামাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কাফিররা তাঁর ওপর হামলা করে ও তাঁকে হত্যা করে। তিনি হচ্ছেন ইসলামের জন্যে শাহাদাত বরণকারী প্রথম মুসলমান।

এছাড়া এ সময় ইসলাম গ্রহণকারী আবিসিনীয় ক্রীতদাস হযরত বিলাল বিন রাবাহ্ (রাঃ)-এর ওপর তাঁর মালিক অমানুষিক অত্যাচার চালায়। তাঁকে কড়া রোদে মরুভূমির বুকে আগুনের মত উত্তপ্ত বালুর ওপরে শুইয়ে তাঁর বুকের ওপর একটি ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়। অন্য কোন কারণে নয়, কেবল ইসলাম গ্রহণের কারণেই তাঁর ওপর এ নির্যাতন চালানো হয়। হযরত বিলাল (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এ নির্যাতন সহ্য করেন এবং বলতে থাকেন "আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ এক।"

কাফিররা তাঁকে ঈমান থেকে কুফরে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে নির্যাতন থেকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে আসেন। তিনি হযরত বিলাল (রাঃ)কে তাঁর কাফির মালিকের নিকট থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন।

ঐ সময় আরো যেসব মুসলমান কাফিরদের হাতে নির্যাতন ভোগ করেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ হযরত 'আম্মার, হযরত আবু ফুকাইহাহ্, হযরত সুহাইব আর-রূমী ও হযরত খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আন্হুম)। কাফিররা এমন কি মুসলমান মহিলাদের ওপরও নির্যাতন চালায়। এ সময় যে সব মুসলিম মহিলা নির্যাতনের শিকার হন তাঁরা হচ্ছেন ঃ হযরত সুমাইয়াহ্, হযরত লুবাইনাহ্, হযরত নাহদিয়াহ ও হযরত উম্মে 'উবাইস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুন্না)।

কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও অপদস্ত করে। তারা তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করে এবং তিনি যাদুগ্রস্ত বা জিনগ্রস্ত বলেও তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়। একবার তিনি ছালাত আদায় করার সময় একজন কাফির তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করে। এসময় হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে পড়েন এবং তাঁকে উদ্ধার করেন।

এছাড়া আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঘরের সামনে থেকে শুরু করে তাঁর নিয়মিত চলাচলের পথে কাঁটা ও ময়লা- আবর্জনা ছড়িয়ে রাখত। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জবাবে কিছুই বলতেন না, বরং নীরবে এ সব সরিয়ে দিয়ে পথ চলতেন। হঠাৎ একদিন তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, তাঁর ঘরের সামনের পথ পরিষ্কার– কোন কাঁটা বা ময়লা-আবর্জনা নেই। তিনি বুঝতে পারলেন যে, উম্মে জামীল হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই তিনি তাকে দেখার জন্য গেলেন। এ থেকেই প্রমাণ হয় তিনি কত বড় মহান ছিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সব সময়ই সকলের প্রতিই, এমন কি তাঁর শত্রুদের প্রতিও দয়া ও মহানুভবতা দেখাতেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আরো বেশী আশাবাদ ও দৃঢ়তা সহকারে ইসলামের প্রচার অব্যাহত রাখেন। সাথে সাথে কাফিরদের দুশমনীও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য কাফিররা তাদের সাধ্যমত সকল চেষ্টাই করতে লাগল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টায় কোনই ফল হয়নি। বরং কাফিরদের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচার, জুলুম-নির্যাতন ও অপমান-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে দিনের পর দিন অনেক বেশী সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

এসময় হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছোট চাচা হযরত হাম্‌যাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত হাম্‌যাহ (রাঃ) একজন সাহসী লোক ছিলেন। একারণে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় ইসলামের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় কাফির কুরাইশরা মুসলমানদের অপদস্ত করা থেকে অনেকাংশে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

## আবু জাহ্‌ল্‌ ও উটবিক্রেতা

একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বাহ ঘরের কাছাকাছি এক জায়গায় বসা ছিলেন। ঐ সময় কা'বাহ ঘরের পাশে কুরাইশ গোত্রের লোকদের এক বৈঠক চলছিল। তখন ইরাশ থেকে আগত এক ব্যক্তি সেখানে এল এবং লোকদের নিকট সাহায্য চাইল। সে বলল ঃ "আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি আবুল হাকাম বিন হিশামের নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন? আমি একজন বহিরাগত ব্যক্তি, একজন পথিক। কিন্তু তিনি আমার পাওনা পরিশোধ করছেন না।"

আবুল হাকাম বিন হিশাম ছিল মক্কার প্রভাবশালী লোকদের একজন। সে মুসলমানদের খুবই ঘৃণা করত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুশ্‌মনী ও ব্যাপক সহিংস আচরণ করত। 'আবুল হাকাম' মানে 'জ্ঞানপিতা' অর্থাৎ 'অত্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি'। কিন্তু সে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্ধবিদ্বেষ ও অন্ধশত্রুতা পোষণ করত বিধায় 'আবু জাহ্‌ল্‌' অর্থাৎ 'মুর্খতার পিতা' বা 'অত্যন্ত মুর্খতার অধিকারী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

কুরাইশদের ঐ সমাবেশে যারা হাযির ছিল তাদের বেশীর ভাগই ছিল আবু জাহ্‌লের বন্ধু। তাই তারা আগন্তুক ব্যক্তির কথা শুনলেও এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে কেউ আবু জাহ্‌লের বিরাগভাজন হতে চাচ্ছিল না। বরং তারা মনে করল যে, এ ঘটনাটাকে কাজে লাগিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি আবু জাহ্‌লের দুশমনী বৃদ্ধি করবে। তাই তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে দেখিয়ে বলল ঃ "তুমি ঐখানে একজন লোককে বসা দেখতে পাচ্ছ? তার কাছে যাও; সে তোমাকে সাহায্য করবে।"

লোকটি জানত না যে, আবু জাহ্‌ল্‌ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঘোরতর দুশমন। তাই সে তাঁর কাছে গিয়ে তার সমস্যার কথা বলল। সে জানাল যে, সে আবু জাহ্‌লের নিকট উট বিক্রি করেছে, কিন্তু বার বার তাগাদা করা সত্ত্বেও সে এখনো তার পাওনা পরিশোধ করেনি।

তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কোনরূপ দ্বিধা না করেই লোকটিকে সাহায্য করতে রাযী হলেন। তিনি লোকটির সাথে আবু জাহ্‌লের বাড়ীতে গেলেন। দূর থেকে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ঘটনাটি দেখতে লাগল এবং দু'জনের মধ্যে একটা বড় ধরনের সংঘাত বাধার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। তাছাড়া তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পিছনে পিছনে পাঠাল।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আবু জাহ্‌লের ঘরের দরজায় শব্দ করলেন।

আবু জাহ্‌ল্‌ ভিতর থেকে আওয়ায দিল ঃ "কে?"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, "আমি মুহাম্মাদ। বেরিয়ে এসো।"

আবু জাহ্‌ল্‌ উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে এল। কিন্তু বেরোবার পর তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ "এই লোকটির পাওনা দিয়ে দাও।"

আবু জাহ্‌ল্‌ বলল ঃ "এক মিনিট অপেক্ষা কর; আমি এক্ষুনি তার পাওনা নিয়ে আসছি।" সে ঘরের মধ্যে চলে গেল এবং খুব তাড়াতাড়ি টাকাসহ বেরিয়ে এসে লোকটির পাওনা পরিশোধ করে দিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আগন্তুক লোকটিকে বললেন ঃ "তুমি এবার তোমার নিজের কাজে যেতে পার।"

লোকটি খুবই আনন্দিত হল। সে কুরাইশদের সমাবেশের কাছে গিয়ে বলল ঃ "আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কৃত করুন; তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।"

এরপর লোকটি আনন্দের সাথে নিজের পথে চলে গেল।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও আবু জাহ্লের মধ্যে সংঘাত বাধবে মনে করে তা চাক্ষুষভাবে দেখার জন্যে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল, এরপর সে ফিরে এল। সে বলল ঃ "খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার! মুহাম্মাদ যখন আবুল হাকামের (অর্থাৎ আবু জাহ্লের) ঘরের দরজায় আঘাত করল সাথে সাথেই আবুল হাকাম উত্তেজিত অবস্থায় বেরিয়ে এল।"

এরপর সে যা দেখেছিল তা পুরোপুরি বর্ণনা করল।

এরপর আবু জাহ্ল স্বয়ং সেখানে এসে হাযির হল। সাথে সাথে তারা জিজ্ঞেস করল ঃ "ব্যাপার কি? আমরা তো কক্ষনোই এমন কাণ্ড দেখিনি। তুমি এটা কি করলে?"

আবু জাহ্ল্ রাগের ও বিস্ময়ের সাথে বলল ঃ "গোল্লায় যাও তোমরা। আল্লাহ্র কসম, সে যখন আমার দরজায় আঘাত করল এবং তার গলার আওয়ায শোনার সাথে সাথেই কেন জানি আমার মধ্যে আতঙ্ক এসে গেল। এরপর আমি যখন বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, তার মাথার ওপর দিয়ে একটি বিরাটাকারের উট গলা বাড়িয়ে আছে এবং উটটির কাঁধ ও দাঁতগুলো এমনই যে, আমি এর আগে এমনটি আর দেখিনি। আল্লাহ্র কসম, আমি যদি লোকটির পাওনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করতাম তাহলে নিঃসন্দেহে উটটি আমাকে খেয়ে ফেলত।"

কেমন বিস্ময়কর সাহসের অধিকারী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)! আর কতই না মজবুত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি! তিনি সব সময়ই ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতেন এবং যাদের সাহায্যের প্রয়োজন হত তাদেরকে সাহায্য করতেন। এজন্য এমন কি তিনি তাঁর জঘন্যতম দুশমনের মুখোমুখি হতেও দ্বিধা করতেন না।

বস্তুতঃ আবু জাহ্ল্ উদ্ধত ও অহঙ্কারী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি ঘোরতর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা সত্ত্বেও তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সামনে তার পক্ষে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। এর কারণ ছিল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী সাহায্য।

এ ঘটনার মধ্যে তোমাদের জন্যে একটি মূলবান শিক্ষা রয়েছে। তা হচ্ছে, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মেনে চলতে হবে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। তোমাদেরকে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং দুর্বল, নির্যাতিত ও

অসহায়দের পক্ষে কথা বলতে হবে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আমাদের সকল শক্তি ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করে ইসলামের জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের শুধু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী পড়লেই হবে না, আমাদেরকে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে।

## 'উৎবাহ বিন রাবী'আহর প্রস্তাব

কুরাইশ গোত্রের অন্যতম নেতা 'উৎবাহ বিন রাবী'আহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে। সে বলে ঃ "তুমি যদি অর্থকড়ি চাও তাহলে আমরা আমাদের ধনসম্পদ একত্র করে তোমাকে দেব, তখন তুমি হবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তুমি যদি সম্মান চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের গোত্রপতি বানাব, তখন তুমি নিজে যে কোন বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আর তুমি যদি রাজা হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানাব।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জবাবে কুর'আন মজীদের সূরাহ হা-মীম-আস্- সাজ্‌দাহ (সূরাহ নং-৪১)-এর কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন 'উৎবাহ তার সঙ্গীসাথীদের নিকট ফিরে আসে। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সে এসে তাদেরকে জানাল যে, সে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট থেকে এমন কিছু কথা শুনেছে যেরূপ কথা এর আগে কখনো কারো কাছ থেকে শোনেনি।

বস্তুতঃ কোন পার্থিব লোভ-লালসাই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে সত্যের প্রচার থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।

## আরেকটি ধূর্ততাপূর্ণ প্রস্তাব

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে ইসলামে ঈমান পোষণ ও এর প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্যে কুরাইশদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। অপমান ও লাঞ্ছণা-গঞ্জনা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, জুলুম-নির্যাতন ও মিথ্যা প্রচারণা ব্যর্থ প্রমাণিত হল, বরং মুসলমানরা আরো বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। কুরাইশ বংশের নোতারা এবার আরো ধূর্ততাপূর্ণ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট প্রস্তাব দিল যে, তিনি যদি তাদের দেবদেবীদের পূজা করেন তাহলে প্রতিদানে তারাও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইলাহ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করবে। তাহলে দু'পক্ষের মধ্যে একটা আপোষরফা হবে ও শত্রুতা দূর হবে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট দিকনির্দেশনা নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণার নির্দেশ দেন যে, মৌলিক নীতিমালার প্রশ্নে এ ধরনের কোন আপোষরফা হতে পারে না। তাঁকে ঘোষণা করতে বলা হয় ঃ "তোমাদের রয়েছে তোমাদের নিজস্ব জীবনব্যবস্থা, আর আমারও রয়েছে নিজস্ব জীবনব্যবস্থা।" (সূরাহ্ আল-কাফিরূন– ১০৯ ঃ ৬) এভাবে সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

## আবিসিনিয়ায় হিজরত

কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে আপোষরফা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। মুসলমানদের জান-মালের ওপর হুমকি অনেক বেড়ে যায়। যেসব মুসলমান আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল ছিলেন বিশেষভাবে তাঁদেরই নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশী বিঘ্নিত হয়।

এমতাবস্থায় যেসব মুসলমান খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন। কারণ তখন নাজাশী নামে একজন মহৎপ্রাণ খৃস্টান রাজা আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে যার নাম ইথিওপিয়া) রাজত্ব করতেন।

তখন কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে ৮৩ জন মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। প্রথম গ্রুপে দশজন মুসলমান ছিলেন। এরাই ছিলেন আল্লাহ্‌র জন্যে নিজেদের দেশ থেকে হিজরতকারী প্রথম মুসলিম দল।

## মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কাফিররা 'আমর বিন্ আল-'আস ও আবদুল্লাহ বিন আবি রাবী'আহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলকে নাজাশীর দরবারে পাঠায়। তারা তাদের লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নাজাশীর দরবারের লোকদেরকে ঘুষ দেয় এবং মুসলিম মুহাজিরদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়। তারা অভিযোগ করে যে, এই মুহাজিররা হচ্ছে একদল স্বধর্মত্যাগী লোক এবং তারা এমন একটি অভিনব ধর্মের অনুসারী যার কথা ইতিপূর্বে কেউ শোনে নি।

নাজাশী পুরো বিষয়টি সম্বন্ধে জানার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে তাঁর সামনে আনার জন্যে আদেশ দিলেন। তাঁদেরকে নিয়ে আসা হলে নাজাশী জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরা যে নতুন ধর্মের অনুসরণ করার কারণে তোমাদের দেশ ছাড়তে হয়েছে সে ধর্মটি কি?"

তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর বিন আবি তালিব (রাঃ) বললেন ঃ "হে

রাজা! ইতিপূর্বে আমরা অজ্ঞতা, অনৈতিকতা এবং পাথর ও মূর্তির পূজায় ডুবে ছিলাম, মৃতপ্রাণী ভক্ষণ করতাম, সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার করতাম, স্বাভাবিক বন্ধন ছিন্ন করতাম, মেহমানদের সাথে খারাপ আচরণ করতাম এবং আমাদের মধ্যকার শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে শোষণ করত।

"এরপর আল্লাহ্ আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে নবী করে পাঠালেন যার বংশধারা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ও সততা আমাদের ভালভাবে জানা ছিল। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকেন এবং আমরাও আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব পাথর ও মূর্তির পূজা করতাম তা পরিত্যাগ করতে বলেন।

"তিনি আমাদেরকে সত্যকথা বলা, ওয়াদা রক্ষা করা, আত্মীয়-স্বজনদের উপকার করা, প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করা, রক্তপাত থেকে বিরত থাকা এবং যিনা-ব্যভিচার পরিহার করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকার, ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ না করার এবং কোন মহিলার ওপর মিথ্যা অপবাদ না দেয়ার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক না করার জন্যে হুকুম দিয়েছেন।

"তিনি আমাদেরকে ছালাত আদায়, ছাওম পালন ও যাকাত দেয়ার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর ওপর ও তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে যা এনেছেন তার ওপর ঈমান এনেছি এবং তিনি আমাদেরকে যা করতে বলেন ও যা করতে নিষেধ করেন সে ব্যাপারে আমরা তাঁর কথা মেনে চলি।

"একারণে আমাদের গোত্রের লোকেরা আমাদের ওপর হামলা করে, আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং আমাদেরকে সেই আগেকার অনৈতিকতা ও মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তারা মক্কায় আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। তাই আমরা ন্যায়বিচার ও শান্তিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে আপনার দেশে আশ্রয় চাইতে এসেছি।"

একথা শোনার পর নাজাশী তাঁদেরকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুর'আন থেকে কিছুটা পড়ে শুনাতে বললেন। তখন হযরত জা'ফর বিন আবি তালিব (রাঃ) কুর'আন মজীদের সূরাহ মার্ইয়াম (১৯তম সূরাহ্) তেলাওয়াত করে শুনান।

সূরাহ মার্ইয়ামের তেলাওয়াত শুনতে শুনতে নাজাশীর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ "এইমাত্র তোমরা যা পড়ে শুনালে এবং মূসার ওপর যা নাযিল হয়েছিল– উভয়ই অভিন্ন উৎস থেকে নাযিল

হয়েছে। তোমরা আমার রাজ্যে বসবাস করতে থাক, আমি তোমাদের বহিষ্কার করব না।" এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের ঘৃণ্য চক্রান্ত আবার ব্যর্থ হয়ে গেল।

## হযরত 'উমারের ইসলাম গ্রহণ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পর ষষ্ঠ বছরে 'উমার বিন আল-খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছরের নীচে। তিনি ছিলেন যেমন শক্তিশালী ও সাহসী তেমনি কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে হত্যা করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন পথে হযরত নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে হত্যা করতে যাচ্ছেন শুনে নু'আইম তাঁকে প্রথমে নিজের ঘর সামলাতে বললেন এবং জানালেন যে, 'উমারের বোন ফাতিমাহ ও তাঁর স্বামী সা'ঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এ খবর শুনে 'উমার ভীষণ রেগে গেলেন এবং সাথে সাথে বোনের বাড়ীর দিকে ছুটলেন। তিনি তাঁর বোনের ঘরের কাছে পৌঁছেই কুর'আন তিলাওয়াত শুনতে পেলেন। সেখানে হযরত খাব্বাব বিন আলআরাত্ (রাঃ) হযরত ফাতিমাহ বিন্‌তিল-খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত সা'ঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)কে কুর'আন মজীদের সূরাহ ত্বা-হা (২০তম সূরাহ) পড়ে শুনাচ্ছিলেন।

'উমার দরজায় আঘাত না করেই ঘরে ঢুকে পড়েন এবং রাগের সাথে বলেন ঃ "তোমরা কোন্ ফালতু জিনিস পড়ছিলে?"

হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) ও হযরত সা'ঈদ (রাঃ) জবাব দিলেন না। তাঁরা 'উমারকে ঢুকতে দেখেই হযরত খাব্বাব (রাঃ)কে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। 'উমার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং হযরত সা'ঈদ (রাঃ)কে প্রহার করতে শুরু করলেন। স্বামীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গিয়ে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)ও আহত হলেন।

বোনের শরীরে রক্ত দেখে 'উমার শান্ত ও সংযত হলেন এবং তাঁরা কি পড়ছিলেন তা দেখতে চাইলেন। হযরত ফাতিমাহ বিন্‌তিল্ খাত্তাব (রাঃ) বললেন যে, কুর'আনের অংশবিশেষ পড়ছিলেন এবং তা স্পর্শ করতে হলে অবশ্যই 'উমারকে 'উযূ' করতে হবে। তখন 'উমার 'উযূ করলেন। অতঃপর তাঁকে কুর'আনের কয়েকটি আয়াত পড়তে দেয়া হলো।

তিনি হযরত যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ)কে সাথে নিয়ে তায়েফে পৌঁছলেন। প্রথমেই তিনি সেখানকার তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তিনজনই ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে রাস্তার বখাটে ছেলেদের লেলিয়ে দেয় এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে দিতে বলে।

বখাটে ছেলেরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকে। পাথরের আঘাতে তাঁর পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তারা হৈ হুল্লুড় করে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের বিদ্রুপ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত শহর থেকে বের করে দেয়।

তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় ব্যথিত হৃদয় নিয়ে একটি বাগানে এসে আশ্রয় নেন এবং সেখানে ছালাত আদায় করেন।

বাগানের মালিকরা পুরো ঘটনা দেখেছিল। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থার কারণে খুবই দুঃখিত হয়। তারা তাঁর মেহমানদারী করে। তারা তাদের খৃস্টান গোলাম 'আদ্‌দাস-এর হাতে তাঁর জন্যে আঙ্গুর পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তী কালে 'আদ্‌দাস ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায়ই বলতেন যে, তায়েফের সেই দিনটি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন। কিন্তু তোমরা তাঁর মহত্ব ও মহানুভবতার কথা চিন্তা করে দেখ। তায়েফবাসীরা তাঁর ওপর হামলা করে, তাঁকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ওপরে হামলা-কারীদের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। বরং তাদের হেদায়াতের জন্য তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন।

এমনই ছিল রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও সুখ-শান্তি পেতে হলে আমাদের সকলকে অবশ্যই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে।

## মি'রাজ ঃ উর্ধলোকে পরিভ্রমণ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর পর কয়েকটি বড় ধরনের আঘাতের সম্মুখীন হন। চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী হযরত খাদীজাহ (রাঃ)র ইন্তেকালের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তায়েফে চরম নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হন। তবে এর পর পরই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর জন্যে এমন এক সান্ত্বনার ব্যবস্থা করা হয় যা তাঁর দুঃখক ভুলিয়ে দেয়। তা হচ্ছে

তিনি তাঁকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতেন, সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন এবং যখন তাঁর পাশে আর কেউ ছিল না তখন তিনিই তাঁর পাশে ছিলেন। তোমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সর্বপ্রথম হযরত খাদীজাহ (রাঃ)ই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলেন।

বস্তুতঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য এটা ছিল একটা মারাত্মক আঘাত। কিন্তু তাঁর পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কারণ মৃত্যু হচ্ছে জীবনের এক অনস্বীকার্য সত্য। সমস্ত মানুষকেই মরতে হবে; আমাদেরকেও একদিন মরতে হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর শৈশব কাল থেকেই একের পর এক আঘাত ও দুঃখ পেয়ে আসছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সারা জীবনই পরীক্ষা করেছেন। কারণ সর্বশেষ নবী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর অতুলনীয় ধৈর্য ও সহ্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখ কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন ও মৃত্যুর আঘাত সহ এসব পরীক্ষা যতই কঠিন ও অসহনীয় হোক না কেন, তিনি জীবনের সবগুলো পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপরে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য উপযুক্ত করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে গড়ে তোলেন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, খাঁটি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগোতে হবে। কেবল তাহলেই আমাদের প্রিয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পরকালে জান্নাতরূপ চিরন্তন রহমতের দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

## তায়েফে ঃ জীবনের কঠিনতম দিন

মক্কাবাসীদের নিষ্ঠুর আচরণে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) খুবই মর্মাহত হলেন। এবার তিনি মক্কার ষাট মাইল দূরবর্তী তায়েফ শহরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আশা করলেন, হয়ত সেখানকার লোকেরা তাঁকে সমর্থন করবে।

---

২। স্মর্তব্য ঃ হযরত খাদীজাহ (রাঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নি। অবশ্য হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি কয়েকজন মহিলাকে বিবাহ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে তাঁদেরকে বিবাহ করেন। এই মহিলাদের বেশীর ভাগই ছিলেন বিধবা। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত খাদীজাহ ছাড়া অন্য যে মহিলাদেরকে বিবাহ করেন তাঁরা হলেন হলেন ঃ হযরত সাওদাহ্, হযরত 'আয়েশাহ, হযরত হাফছাহ, হযরত যায়নাব বিনতুল হারিস, হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ, হযরত উম্মে হাবীবাহ, হযরত উম্মে সালামা, হযরত জুওয়াইরিয়াহ বিনতুল হারিস, হযরত মাইমুনা বিনতুল হারিস ও হযরত ছাফিয়াহ বিনতে হুইয়াই (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুন্না)।

এসময় একটি অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল যা বয়কট প্রত্যাহারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে কাফিরদেরকে বাধ্য করে। কাফিররা যখন বয়কট চালিয়ে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কা'বাহ্ ঘরে লটকে দেয়া বয়কটের সিদ্ধান্ত বিষয়ক দলীলটি তুলে নিতে চায়। কিন্তু সকলে সেখানে গিয়ে দেখে যে, একাত্র আল্লাহ্র নাম ছাড়া পুরো দলীলটিই উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এ থেকে তারা বুঝতে পারল যে, এ বয়কট আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দ নয়। তাই তারা সর্বসম্মতভাবে বয়কট তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কাফিররা বয়কট তুলে নিলে বানু হাশিম ও বানু আবদুল মুত্তলিব আবার মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু কাফিররা বয়কট তুলে নিলেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও মুসলমানদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন আগের মতই অব্যাহত রাখে। এ সত্ত্বেও তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে দ্বীনের প্রচার অব্যাহত রাখেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, অবশ্যই মিথ্যা বিদায় নেবে ও সত্য টিকে থাকবে। (সূরাহ্ বানি ইসরাঈল- ১৭ ঃ ৮৯) আল্লাহ্র দ্বীন অবশ্যই কুফরের ওপর বিজয়ী হবে।

ইসলামের জনপ্রিয়তা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দিনের পর দিন ইসলাম অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলাই ইসলামের শক্তি ও বিজয় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

## দুঃখকষ্টের বছর

সময় বয়ে চলল। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। তাঁর নবুওয়াতের দশবছর পূর্ণ হয়ে গেছে। ইসলামের দুশমনদের বিরোধিতা ও শত্রুতা সমানে অব্যাহত রয়েছে। এরই পাশাপাশি তাঁর জন্যে আরো দুঃখক অপেক্ষা করছিল।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আবু তালিব মারা গেলেন। আবু তালিবই সব সময় তাঁর ভাতিজা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলামে ঈমান আনেননি; এ অবস্থায়ই তিনি মারা যান।

আবু তালিবের মৃত্যুতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হৃদয়টা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর জন্যে আরো দুঃখ অপেক্ষা করছিল। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাহ (রাঃ)ও ইন্তেকাল করলেন।[২]

হযরত খাদীজাহ (রাঃ) শুধু যে, স্ত্রী হিসেবে তাঁর সেবাযত্ন করতেন তা-ই নয়, বরং বিপদাপদে ও দুর্দিনে তিনি তাঁর স্বামীর পাশে অটল পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

'উমার আয়াতগুলো পড়লেন, তিনি কুরআনের আয়াতের শব্দমালার সৌন্দর্য, ছন্দ, ঝংকার, বলিষ্ঠতা ও তাৎপর্যে মোহিত হয়ে গেলেন। তিনি সাথে সাথেই বললেন ঃ "আমাকে মুহাম্মাদের নিকট নিয়ে চল, আমি ইসলাম গ্রহণ করব।"

তখন হযরত খাব্বাব (রাঃ) লুকানো অবস্থা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং 'উমারকে হযরত আল-আরকাম আল-মাখযূমী (রাঃ)-এর বাড়ী দারুল আরকামে নিয়ে গেলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন।

হযরত আল-আরকাম আল-মাখ্যূমী (রাঃ)-এর বাড়ী ছিল ছাফা পাহাড়ের নিকটে এবং তৎকালে এ বাড়ীটি ছিল ইসলামের কেন্দ্র। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঘরের দরজায় এগিয়ে এসে 'উমারকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

'উমার বললেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে এসেছেন এবং কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এতে খুবই খুশী হলেন।

হযরত 'উমার (রাঃ) ছিলেন খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মনোবল খুবই বেড়ে যায়। এর আগে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচা হযরত হাম্যাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিও খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এ দুইজন সাহসী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের আন্দোলনের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

## বয়কট ও নির্বাসন

ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকায় কুরাইশরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বড় ধরনের আরেকটা আঘাত হানার ষড়যন্ত্র করে। তারা বানু হাশিম ও বানু আবদুল মুত্তালিবকে পুরোপুরি বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কাফিররা তাঁদেরকে শি'বি আবি তালিব নামে একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় নির্বাসিত করে।

তাঁদের এ বয়কট তিন বছর অব্যাহত থাকে। এ সময় বানু হাশিম ও বানু আবদুল মুত্তালিব-এর লোকেরা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হন। ঘটনাক্রমে স্বয়ং কুরাইশ গোত্রের লোকদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় তিন বছরের মাথায় এ বয়কট প্রত্যাহার করা হয়।

নির্বাসিত থাকাকালে বানু হাশিম ও বানু আবদুল মুত্তালিবের লোকেরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ঐক্যের পরিচয় দেন।

মি'রাজ বা উর্ধলোকে পরিভ্রমণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এক রাতে মক্কাহ নগরীর মস্‌জিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাক্‌দিসের মসজিদুল আকছায় নিয়ে যান; তাঁর এ সফরকে বলা হয় ইস্‌রা। এরপর সেখান থেকে তাঁকে উর্ধলোকে পরিভ্রমণ করানো হয়; এ সফরকে বলা হয় মি'রাজ।

প্রচলিত কথায় সাধারণতঃ তাঁর এ উভয় সফরকে একই সফরের দু'টি স্তর হিসেবে গণ্য করা হয় ও মি'রাজ বলা হয়। আরবী ভাষায় একে বলা হয় আল-ইসরা' ওয়াল মি'রাজ।

মি'রাজ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী সফরের দ্বারা আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। এ সফরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও কুদরত স্বচক্ষে দেখতে পান। এর ফলে তাঁর মনোবলও অনেক বেড়ে যায়– যার খুবই প্রয়োজন ছিল। ফলে আল্লাহ্‌র পথে লোকদেরকে ডাকার ক্ষেত্রে কোন দুঃখকই আর তাঁর জন্যে বাধা হয়ে থাকতে পারেনি।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) স্বয়ং তাঁর এ সফরের ও উর্ধলোক পরিভ্রমণের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ঐ রাতে জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন, তারপর একটি সাদা পশুতে চড়িয়ে বায়তুল মাক্‌দিসের মসজিদুল আক্‌ছায় নিয়ে যান। এ পশুটি ছিল বিরাট পাখাওয়ালা ঘোড়ার মত; এটির নাম ছিল বুরাক।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে বায়তুল মাক্‌দিসে নেয়ার পর হযরত আদম, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত হারূন ও হযরত 'ঈসা ('আলাইহিমুস সালাম) সহ সকল নবী-রাসূলের (আঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁর ইমামতীতে তাঁরা ছালাত আদায় করেন। এরপর তাঁকে আসমানের বিভিন্ন স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়।

মি'রাজেরর সফরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও মহিমা পর্যবেক্ষণ। তাঁর এ অভিজ্ঞতা ছিল এমনই ব্যতিক্রমধর্মী যা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি আরো অনেক কিছু দেখতে পান। তাঁর এ সফরের প্রতিটি বিষয় বুঝতে পারা আমাদের মত সাধারণ মানুষের ধারণক্ষমতার বাইরে। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্যে এসব জিনিসের গুরুত্ব বুঝতে পারা মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না। বস্তুতঃ সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে তাঁর ওপর যে বিরাট দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছিল তা যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে তাঁর জন্যে এ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মি'রাজ-এর সময় মুসলমানদের জন্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়।

মি'রাজ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর এ পুরো অলৌকিক সফরটাই খুব অল্প সময়ে রাতের একটি অংশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু বিস্ময়ের হলেও তা ছিল পুরোপুরি সত্য ও বাস্তব।

পরদিন সকাল বেলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন তাঁর মি'রাজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন তখন মক্কার কাফিররা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে এবং বলে যে, অবশ্যই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মুসলমানরা তাঁর কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু নতুন ইসলাম গ্রহণকারী কতক লোক এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করে এবং কাফিররা বরাবরের মতই সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঐ রাতে বায়তুল মাক্‌দিসে যেখানে যা দেখেছেন তার বর্ণনা দেন। তিনি এর আগে কখনোই বায়তুল মাক্‌দিসে যাননি। আগে বায়তুল মাক্‌দিসে গিয়েছে এমন লোকেরা তাঁর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে। তাছাড়া তিনি বায়তুল মাক্‌দিসে যাবার পথে একটি কাফেলাকে দেখতে পান এবং কোথায় তাদেরকে দেখেছেন তার বর্ণনা দেন। পরে কাফেলাটি ফিরে আসার পর তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মক্কাবাসীরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে আল-আমীন ও আছ্‌-ছাদিক খেতাব দিয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরাই তাঁর সাথে এহেন অদ্ভুত আচরণ করে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুওয়াত লাভ করার পর থেকে সব কিছুই আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী করেন। বস্তুতঃ সত্যকে বুঝা ও গ্রহণ করা খুব সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা অত সহজ নয়। মানুষের জীবনের হেদায়াত (পথনির্দেশ) কেবল আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আসে। তিনি যাকে চান হেদায়াত করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন না বা গোমরাহ করে দেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন মি'রাজের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই তাঁর পুরো বর্ণনাই বিশ্বাস করেন। এ কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে 'আছ্‌-ছিদ্দিক' (সত্যকে প্রত্যয়নকারী) বলে অভিহিত করেন।

## আল-'আকাবাহ্‌র প্রথম অঙ্গীকার

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কতকক মক্কায় ইসলাম প্রচারের শেষের দিকে ৬২১ খৃস্টাব্দে ইয়াছ্‌রীব থেকে– বর্তমানে যার নাম মদীনা– একদল লোক হাজ্জের সময় মক্কায় এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত

দেন। তাঁরা তাঁর ডাকে সাড়া দেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলো ছয়জন। তাঁরা ঈমানদার হিসেবে মদীনায় ফিরে যান এবং তাঁদের গোত্রের অন্যান্য লোকদেরকেও ইসলাম গ্রহণের জন্যে দাওয়াত দেন।

পরের বছর হাজ্জের সময় মদীনা থেকে বারজন লোকের একটি দল মক্কায় আসেন। তাঁরা আল্-'আকাবাহ নামক স্থানে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং একটি অঙ্গীকার করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ অঙ্গীকার আল্-'আকাবাহর প্রথম অঙ্গীকার নামে পরিচিত। তাঁরা এ মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, তাঁরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবেন না, চুরি করবেন না, ব্যাভিচার করবেন না, শিশুহত্যা করবেন না, কোন পাপ কাজ করবেন না এবং আল্লাহ্কে অমান্য করবেন না। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁদেরকে বলেন যে, তাঁরা যদি এ অঙ্গীকার পালন করেন তাহলে আল্লাহ্ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন এবং আখিরাতে তাঁদেরকে পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত প্রদান করবেন।

## আল্-'আকাবাহর দ্বিতীয় অঙ্গীকার

একই স্থানে অর্থাৎ আল্-'আকাবায় ৬২২ খৃস্টাব্দে মদীনার মুসলমানরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে দ্বিতীয় বার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন। এতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। কার্যতঃ এটি ছিল আল্-'আকাবাহর প্রথম অঙ্গীকারের নবায়ন ও সম্প্রসারণ। মদীনার মুসলমানরা অঙ্গীকার করেন যে, তাঁরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের যেভাবে রক্ষা করবেন ঠিক সেভাবেই তাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সাহায্য ও রক্ষা করবেন।

এ অঙ্গীকারের পরিণতিতে যেসব বিপদজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচা হযরত 'আব্বাস (রাঃ) তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও মদীনার মুসলমানরা বললেন ঃ "জীবন ও ধন-সম্পদের ওপর যে কোন ধরনের হুমকি আসার সম্ভাবনা জেনেও আমরা তাঁকে (রাসূলকে) গ্রহণ করেছি। হে রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে বলুন, আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করলে বিনিময়ে কি পুরষ্কার পাব?"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ "জান্নাত"।

তাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তিনিও তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। এভাবে মদীনার মুসলমানরা মক্কাবাসীদের হামলা থেকে তাঁকে হেফাযত করাকে নিজেদের জন্যে কর্তব্যে পরিণত করে নিলেন।

## মদীনায় হিজরত

আল্-'আকাবাহ্র দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিমূহূর্ত। কারণ এসময় থেকে মুসলমানদের জন্য আশ্রয় নেয়ার মত একটি জায়গা হল। যুদ্ধ ও বিপদাপদের সময় সাহায্যের জন্য তাঁরা একটি মিত্রপক্ষ পেলেন।

আল্-'আকাবাহ্র দ্বিতীয় অঙ্গীকার অনুষ্ঠিত হবার পর ঘটনাক্রমে কাফিররা তা জানতে পারে। অত্যন্ত গোপনে এ অঙ্গীকার অনুষ্ঠিত হয়। ফলে কাফিরদের পক্ষে তা নস্যাত করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু পরে যখন তারা তা জানতে পারে তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মদীনার কিছু লোকের ওপর নির্যাতন চালায়।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবার তাঁর কাজের কৌশল পরিবর্তন করলেন। দীর্ঘ তের বছর যাবত তিনি মক্কার লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু এজন্য মক্কাহ্ যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল না। অন্যদিকে মদীনা তাঁর সামনে দ্বীন প্রচারের জন্যে একটি উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থিত হয় যা ইসলাম গ্রহণের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত। তাই তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করার ও সেখানে ইসলামের বীজ বপনের সিদ্ধান্ত নেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত শুরু করার এবং সেখানকার মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক মুযবূত করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে নির্দেশ পাবার পর মক্কার মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে ও ছোট ছোট দলে মদীনায় হিজরত শুরু করেন। পরবর্তীকালে মক্কাহ থেকে আগত মুসলমানরা 'মুহাজির' নামে এবং তাঁদেরকে আশ্রয়দানকারী মদীনার মুসলমানরা 'আনছার' নামে পরিচিত হন।

মক্কার কাফিররা মুসলমানদের মদীনায় হিজরত বন্ধ করাবার জন্যে চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। একারণে তারা আরো বেশী ক্ষিপ্ত ও হিংস্র হয়ে ওঠে।

হিজরতের বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখ। মক্কার মুসলমানরা আল্লাহ্র জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁদের বাড়ীঘর ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান। বস্তুতঃ তখন তাঁদের জন্যে এটাই করণীয় ছিল। মুসলমান হিসেবে আমাদেরকেও ঈমানের খাতিরে প্রয়োজনে হলে এরূপ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা যদি এ ধরনের মনোভাব ও চেতনার অধিকারী হতে পারি কেবল তখনই এ পৃথিবীর জীবন অর্থবহ হয়ে উঠবে। কেবল তখনই আমাদের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত বান্দাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে।

## হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হিজরত

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ছাহাবীদের (সঙ্গীসাথীদের) বেশীর ভাগই মদীনায় হিজরত করলেন। তিনি নিজে হিজরত করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন।

তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করতে চাচ্ছিলেন এবং এজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ "এজন্য তাড়াহুড়ো করবেন না; হয়ত আল্লাহ্ আপনার জন্যে কোন সাথী নির্ধারণ করে দেবেন।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) আশা করতে লাগলেন যে, হয়ত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেই তাঁর সাথী হবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে হিজরতের অনুমতি দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সাথী মনোনীত হলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এতে খুবই খুশী হলেন। তিনি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের আগেই মক্কার কাফিররা তাঁকে হত্যার জন্যে ষড়যন্ত্র করে। ঠিক এ সময়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়। তিনি রাতের বেলা গোপনে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশে মক্কাহ্ ত্যাগ করেন। এটা ছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

এদিকে কাফিররা ঐ দিনই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তারা এজন্য একটি বিশেষ ঘাতকদল তৈরী করে। ঘাতকদল ঐদিন রাতেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)এর বাড়ী ঘেরাও করে রাখে এবং তিনি ঘর থেকে বের হলে সাথে সাথে তাঁকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

এদিকে হযরত 'আলী (রাঃ) তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঘরে ছিলেন এবং তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকেন। আর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নীরবে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যান, কিন্তু তাঁর ঘর ঘিরে রাখা সত্ত্বেও কাফিররা তাঁকে দেখতে পায়নি। এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলারই পরিকল্পনা। আর আল্লাহ্ যখন কোন কিছু করতে চান তখন তিনি শুধু বলেন ঃ "হও।" আর "অমনি তা হয়ে যায়।" (সূরাহ ইয়া-সীন– ৩৬ ঃ ৮২)

সকাল বেলা কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিবর্তে হযরত 'আলী (রাঃ)কে তাঁর বিছানায় দেখতে পায়। এতে তারা হতভম্ব হয়ে যায়।

আছ-ছাওর গুহা

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ) সকাল হবার আগে মক্কাহ ত্যাগ করেন এবং মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত ছাওর নামক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা তিন দিন সেখানে থাকেন এবং হযরত আবু বকরের (রাঃ) একজন গোলাম প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদেরকে খাবার পৌঁছে দিতেন। তাঁরা তৃতীয় দিনে ছাওর গুহা থেকে বের হয়ে মদীনায় রওয়ানা হয়ে যান।

কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে হত্যার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে বোকা বানিয়ে মক্কাহ ত্যাগ করায় তারা তাঁকে খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মক্কাহ থেকে মদীনার পুরো পথে তাঁকে অনুসরণের ব্যবস্থা করে এবং তাঁকে বন্দী করার জন্যে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করে।

যেসব কাফির হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সন্ধানে বের হয় তাদের মধ্যে একজন ছিল সুরাকাহ্ বিন মালিক। সুরাকাহ্ দ্রুতগামী ঘোড়া ছুটিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছে এবং মনে হচ্ছিল যে, তাঁকে ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার ঘোড়া পর পর তিনবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তাই সে একে অশুভ লক্ষণ হিসেবে মনে করে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে বন্দী করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। পরবর্তী সময়ে সুরাকাহ্ ইসলাম গ্রহণ করে।

অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও কষ্টকর সফরের পর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ)সহ মদীনার নিকটে কুবা' নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন। সেখানে তাঁরা দুই সপ্তাহ থাকেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করেন। ইতিমধ্যে হযরত 'আলী (রাঃ) এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এরপর মদীনায় এলেন। এখানে তিনি তাঁর উটকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলেন যাতে তাঁকে নিয়ে যেখানে খুশী থামতে পারে। উটটি প্রথমে দুইজন ইয়াতীমের মালিকানাধীন একটি জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে, তারপর উঠে গিয়ে হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে পৌছে পুনরায় হাঁটু গেড়ে বসে। তখন এ বাড়ীই মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রথম থাকার জায়গা হিসেবে নির্ধারিত হল।

মদীনার জনগণ অত্যন্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহকারে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই তারা তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে খুবই আবেগদীপ্ত ও আনন্দে উৎফুল্ল হল। তাঁকে তারা বীরোচিতভাবে অভ্যর্থনা জানাল।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরতের মধ্য দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এই ঐতিহাসিক হিজরতের দু'টি পরস্পরবিরোধী দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করে আসার বেদনাদায়ক অনুভূতি, আরেকটি দিক হচ্ছে আগের চেয়ে বেশী স্বাধীনভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারের আশাসহ নিরাপত্তার অনুভূতি।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মক্কাহ হতে মদীনায় হিজরতের বছর থেকে ইসলামী সাল বা হিজরী সাল শুরু হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতে অভিষেকের পর ত্রয়োদশ বছরে অর্থাৎ ৬২২ খৃস্টাব্দে হিজরত সংঘটিত হয়। এ কারণে ঐ বছর থেকেই ইসলামী সাল বা হিজরী সাল গণনা করা হয়।

হিজরতের ফলে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি নতুন ভূমিকা শুরু হয়। তা হচ্ছে রাষ্ট্রনায়ক ও শাসকের ভূমিকা। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। হিজরতের মধ্য দিয়ে তাঁর মক্কী জীবন সমাপ্ত হয় যার মধ্যে তের বছর ছিল নবুওয়াতী জীবন।

## মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মদীনায় আগমন ছিল সেখানকার জনগণের জন্যে সবচেয়ে বড় স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) তাদের মধ্যে আসায় ও অবস্থান করায় তাদের মধ্যে আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ বয়ে যায়।

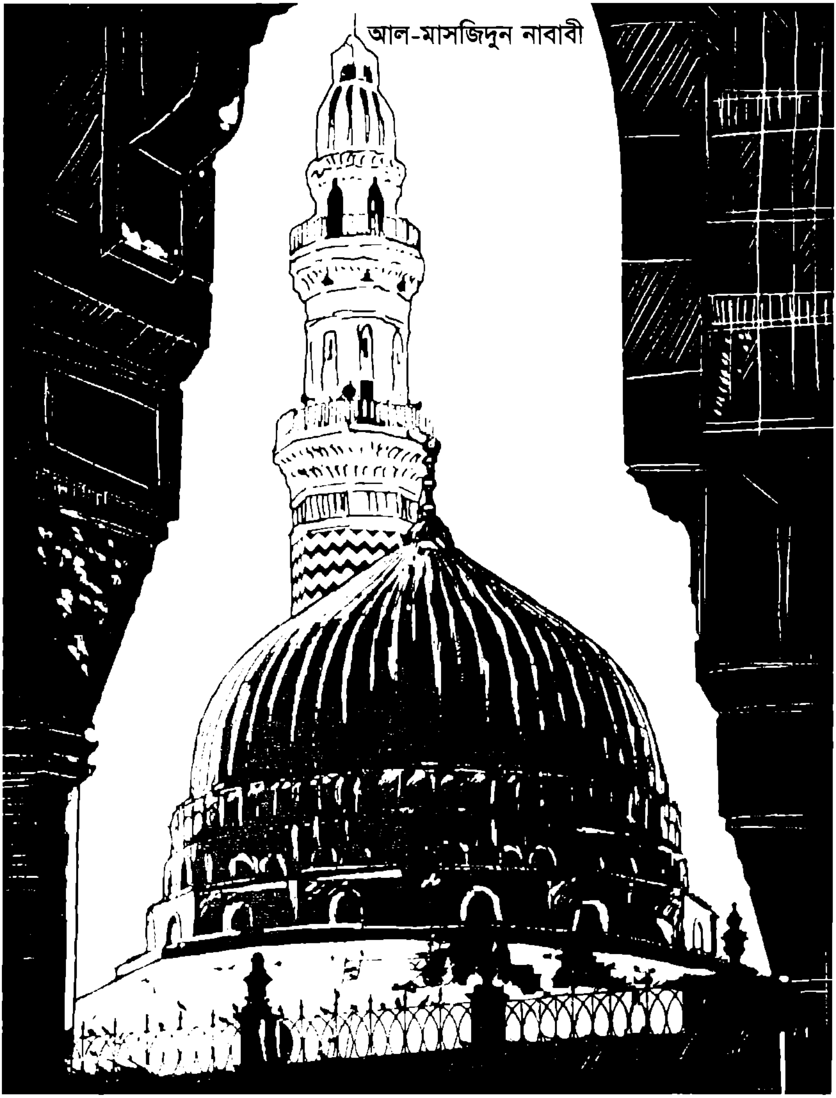


মদীনার অবস্থান মক্কাহ থেকে উত্তর দিকে। সড়কপথে দুই শহরের মধ্যে দুরত্ব ৪৪৭ কিলোমিটার আর বিমানযোগে ৩০০ কিলোমিটার। সে যুগে শহরটির নাম ছিল ইয়াছরিব। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমন ও অবস্থানের কারণে ধীরে ধীরে শহরটি 'মাদীনাতুন্নাবী' বা 'নবীর শহর' হিসেবে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে সংক্ষেপে শুধু

'মাদীনাহ্' বলতেই ' মাদীনাতুন্নাবী' বুঝায় এবং শেষ পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় 'মদীনা' (মাদীনা- مدينة )হিসেবে বিখ্যাত হয়।

মক্কার মুহাজিরদের আগমনের ফলে মদীনার জনজীবনের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখন সেখানে তিনটি জনগোষ্ঠী হল– দু'টি মুসলিম জনগোষ্ঠী ও একটি অমুসলিম জনগোষ্ঠী। একটি ছিল মক্কাহ থেকে আগত মুহাজিরীন (মুহাজির জনগোষ্ঠী), একটি ছিল আউস ও খায্‌রাজ গোত্রভুক্ত আনছার জনগোষ্ঠী, আরেকটি ছিল কাইনুকা, নাযির ও কুরাইযাহ্ গোত্রভুক্ত ইয়াহূদী জনগোষ্ঠী। স্থানীয় আনছাররাই মুহাজিরদের আশ্রয় দেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনায় এসে পৌঁছার পূর্বেই তাঁর কতক ছাহাবী সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা আনছারদের সাথে তাঁদের মেহমান হিসেবে বসবাস করছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের ফলে পরিস্থিতি অধিকতর নিশ্চিতরূপ ধারণ করে। ইতিমধ্যে মক্কাহ্ থেকে অন্যান্য মুসলমানরাও চলে আসতে থাকেন।

মুহাজিরগণ প্রায় খালি হাতে মক্কাহ ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন। তাঁদের সাথে কোন ধনসম্পদ ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বপ্রথম যে কাজটি করা প্রয়োজন মনে করলেন তা হচ্ছে আনছার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তিনি আনছার ও মুহাজিরীনদের একটি সভা ডাকলেন। এ সভায় তিনি আনছারদের প্রত্যেককে একজন করে মুহাজিরকে ঈমানী ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁদের ধনসম্পদ ও বাড়ীঘর মুহাজিরদের সাথে ভাগ করে নেয়ার জন্যে উপদেশ দিলেন। আনছাররা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আহ্বানে পুরোপুরি সাড়া দিলেন।

বস্তুতঃ এটা ছিল মানবজাতির ইতহিাসের এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। ইসলাম যে আনছারদের চিন্তাচেতনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল এ ঘটনা থেকে তা বুঝা যেতে পারে। তাঁদের নিকট পরকালীন পুরস্কারের মোকাবিলায় দুনিয়ার ধনসম্পদ খুবই গুরুত্বহীন বলে মনে হয়েছিল। তাই আনছাররা তাঁদের সকল ধনসম্পদ তাঁদের ঈমানী ভাই মুহাজিরদের সাথে প্রায় সমানভাবে ভাগ করে নেন। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা ইসলামের ইতিহাসের এক সর্বজনস্বীকৃত ঘটনা।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনার নেতায় পরিণত হলেন। তিনি আনছার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরীর মাধ্যমে কার্যতঃ ইসলামী সমাজের উদ্বোধন করেন। এভাবে মদীনা ইসলামী সমাজ ও প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হল।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। প্রত্যেক নাগরিকই সকল অধিকার ভোগ করত। কারণ ইসলাম তাক্ওয়া (আল্লাহ্কে ভয় করে চলা) ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে কারো ওপরে কারো মর্যাদা স্বীকার করে না। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন

মজীদে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

-"নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সে-ই সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী যে সবচেয়ে বেশী তাক্ওয়ার অধিকারী।" (সূরাহ্ আল্-হুজুরাত্-৪৯ ঃ ১৩)

তাই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে বর্ণ, গোত্র বা শ্রেণীর ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্য ছিল না।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করার পর সেখানে আভ্যন্তরীন শান্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেন। তিনি ইয়াহূদী ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মদীনার সকল অধিবাসী যাতে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি সেখানে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ইয়াহূদীরা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করেনি; পরবর্তীকালে তারা চুক্তির শর্তবালী ভঙ্গ করে তার বিপরীত কাজ করে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনায় এসে পৌঁছার পর তাঁর উট প্রথমে দু'জন ইয়াতীমের জায়গায় বসেছিল এবং তার পর পরই উঠে গিয়ে হযর আবু আইয়ূব আন্ছারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে বসে। তিনি উক্ত ছাহাবীর বাড়ীতে বাস করতে থাকেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উক্ত দুই ইয়াতীমের জায়গাকেই মসজিদ তৈরীর জন্য বেছে নেন। এই দুই ইয়াতীমের নাম ছিল সুহাইল ও সাহ্ল। তিনি তাদের কাছ থেকে জায়গাটি কিনে নেন। সেখানে মসজিদ তৈরী করা হয় এবং তার পাশেই তাঁর বসবাসের জন্য ঘর তৈরী করা হয়।

মসজিদ তৈরীর কাজে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজেও অংশ নেন এবং একজন সাধারণ শ্রমিকের মত কাজ করেন। প্রকৃত পক্ষে সেখানে তাঁকে অন্য শ্রমিকদের থেকে আলাদা করে চেনার কোন উপায় ছিল না।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কখনোই কোন সাধারণ কাজ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন

না। তিনি নিজের হাতে নিজের কাপড়-চোপড় সেলাই করতেন, নিজের জুতা মেরামত করতেন, বাজার করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন। এক্ষেত্রে তিনি আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

## আযান প্রবর্তন

ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মি'রাজের [illegible] সময় মুসলমানদের জন্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। মদীনায় মুসলমানরা একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংঘবদ্ধ জনসমষ্টিতে পরিণত হন। তাই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এখানে জামা'আতে (একত্রিত হয়ে) ছালাত আদায়ের জন্যে মুসলমানদের ডাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করলেন।

এসময় সাধারণতঃ ছালাতের ওয়াক্ত হলে মুসলামনরা পরস্পরকে ডেকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এতে অনেক সময় অসুবিধা হত। তাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন ছাহাবী বিভিন্ন পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে হযরত 'আবদুল্লাহ বিন যায়েদ বিন ছা'লাবাহ্ (রাঃ) ছালাতের জন্যে ডাকার ব্যাপারে একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট স্বপ্নটি বললেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা শুনে বললেন যে, এ স্বপ্ন একটি সত্য স্বপ্ন এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে।

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবিসিনীয় বংশোদ্ভুত মুসলমান হযরত বিলাল (রাঃ)কে ডাকলেন। হযরত বিলাল (রাঃ)-এর কণ্ঠ ছিল খুবই সুন্দর ও গুরুগম্ভীর এবং তিনি উচ্চৈস্বরে ডাক দিলে তা খুবই দূর থেকে শোনা যেত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ)কে হযরত 'আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর স্বপ্নে শোনা কথাগুলো উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে মুসলমানদেরকে ছালাতের জন্যে ডাকতে বললেন। এ কথাগুলো ছিল ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

"আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।" (৪বার)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। (২বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। (২বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

ছালাতের দিকে ছুটে এসো। (২বার)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

সাফল্যের দিকে ছুটে এসো। (২বার)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ (২বার)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। (১বার)

হযরত বিলাল (রাঃ) কথাগুলো উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করলেন। এ ঘোষণা শুনে হযরত 'উমার (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট ছুটে এলেন এবং বললেন যে, তিনিও একই স্বপ্ন দেখেছেন।

একেই বলা হয় 'আযান' অর্থাৎ ছালাতের জন্যে ঘোষণা এবং যিনি এ ঘোষণা দেন তাঁকে বলা হয় মুআয্যিন। এভাবে হযরত বিলাল বিন রাবাহ্ (রাঃ) হলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুআয্যিন।

চমৎকার ও আকর্ষণীয় হৃদয়গ্রাহী আবেদনসহ এ আযান প্রচলিত হল এবং এর ফলে প্রতিদিন পাঁচবার মদীনায় আল্লাহ্র মহিমা ঘোষিত হতে লাগল। আযানের এ ব্যবস্থা এখনো বিশ্বের সকল মুসলিম-প্রধান দেশে প্রচলিত আছে। আযানে ব্যবহৃত কথাগুলোর ছন্দ ও ঝঙ্কার বিস্ময়কর ও খুবই উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী।

## মুসলমানদের জন্যে আরো করণীয় নির্ধারণ

আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর একক ও গতিশীল নেতৃত্বে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ক্রমেই শক্তিশালী হতে লাগল। মদীনার ইসলামী সমাজের অধিকতর উন্নতি-অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের (সাঃ) পক্ষ থেকে আরো হেদায়াত ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। কারণ যদিও সমাজটি তখনো তার শৈশবকাল অতিক্রম করছিল, তথাপি তাকে গোটা মানবজাতির ইতিহাসে এক বিরাট ও স্থায়ী অবদান রাখতে হবে বলেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে এ সমাজের হেদায়াত ও প্রশিক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নাযিল করা হয়।

হিজরতের পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে এ প্রশিক্ষণ র্কসূচী নাযিল হয়। এ র্কসূচীর মধ্যে রয়েছে ছাওম ও যাকাতকে ফরয করা এবং মদ ও সূদকে হারাম করা। এ সময়ই ইয়াতীম, উত্তরাধিকার, বিবাহ্ ও বিবাহিতা নারীদের অধিকার সম্পর্কে আইন-কানুন নাযিল হয়।

এছাড়া হিজরত-পরবর্তী দ্বিতীয় বছরের শা'বান মাসে বায়তুল মাক্দিসের মসজিদুল আক্ছার পরিবর্তে মক্কাহ নগরীর কা'বাহ্কে কিবলাহ্ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। (সূরাহ্ আল্-বাকারাহ্–২ ঃ ১৪৪)

## কঠিন দায়িত্ব

মদীনার ইসলামী সমাজ ক্রমেই বিকাশ লাভ করছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে এ সমাজকে শক্তিশালী, সুসংহত ও গতিশীল করার কাজ অব্যাহত থাকে। এ সময় তাঁকে কার্যতঃ চারটি ক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে হয়। তা হচ্ছে ঃ

১। ইসলামী সমাজের সকল পর্যায়ে সুসঙ্গতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

২। মুনাফিকদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা।

৩। মক্কার কুরাইশদের থেকে সৃষ্ট বিপদ হতে সতর্ক থাকা এবং

৪। মদীনার ইয়াহূদীদের অশুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কত চমৎকার-ভাবে এসব বিপদ মোকাবিলা করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে ক্রমেই অধিকতর সাফল্যের দিকে ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বের অন্য সকল জীবন-ব্যবস্থার ওপর ইসলামের বিজয়ের দিকে এগিয়ে নেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দায়িত্ব ছিল মানবরচিত জীবনব্যবস্থাসমূহের ওপর আল্লাহ্র দ্বীনকে (আল্লাহ্র দেয়া জীবনব্যবস্থাকে) বিজয়ী ও প্রাধান্যের অধিকারী করে দেয়া। (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্– ৯ ঃ ৩৩, সূরাহ আল্-ফাৎহ্– ৪৮ ঃ ২৮, সূরাহ আছ্-ছাফ–৬১ ঃ ৯)

## বদর যুদ্ধ

আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও ব্যতিক্রমধর্মী বাস্তবদর্শী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এভাবেই তৈরী করেন। তিনি মদীনার ভিতরের ও বাইরের উভয় ধরনের বিপদ মোকাবিলা করার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তখনকার ক্ষুদ্র মুসলিম জনসমষ্টির অস্তিত্বের প্রতি যে কোন হুমকি মোকাবিলা করাই

তখনকার জন্যে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল। এ লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে একটি সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে তিনি বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখান নি।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জনশক্তি ও পার্থিব উপায়-উপকরণ ছিল খুবই কম। মক্কাহ থেকে আগত মুহাজিরদের আশ্রয় দেয়ার কারণে মদীনার অর্থনীতি ছিল খুবই চাপের মধ্যে। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, সঠিক সময়ে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে। অতএব, মুসলমানদের জন্যে বস্তুগত উপায়-উপকরণের তুলনায় ঈমানী শক্তিই বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। ঈমানী শক্তি ও তদনুযায়ী আমল ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এদিকে মদীনায় মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে আছে দেখে মক্কার কাফিররা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে নিশ্চহ্ন করার জন্যে ইতিপূর্বে তারা যত চেষ্টা চালিয়েছিল তার সবই ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে তারা যে পথ দিয়ে আশ্-শামে যাতায়াত করত তা মদীনার পাশ দিয়েই চলে গিয়েছিল এবং একারণে মুসলমানদের পক্ষে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো সহজ ছিল। ফলে তারা খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদের মনেই ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে নিশ্চিহ্ন বা দমন করার কোন পথ তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই তারা এ নতুন ইসলামী সমাজের হাত থেকে চিরতরে রেহাই পাবার লক্ষ্যে এর ওপর হামলা চালানোর জন্যে মরিয়া হয়ে ছুতা খুঁজছিল। খুব শীঘ্রই এ ধরনের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হল।

আশ্-শাম থেকে মক্কার কাফিরদের একটি কাফেলা পণ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রবাহী প্রায় এক হাজার উটসহ মক্কার পথে আসছিল। এ কাফেলার নেতৃত্ব দিচ্ছিল মক্কার কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান ভয় করতে লাগল যে, মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। তাই সে আর কালবিলম্ব না করে এ মর্মে মক্কায় বাণী পাঠিয়ে দিল। আবু সুফিয়ানের বাণী পেয়ে সাথে সাথেই মক্কার কাফিরদের একহাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদীনায় মুসলমানদের ওপর হামলা চালাতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

মক্কার কাফির বাহিনীর মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে এ খবর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছল। তখন তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যে মদীনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ কাফিরদের হামলাকে বিনা প্রতিরোধে চলতে দেয়া কিছুতেই ঠিক নয়।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তিন শ' তের জন সৈন্যের এক বাহিনী তৈরী করলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন নিতান্তই কিশোর বয়সী সৈন্য। মুসলিম সৈন্যদের তেমন কোন

অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এ ক্ষুদ্র বাহিনী আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) সেনাপতিত্বে মদীনা থেকে রওয়ানা হল এবং ১২৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বদর নামক স্থানে উপস্থিত হল।

মুসলিম বাহিনীর শুধু সৈন্যসংখ্যাই কম ছিল না, বরং তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল খুবই কম। আর তৎকালে যুদ্ধের জন্যে অপরিহার্য বাহন ঘোড়া ছিল মাত্র কয়েকটি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান। কারণ তাঁরা জানতেন যে, তাঁরা ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে এসেছেন।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ানের কাফেলা তাদের চলার পথ পরিবর্তন করে অন্যপথে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মক্কার কাফির বাহিনী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন না করে ফিরে যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল। ফলে বদরে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এটা ছিল ৬২৪ খৃস্টাব্দের ১৭ই রামাদান।

মুসলমানরা অতুলনীয় সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে মক্কার কাফির বাহিনীর হামলার জবাব দিলেন। তাঁরা কাফির বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। কাফির বাহিনীর সত্তর জন নিহত হয় এবং আরো সত্তর জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়।

বদরের যুদ্ধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, প্রকৃত শক্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌তে ঈমানের শক্তি, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা নয়। এ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্যে ইতিহাসের ভবিষ্যত গতিধারা নির্ণয় করে দিল।

সেদিনের যুদ্ধে পার্থিব উপায়-উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও সত্যের সৈনিকরা বিজয়ী হলেন এবং মিথ্যার বাহিনী অপমানিত - অপদস্থ ও পরাজিত হল। কুর'আন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ -"সত্য এসেছে ও মিথ্যা বিতাড়িত হয়েছে"। (সূরাহ বানি ইসরাঈল- ১৭ ঃ ৮১) আর প্রকৃতই বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। (সূরাহ আল্-আন্ফাল- ৮ ঃ ১৭) অবশ্য হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি আল্লাহ্ তা'আলার ওপর নির্ভর করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিল।

বদরের যুদ্ধে এক একজন মুসলিম সৈন্যকে গড়ে তিনজন কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হয়। কারণ কাফির বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার তিন গুণেরও বেশী। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা জয়লাভ করেন। আর এ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হলে তাঁদের জন্যে তার পরিণাম হত খুবই ভয়বহ।

যা-ই হোক, মক্কার কাফির বাহিনী পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে চরম আক্রোশ নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়। অতএব, খুব শীঘ্রই আরেকটি যুদ্ধ সংঘটিত হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

## উহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফিররা মুসলমানদের হাতে যে বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তাদের পক্ষে তা ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এ কারণে তখন থেকে এক বছর যাবত তারা পুনরায় মদীনা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে বদরের যুদ্ধের এক বছর পর ৬২৫ খৃস্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে অর্জিত তাঁদের বিজয় ও সাফল্যকে সুসংহত করছিলেন এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ বন্ধনকে শক্তিশালী করছিলেন। এ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশে দূত ও প্রতিনিধিদল পাঠান।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এক চাচা হযরত 'আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেও তখনো মক্কায় বসবাস করছিলেন। তিনি তাঁর ভাতিজা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও মুসলমানদের জন্যে অন্তরে খুবই মহব্বত পোষণ করতেন। তিনি মক্কায় কাফিরদের যুদ্ধপ্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি এ যুদ্ধপ্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণসহ মদীনায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে দেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতে পারলেন যে, দু'শ' জন অশ্বারোহীসহ মক্কার কাফিরদের তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন তিনি মদীনার প্রবীণ ব্যক্তিদের ডেকে তাঁদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন।

আনছার ও মুহাজিরীন নির্বিশেষে মদীনার প্রবীণ ব্যক্তিগণ মদীনার ভিতরে থেকে প্রতিরক্ষাযুদ্ধ চালানোর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু যাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম সেই যুব শ্রেণী ভিন্ন মত ব্যক্ত করলেন। শক্তি ও সাহসিকতায় উদ্দীপ্ত যুবকরা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিলেন। তাঁরা এ যুদ্ধকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য শহীদ হবার একটা সুযোগ হিসেবে গণ্য করলেন। অন্যদিকে যে সব প্রবীণ ছাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি তাঁরাও মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু খায্‌রাজ গোত্রের নেতা 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার বিরোধিতা করে।

যা-ই হোক, বেশীর ভাগ মুসলমান মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দেয়ায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতেই সায় দেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমু'আহর ছালাত আদায়ের পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার বাইরে উহুদ পাহাড়ের উদ্দেশে রওয়ানা হন। কিন্তু মুসলিম বাহিনী মদীনা ও উহুদের মাঝামাঝি আশ্-শাওয়ী নামক স্থানে পৌঁছলে 'আবদুল্লাহ বিন উবাই তার নেতৃত্বাধীন তিনশ' সৈন্য নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে। এভাবেই সে মুনাফিকদের নেতায় পরিণত হয়। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে মাত্র সাতশ' সৈন্য নিয়ে উহুদে পৌঁছতে ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।

মক্কার কুরাইশ বাহিনী ইতিমধ্যেই উহুদে পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উহুদে পৌঁছেন এবং ফজরের ছালাত আদায় করেন, এরপর সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত ও মোতায়েন করেন। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের (রাঃ) সেনাপতিত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দায সৈন্যকে একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ রক্ষার কাজে মোতায়েন করেন। তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন কোন অবস্থায়ই ঐ জায়গা ছেড়ে না যান।

সকাল বেলা দুই সেনাবাহিনী পরস্পর মোকাবিলা করে। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। খুব শীঘ্রই মুসলমানরা রণাঙ্গণে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কাফির বাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। মুসলমানরা মক্কার কাফির বাহিনীর ফেলে যাওয়া খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য মালামাল হস্তগত করে।

প্রকৃত পক্ষে তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি। কিন্তু হযরত 'আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও গিরিপথে মোতায়েন তাঁর নেতৃত্বাধীন তীরন্দায সৈন্যদের প্রায় সকলেই তাঁদের অবস্থান পরিত্যাগ করে রণাঙ্গণে কাফির সৈন্যদের ফেলে যাওয়া মালামাল জমা করার কাজে লেগে যান। এই বিশৃঙ্খলা মক্কার কুরাইশ বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি খালিদ বিন আল ওয়ালিদের জন্যে একটি বিরল সুযোগ সৃষ্টি করে। তিনি পিছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালান। হযরত 'আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) ও আরো ছয় জন তীরন্দায- যারা গিরিপথ ছেড়ে যাননি- অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলেই শহীদ হন।

খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে জন্য মুসলিম সৈন্যরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই

মুসলমানদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়ে যায়। তাঁরা নিজেদেরকে শত্রুসৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় দেখতে পান। ঐ অবস্থায়ই দুই পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ চলতে থাকে। এ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচা হযরত হাম্‌যাহ (রাঃ) শহীদ হন। এছাড়া আরো অনেক মুসলমান শহীদ এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে আহত হন।

ইতিমধ্যে এ মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ হয়েছেন। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং অনেকে পালিয়ে যেতে থাকেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কয়েকজন ছাহাবী তাঁকে পাহাড়ের ওপরে একটি জায়গায় নিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি উচ্চৈস্বরে মুসলমানদের আহ্বান করেন এবং তাঁদেরকে পুনরায় সংঘবদ্ধ হবার নির্দেশ দেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবিত আছেন দেখতে পেয়ে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ও পর্যুদস্ত মুসলমানরা খুব শীঘ্রই নতুন করে সংঘবদ্ধ হন।

এ যুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধের জন্যে সভ্যজগতে প্রচলিত নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে। তারা মুসলমানদের মৃতদেহ বিকৃত করে। বিশেষ করে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ চরম পৈশাচিকতার আশ্রয় নেয়। সে হযরত হাম্‌যাহ (রাঃ)-এর কালিজা বের করে চিবায়।

দিনের শেষে পুনরায় সংঘবদ্ধ মুসলিম বাহিনী পাল্টা হামলার জন্যে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মক্কার কাফির বাহিনী ইতিমধ্যেই বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পেরে আত্মতৃপ্তি লাভ করে রণাঙ্গণ ছেড়ে চলে যায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু মক্কার কাফিররা যাতে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করতে না আসে তা নিশ্চিত করার জন্যে তিনি তাদের পিছনে একটি সৈন্যদল পাঠান। আবু সুফিয়ান তাদের পিছনে মুসলমান সৈন্যদের আসার কথা শুনে মক্কার দিকে অগ্রসর হবার গতি বাড়িয়ে দেয়।

উহুদ যুদ্ধের সামগ্রিক ফলাফল ছিল উভয় পক্ষের জন্যে সমান সমান। কারণ কোন পক্ষই জয়লাভের দাবী করতে পারত না। তবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের খুবই চড়া মূল্য দিয়ে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। গনিমতের মালের লোভে গিরিপথে নিয়োজিত তীরন্দাযরা তাঁদেরকে দেয়া নির্দেশ অমান্য করায় ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় মুসলমানদেরকে এ যুদ্ধে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, অথচ মুসলমানরা চূড়ান্ত বিজয়ের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছিল। পার্থিব সম্পদের মহব্বতের জন্যে কতই না চড়া মূল্য দিতে হয়! এই দুনিয়ার মহব্বতে কিছুতেই আমাদের মুক্তি ও পরকালীন পুরস্কারের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।

বস্তুতঃ যে কোন রণাঙ্গণে শৃঙ্খলা ও সেনাপতির আনুগত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত 'আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের অধীনস্থ পঞ্চাশ জন তীরন্দায যদি তাঁর আদেশ অমান্য না করতেন তাহলে উহুদ যুদ্ধের ফলাফল অন্য রক হত।

## আহ্যাব যুদ্ধ বা খন্দক যুদ্ধ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন ছিল খুবই ব্যস্ত জীবন। বিশেষ করে মদীনায় নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে কদাচিত তাঁর এমন দিন কেটেছে যেদিন তাঁকে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় নি। ছোটখাট সংঘর্ষ, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, চুক্তিলঙ্ঘন ইত্যাদি ছিল ব্যাপকাকার। তেমনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে উত্যক্তকরণ ও বিদ্রুপ-কটাক্ষকরণ ছিল প্রতিদিনকার ব্যাপার। এসব কিছুই হচ্ছিল মদীনার ইয়াহূদী ও মক্কার কাফিরদের যোগসাজসে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরস্পর হাত মিলিয়েছিল।

ইয়াহূদী গোত্র বানূ নাযীর চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে হত্যার জন্যে ষড়যন্ত্র করে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে। তাদেরকে যুদ্ধ অথবা মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়া– এই দু'টি পন্থার যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়। প্রথমে তারা স্বেচ্ছায় মদীনা ছেড়ে চলে যেতে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বহিষ্কার করা হয়। তখন তারা মদীনা ছেড়ে খায়বারে চলে যায় এবং খায়বারকে মুসলমানদের শত্রুদের একটি ঘাঁটিতে পরিণত করে। তারা মক্কার কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা চালাবার জন্যে উস্কানি দেয়। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালায়।

বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফিররা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। উহুদের যুদ্ধেও তাদের স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। তবে উহুদ যুদ্ধের ফলাফল তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ চালাতে উৎসাহিত করে। কারণ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, উহুদ যুদ্ধে তা বদলে যায়। আর বানূ নাযীরের উস্কানি তাদের অশুভ লক্ষ্য অর্জনে আরো বেশী আগ্রহী করে তোলে।

মক্কার কাফিরদের ও খায়বারের বানূ নাযীরের মধ্যে গোপনে দূত বিনিময় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মদীনায় নতুন করে হামলা চালাবার ব্যাপারে দু'পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতপর মক্কা, গাতাফান, তায়েফ, ফাযারা ও অন্যান্য শহর থেকে লোক

যোগাড় করে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করা হয়। এভাবে বহু গোত্রের যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের কারণে একে আহ্যাব (বহু দল)-এর যুদ্ধ বলা হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসব খবর এসে পৌছে। তিনি শত্রুদের এ সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলার প্রস্তুতির জন্যে তাঁর ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। আলোচনার ফলে মদীনায় থেকেই শত্রুদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইরানী বংশোদ্ভূত ছাহাবী হযরত সালমান আল্-ফারিসী (রাঃ) শত্রুবাহিনীকে মদীনার বাইরে থাকতে বাধ্য করার লক্ষ্যে শহরের চারদিকে খন্দক (পরিখা/খাল) খননের পরামর্শ দেন। তাঁর এ পরামর্শ সঠিক মনে হওয়ায় গ্রহণ ও কার্যকর করা হয়। একারণে এযুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধও বলা হয়।

মদীনার চারদিকে প্রশস্ত ও গভীর পরিখা খনন করা হয়। এ কাজ শেষ করতে বিশ দিন লেগে যায়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজেও পরিখা খননের কাজে অংশ নেন। পরিখা খনন শেষ হবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভিতর থেকে শহরের প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে যথাযথ অবস্থান-সমূহে মোতায়েন করেন।

হিজরতের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ৬২৭ খৃস্টাব্দে বিভিন্ন অমুসলিম গোষ্ঠীর দশ হাজার সৈন্যের এক সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। তৎকালীন ছোট শহর মদীনা আক্রমণের জন্যে এটা ছিল একটা বিশাল বাহিনী। মনে হচ্ছিল তারা উত্তর, দক্ষিণ, উঁচু এলাকা ও নীচু এলাকা নির্বিশেষে সকল দিক থেকে মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা রণঢাক বাজিয়ে ও রণসঙ্গীত গেয়ে মদীনার উপকণ্ঠে এসে থামে। কিন্তু নিজেদের ও মুসলমানদের মধ্যে প্রশস্ত ও গভীর পরিখা দেখে তারা বিস্মিত হয়।

ইসলামের দুশমনরা এ নতুন যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে কল্পনাও করে নি। তাই তারা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ফলে তাদের সামনে মদীনার বাইরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথই রইল না। কিন্তু তারা কতদিন অপেক্ষা করতে পারবে?

প্রায় চার সপ্তাহ ধরে তারা অপেক্ষা করে। এ বিরক্তিকর প্রতীক্ষা তাদেরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অস্থির করে তোলে। এ দীর্ঘ অবরোধে কয়েকবার কিছু তীর বিনিময় ছাড়া আর কিছুই ঘটল না। ইসলামের দুশমনরা বেপরোয়াভাবে পরিখা পার হয়ে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু সদাসতর্ক বীর মুসলিম যোদ্ধারা তাদের সে চেষ্টা প্রতিহত করেন।

ইসলামের দুশমনদের খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ কমে যেতে থাকে। ফলে তারা খুবই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা কি করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।

এমতাবস্থায় ইসলামের দুশমনরা একটা নতুন ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করে। ইয়াহূদীদের অন্যতম গোত্র বানূ কুরাইযা তখনো মদীনায় বসবাস করছিল। শত্রুবাহিনীর নেতারা বানূ কুরাইযার নেতাদের সাথে যোগসাজশ করে এবং তাদেরকে রাতের বেলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আকস্মিক হামলা চালাবার জন্যে উৎসাহিত করে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যথাসময়ে এ চক্রান্তের কথা জানতে পারেন এবং তা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মদীনার ইয়াহূদীদের নিকট একটি বাণী পাঠালেন। এতে তিনি শত্রুবাহিনী পরাজিত হলে তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি কি হবে তা ভেবে দেখতে বললেন।

আহ্যাব যুদ্ধ (খন্দক যুদ্ধ) শেষ হবার পর বানূ কুরাইযাকে প্রায় তিন সপ্তাহ অবরোধ করে রাখা হয়। অতঃপর তারা বিচারের মাধ্যমে শাস্তি গ্রহণে রাযী হয়। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের মিত্র বানূ আউসের নেতা হযরত সা'দ (রাঃ)-এর ওপর বিচারের ভার দেয়া হয়। তিনি ইয়াহূদীদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচার করে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বানূ কুরাইযার সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ লোককে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন এবং এ রায়ের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

যা-ই হোক, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা সব সময় ও সর্বাবস্থায় সত্যপ্রেমিকদের সাথে থাকেন। সাফল্যের জন্যে তাঁর সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মদীনায় অবরুদ্ধ মুসলমানদের জন্যে এ সাহায্যের খুবই প্রয়োজন ছিল। আর শেষ পর্যন্ত সঠিক সময় তাঁরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য লাভ করেন।

হঠাৎ করে আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটে। প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়ে যায়। ফলে ইসলামের দুশমনরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাদের ঘোড়া ও উটগুলো দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করে, তাদের পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে বহু সৈন্য মারা যায়। ফলে ইসলামের দুশমনদের বিশাল বাহিনী তড়িঘড়ি করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

একবার চিন্তা করে দেখ এ দৃশ্যের কথা। আর চিন্তা করে দেখ আল্লাহ্ তা'আলা কেমন যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ–"তিনি যা চান তা-ই করে থাকেন।" (সূরাহ আল্- বুরুজ– ৮৫ ঃ ১৬)

এ পরিণতিতে ইসলামের দুশমনরা মারাত্মকভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুসলমানরা খুবই নিশ্চিন্ততা বোধ করেন। দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলা যথাসময়ে সাহায্য ও অনুগ্রহ করায় তাঁরা তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে শুকরিয়া জানান।

## হুদায়বিয়াহর সন্ধি

হিজরতের ষষ্ঠ বছরে অর্থাৎ ৬২৮ খৃস্টাব্দে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বাহ্ ঘরের 'উমরাহ (ছোট হাজ্জ) করার জন্যে মক্কাহ সফরে যাবার কথা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ১৪০০ জন ছাহাবীকে সাথে নিয়ে 'উমরাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি তাঁর সাথীদেরকে সফরের তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। উল্লেখ্য, সে যুগে আরবরা সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় এ ধরনের তলোয়ার বহন করত এবং একে কোনরূপ হুমকি বা যুদ্ধাস্ত্র বলে গণ্য করত না।

মক্কার কুরাইশরা ভালভাবেই জানত যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের এ সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 'উমরাহ সম্পাদন। কিন্তু তারা যখন মদীনায় প্রবেশে ব্যর্থ হয়েছে তখন তাদের পক্ষে কি মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া সম্ভব? তাই তারা মুসলমানদেরকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মক্কার কুরাইশরা পুরোদস্তুর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্যে মক্কার শীর্ষস্থানীয় দুই সেনাপতি খালিদ ও 'ইক্‌রামাহর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে ও সতর্ক অবস্থায় রাখে।

মুসলমানরা মক্কার দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়াহ্ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। কুরাইশরা আসলে কি চায় তা জানার জন্যে ব্যবস্থা নেয়া হল। সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না; তারা যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

অন্যদিকে কুরাইশরাও মুসলমানদের সংখ্যাশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে খোঁজখবর নিল। তারা বুঝতে পারল যে, মুসলমানরা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, কেবল কা'বাহ্ গৃহের 'উমরাহ করার উদ্দেশ্যেই এসেছেন।

উভয় পক্ষ থেকেই পরস্পরের নিকট দূত পাঠানো হল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দূতের মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানালেন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর দূতের সাথে দুর্ব্যবহার করে ও মুসলমানদেরকে হুমকি দেয়। মুসলমানদেরকে তখন চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল। তাঁরা তাঁদের সফরের তলোয়ারের সাহায্যেই কুরাইশদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে যে কোন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ ও আত্মসম্বরণের জন্য নির্দেশ দেন।

কুরাইশরা ঐ বছরের জন্য মুসলমানদেরকে মক্কায় ‘উমরাহ বা হাজ্জ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কারণ তারা বিষয়টিকে তাদের মর্যাদার সাথে জড়িত করে নিয়েছিল। অন্যদিকে তাদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া মুসলমানদের জন্য খুবই অপমানজনক ছিল। কিন্তু তাঁদের পক্ষে কি করা সম্ভব ছিল ? আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাঁদের নেতা এবং তিনি যে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন তা আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশেই গ্রহণ করে থাকেন। তাই মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে শুধু তাঁর হুকুম মেনে চলা ও তাঁর অনুসরণ করা।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও কুরাইশদের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিই ইতিহাসে হুদায়বিয়াহর সন্ধি নামে পরিচিত হয়। এ চুক্তির শর্তাবলী ছিল ঃ

ক) মুসলমানরা এ বছর মক্কাহ যিয়ারত করবে না, তবে তারা এক বছর পরে আসবে এবং মাত্র তিন দিন থাকবে।

খ) একপাক্ষিক প্রত্যর্পণ হবে– মক্কার কোন লোক রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আশ্রয় নিলে কুরাইশরা দাবী করলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, কিন্তু কোন মুসলমান মক্কায় আশ্রয় নিলে তাঁকে রাসূলের (সাঃ)-এর নিকট ফেরত পাঠানো হবে না।

গ) দশ বছরের জন্যে দু’পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সময়ের মধ্যে মুসলমানরা মক্কাহ ও তায়েফে যাতায়াত করতে পারবে এবং কুরাইশরা মুসলিম এলাকার মধ্য দিয়ে আশ্-শামে (সিরিয়ায়) যাতায়াত করতে পারবে।

ঘ) কোন পক্ষের সাথে তৃতীয় পক্ষের যুদ্ধ হলে অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে।

ঙ) অন্য যে কোন গোত্র মুসলমান বা কুরাইশদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে চাইলে করতে পারবে।

চুক্তির শর্তাবলীতে মুসলমানরা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হন। কিন্তু শীঘ্রই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দেন। আল্লাহ্ তা‘আলা কুর’আন মজীদের আয়াত নাযিল করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে জানিয়ে দিলেন ঃ

– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا –

–“ নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয়ে বিজয়ী করেছি।”
(সূরাহ আল্-ফাৎহ– ৪৮ ঃ ১)

তোমরা ভেবে অবাক হতে পার যে, এ একতরফা চুক্তি কিভাবে বিজয় বলে গণ্য হতে পারে? কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে তোমরাও বুঝতে পারবে যে, অবশ্যই এটা বিজয় ছিল। কারণ এ চুক্তির ফলে দুই পক্ষের মধ্যকার দীর্ঘকালীন উত্তেজনা দূর হয় এবং পারস্পরিক যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়। এখন থেকে মক্কার লোকদের পক্ষে মদীনায় এসে মুসলমানদের সাথে সময় কাটানো সম্ভব হওয়ায় মুসলমানদের জন্য পাষাণহৃদয় মক্কাবাসীদেরকে প্রভাবিত করার সুযোগ সৃষ্টি হল। প্রকৃত পক্ষে হুদায়বিয়াহর চুক্তির পরবর্তী কয়েক বছরে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। খালিদ বিন আল ওয়ালীদ ও 'আম্‌র্‌ বিন্‌ আল্‌-'আস্‌ এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম জন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত সেনাপতি হন এবং দ্বিতীয় জন মিসর বিজয় করেন।

এ চুক্তির ফলে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানগণ শান্তির সমর্থক ছিলেন। এর ফলে মক্কায় আটক মুসলমানদের পালিয়ে যাওয়ার পথও খুলে যায়। কারণ পরে কুরাইশদের উদ্যোগেই চুক্তির প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ধারা বাতিল করা হয়।

আর এই হুদায়বিয়াহ চুক্তির পরিণতিতেই হিজরতের অষ্টম বর্ষে ৬৩০ খৃস্টাব্দে মুসলমানদের পক্ষে মক্কাহ বিজয়ের পথ খুলে যায়।

## মক্কাহ বিজয়

হুদায়বিয়াহর সন্ধির পরবর্তী কয়েক বছরে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোম, পারস্য, মিসর ও আবিসিনিয়ার সম্রাটদের এবং শামের গোত্রপতি ও অন্যান্য নেতাদের নিকট দূত পাঠিয়ে তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন।

হিজরতের সপ্তম বছরে খায়বারে ইয়াহূদী বানূ নাযির গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। তারা মদীনা থেকে বহিস্কৃত হবার পর খায়বারে আশ্রয় নিয়েছিল এবং আহযাবের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। অতঃপর খায়বার সক্রিয় ইসলাম-বিরোধীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানকার দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ অবরোধ এবং বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের পর ইয়াহূদীদের দুর্গের পতন ঘটে।

এদিকে মুসলমানদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নতুন নতুন লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

হুদায়বিয়াহর চুক্তিতে যে কোন গোত্রকে মুসলিম বা কুরাইশদের সাথে চুক্তি করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। এর ভিত্তিতে বানূ খুযা'আহ মুসলমানদের সাথে এবং বানূ বাক্‌র্ কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করে।

হুদায়বিয়াহ চুক্তির দুই বছর পর একদিন রাতের বেলা বানূ খুযা'আহর লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকাকালে বানূ বাক্‌রের লোকেরা তাদের ওপর হামলা চালায়। তখন বানূ খুযা'আহর লোকেরা আল্-কা'বাহ্‌তে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাদেরকে আল্-কা'বাহ্‌র হারাম এলাকার মধ্যেই হত্যা করা হয়।

এভাবে হুদায়বিয়াহর চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরাইশদের নিকট চরমপত্র পাঠান এবং নীচের তিনটি পন্থার যে কোন একটি বেছে নিতে বলেন ঃ

১। বানূ খুযা'আহর ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দান;

২। বানূ বাক্‌রের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার;

৩। হুদায়বিয়াহর সন্ধি আর কার্যকর নেই বলে ঘোষণা দান।

কুরাইশরা প্রথম দু'টি পন্থার একটিতেও রাযী হল না। তারা হুদায়বিয়াহর সন্ধিকে অকার্যকর বলে ঘোষণা করল।

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কুরাইশদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকল না। তিনি হিজরতের অষ্টম বর্ষে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ১০ হাজার সৈন্যসহ মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তাঁর মক্কাহ অভিযানের খবর যাতে গোপন থাকে এজন্য তিনি পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করেন। রামাদান মাসের দশ তারিখে তিনি এ অভিযানে বের হন।

শক্তিশালী মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার কোন ক্ষমতাই কুরাইশদের ছিল না। কারণ কুরাইশ গোত্রের সকল বিখ্যাত যোদ্ধাই ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এমতাবস্থায় কিভাবে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল? মুসলিম বাহিনীর শক্তি দেখে তারা পুরোপুরি হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঘোরতর দুশমন আবু সুফিয়ান দেখল যে, পালিয়ে যাবার কোন পথ নেই। তাই সে হযরত রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর চাচা হযরত 'আব্বাস (রাঃ)কে অনুরোধ করল তাকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবার জন্য। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু সুফিয়ানকে বিনা শর্তে ক্ষমা করে দিলেন। চিন্তা করে দেখ, তিনি

কেমন মহানুভবতার অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর সব চেয়ে বড় দুশমনকে এভাবে ক্ষমা করে দিলেন!

তখনই আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে।

কোন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে। মক্কাবাসীরা দরজা বন্ধ করে নিজ নিজ ঘরে অবরুদ্ধ থাকে। কেবল অল্প কয়েক ব্যক্তি– যারা এ নতুন পরিস্থিতিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না, তারা প্রতিরোধের চেষ্টা করে, যা কোন কাজেই আসে নি।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার সকল অধিবাসীর জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনি তাদের সকল অতীত অপরাধ ক্ষমা করে দেন। সে ছিল এক অতুলনীয় দৃশ্য। কুরাইশরা এটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কিন্তু তারা বুঝতে না পারলেও এ ছিল ইসলামেরই সৌন্দর্যের আলো। আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের এ মহত্ব বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন এবং তাদেরকে এর অনুসরণের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এবার তারা ইসলামের এ রূপকে নিজেদের চোখেই দেখতে পেল।

এই সেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যাকে তারা হিজরত করতে বাধ্য করেছিল, যাকে তারা যাদুকর, পাগল ও ধর্মত্যাগী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। অথচ এই মুহাম্মাদ (সাঃ)ই তাদেরকে তাদের চরম অসহায় অবস্থায় ক্ষমা করে দিলেন।

এবার মক্কাবাসীরা নিরাপদ, শান্তিময় এবং প্রতিহিংসা ও শত্রুতা থেকে মুক্ত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরে শান্তি ও সুখের অধিকারী।

বিনা রক্তপাতে মক্কাহ বিজয় ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন তা ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। মক্কাহ বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইসলাম ও তার রাসূলের (সাঃ) মহানত্ব স্বর্ণোজ্জলভাবে প্রমাণিত ও উদ্ভাসিত হল। এ ধরনের ক্ষমা ও অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলবে? এটা কেবল ইসলামেই পাওয়া যায়। কারণ ইসলাম শান্তি, সুখ ও অন্তরের প্রশান্তি নিশ্চিত করে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অষ্টম হিজরী সালের ৯ই শাওয়াল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন।

মক্কাহ বিজয়ের পর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্-উয্যার মন্দির ধ্বংসের জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠান। এছাড়া তায়েফ অবরোধ করা হয় এবং হুনাইন ও তাবূকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

## বিদায় ভাষণ

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেন তিনি তা পুরোপুরি পালন করেন। তিনি তাঁর স্রষ্টা ও প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে সকল প্রকার পরীক্ষা মোকাবিলা করেন ও দুঃখদুর্দশা সহ্য করেন। তিনি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘ বিশ বছর যাবত চেষ্টা-সাধনা করেছেন। এ জন্যে তিনি সম্ভব সব কিছু করেছেন এবং চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি। আরব ভূখণ্ডের জনগণ এক আল্লাহ্র আইন-বিধান মেনে নেয়ার ব্যাপারে খুবই অনাগ্রহী ছিল, কিন্তু সেই আরবের কঠিন মাটিতেই তিনি তাঁর কঠিন দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলাম হচ্ছে সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো একমাত্র জীবনব্যবস্থা। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে এ জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। ইসলামী জীবনব্যবস্থা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছিলেন যে, এ পৃথিবীর বুকে তাঁর অবস্থানের সময় শেষ হয়ে আসছে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হিজরী দশম বর্ষে (৬৩২ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের শুরুর দিকে) তাঁর অধিকাংশ ছাহাবীকে সাথে নিয়ে হাজ্জ সম্পাদন করতে যান। ৯ই যূল্হিজ্জাহ 'আরাফাতের ময়দানে তাঁর অনুসারী এক লাখ ২০ হাজার হাজ্জযাত্রীর সমাবেশে তিনি খুৎবাহ (ভাষণ) দেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায় অত্যাসন্ন। তাই তিনি তাঁর এ খুৎবায় তৎকালীন ও ভবিষ্যত মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেন। অর্থাৎ তিনি বিদায়ী ভাষণ আকারে এ খুৎবাহ প্রদান করেন। এ কারণে এবং বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে ঐ খুৎবাহ বিদায়ী হাজ্জের খুৎবাহ বা বিদায়ী ভাষণ নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি উটের উপরে বসে ভাষণ দেন এবং তাঁর অনুসারীরা পিনপতন নীরবতা সহকারে এ ভাষণের প্রতিটি শব্দ মনোযোগ সহকারে শোনেন।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়ার পর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর ভাষণ শুরু করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ

"হে জনগণ! মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। কারণ আমি জানি না এরকম কোন উপলক্ষ্যে আবার তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাত হবে কিনা।

হে জনগণ! তোমরা এই মাসকে, এই দিনকে, এই নগরীকে যেরূপ পবিত্র গণ্য কর, প্রত্যেক মুসলমানের জীবন ও সম্পদকে ঠিক তদ্রূপ পবিত্র আমানত গণ্য করবে। মনে রেখো, অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হতে হবে ও তোমাদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

তোমাদের নিকট আমানতস্বরূপ রক্ষিত জিনিস তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেবে। সমস্ত রকমের বকেয়া সূদ বাতিল হয়ে যাবে এবং তোমরা কেবল তোমাদের মূল অর্থ ফেরত পাবে। আল্লাহ্‌ সূদকে হারাম করেছেন, আর আমি আমার চাচা 'আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের পাওনা সকল সূদ বাতিল করে দিচ্ছি।

হে জনগণ! তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের কতক সুনির্ধারিত অধিকার রয়েছে এবং তাদের ওপর তোমাদের সুনির্ধারিত অধিকার রয়েছে। তাদের সাথে সদাচরণ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাও। কারণ তারা তোমাদের অংশীদার ও নিষ্ঠাবান সাহায্যকারী।

শয়তান থেকে সাবধান থেকো। সে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত থেকে বিচ্যুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অতএব, দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা তার সম্পর্কে সাবধান থাকবে।

হে জনগণ! মনোযোগ দিয়ে শোন। সকল মু'মিন পরস্পর ভাই ভাই। তোমাদের জন্যে অন্য মুসলমানের মালিকানাধীন কিছু নেয়া জায়েয হবে না যদি না সে তা স্বেচ্ছায় তোমাকে দিয়ে দেয়।

হে জনগণ! কেউ কারো তুলনায় মর্যাদাবান নয় যদি না সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়। নেক আমল ব্যতিরেকে কোন অনারবের ওপরে কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

হে জনগণ! আমার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করো। আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ কুর'আন ও আমার সুন্নাহ (দৃষ্টান্ত)। তোমরা যদি এ দু'টির অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা বিপথগামী হবে না।

মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করবে, ছালাত আদায় করবে, রামাদান মাসে ছাওম পালন করবে এবং যাকাত দেবে।

হে জনগণ! তোমাদের অধীনে যারা কাজ করে তাদের প্রতি খেয়াল রেখো। তোমরা নিজেরা যা খাবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তদ্রূপ খাবার খাওয়াবে ও তদ্রূপ পোশাক পরিধান করাবে।

হে জনগণ! আমার পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না এবং নতুন কোন দ্বীনও নাযিল হবে না।

যারা আমার কথাগুলো শুনেছো তারা তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেবে এবং পুনরায় তারাও অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবে।"

এরপর তিনি উপর দিকে মুখ করে জনতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে জনগণ! আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিয়েছি?" সমবেত জনতা সমস্বরে জবাব দিলেন ঃ "হ্যা, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ সাক্ষী আছেন।"

হযরত রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর খুৎবাহ্‌ শেষ হবার সাথে সাথেই আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নীচের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

–"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নি'আমতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনবিধানরূপে মনোনীত করলাম।"–(সূরাহ আল্‌-মায়িদাহ– ৫ ঃ ৩)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন আমাদেরকে তাঁর দয়া ও অসীম রহমত দানে ধন্য করেন যাতে আমরা কেবল তাঁরই জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করতে পারি। তিনি আমাদেরকে আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করার এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল, বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত (রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অতুলনীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের জীবন পরিচালনার তাওফীক দিন। আমীন।

## বিষাদের খবর ঃ ইন্তেকাল

বিদায় হাজ্জ থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং রোগ মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ফলে তাঁর পক্ষে ছালাতে ইমামতী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তিনি তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ছালাতে ইমামতী করতে বলেন।

অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে তাঁর ভীষণ মাথাব্যথা হয় এবং খুব খারাপ ধরনের জ্বর হয়। শেষ

পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এ রোগেই ইন্তেকাল করেন। সেদিন ছিল একাদশ হিজরীর ১২ই রাবী'উল আউয়াল (মোতাবেক ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন)।

মানবজাতির ইতিহাসের পূর্ণতম মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সংবাদ মুসলমানদের জন্যে খুবই হৃদয়বিদারক ছিল। প্রথমে তাঁরা এ সংবাদ বিশ্বাসই করতে পারেন নি। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্যতম বিখ্যাত ছাহাবী হযরত 'উমার ফারূক (রাঃ) এ খবর শোনার পর খুবই দিশাহারা হয়ে পড়েন; তিনি এই বলে হুমকি দেন যে, কেউ যদি বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন তাহলে তাকে তিনি হত্যা করবেন। বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর গভীর মহব্বতের কারণে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে পড়ার ফলেই তিনি একথা বলেছিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। (সূরাহ্ আল্-কাহ্ফ- ১৮ ঃ ১১০) তিনি ছিলেন মরণশীল। তাই তিনি ইন্তেকাল করেন। মুসলমানদের জন্যে এ সংবাদ যতই বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক হোক না কেন, এ সত্যকে মেনে নেয়া ছাড়া তাঁদের কোন গত্যন্তর ছিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ) দুঃখভারাক্রান্ত মনে ও মলিন মুখে এগিয়ে যান ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কপালে চুম্বন করেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে মসজিদের বাইরে অপেক্ষারত জনতার কাছে চলে এলেন। হযরত 'উমার (রাঃ)-এর কথাও তাঁর কানে এল। তখন তিনি অশ্রুসজল অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"যে মুহাম্মাদের পূজা করেছে সে নিশ্চিত জেনে রাখুক যে মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করেছে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ জীবিত এবং তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না।"

এরপর তিনি কুর'আন মজীদ থেকে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ○

–"মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল। তার পূর্বে (অন্য) রাসূলগণ গত হয়েছে। সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পিছন দিকে ফিরে যাবে? আর যে পিছন দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌ খুব শ্রীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।" (সূরাহ্ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৪৪)

হযরত আবু বকরের বক্তব্য মুসলমানদেরকে কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আশা সৃষ্টি করে। কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্‌ই তাঁদেরকে সাহায্য করবেন এবং কুর'আন ও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাত তাঁদেরকে পথপ্রদর্শন করবে।

## দায়িত্ব সম্পাদন

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা তিনি সম্পূর্ণরূপে ও ভালভাবে সম্পাদন করেন। তিনি শুধু ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা ও তাকে শক্তিশালীই করেন নি। বরং ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করেন। তাঁর জীবনের শেষের দু'বছরে যাকাত, জিয্ইয়াহ (ইসলামী হুকুমাতের অমুসলিম অধিবাসীদের ওপর যাকাত দান ও জিহাদে অংশগ্রহণের পরিবর্তে আরোপিত নিরাপত্তা কর) ও হাজ্জ সংক্রান্ত বিধি-বিধান নাযিল হয় এবং তিনি সেসব বিধি-বিধানও বাস্তবায়ন করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি মিশন ছিল, একটি লক্ষ্য ছিল এবং তা অর্জন করা অপরিহার্য ছিল। তা হচ্ছে, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার আইন-বিধানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত, তাওহীদের প্রতি আনুগত্য, রিসালাতে ঈমান ও আখিরাতে দৃঢ় ঈমানের ওপরে ভিত্তিশীল একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তাঁর এ দায়িত্ব পুরোপুরি ও সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পৌত্তলিকতার কেন্দ্র মক্কাহ নগরীতে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি সত্যের খাতিরে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে বহু অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেন, বিরোধিতা মোকাবিলা করেন, অপমান-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়ীঘর ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে যান। তিনি মিথ্যা, অসত্য ও পাপাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং কখনো তাঁর মৌলিক নীতিমালার প্রশ্নে আপোস করেন নি। তাঁকে সব রকমের পার্থিব প্রলোভন দেয়া হয়, কিন্তু তিনি এসব ফাঁদে পড়েন নি।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যা প্রচার করতেন তা নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করতেন। তাঁর চরিত্র ও আচরণ ছিল খুবই আকর্ষণীয় যা লোকদেরকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করত। তাঁর আচার-আচরণ এমন কি তাঁর ভয়ানক দুশমনদেরকেও অভিভূত করত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তাঁর জীবন ছিল আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের নির্ভেজাল ও নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

তাঁর সঙ্গীসাথীগণ অন্য যে কারো চেয়ে তাঁকেই বেশী ভালবাসতেন। তাঁর জীবন ছিল একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, শিক্ষক, সেনাপতি, ও রাষ্ট্রনায়কের জীবন। তিনি ছিলেন স্বামী, পিতা, বন্ধু ও ভাই হিসেবে অতুলনীয়। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাহ।

তিনি যখন যুদ্ধ করেছেন কেবল সত্যের জন্যই যুদ্ধ করেছেন এবং কখনোই যুদ্ধনীতির লঙ্ঘন করেন নি। চরম উস্কানির মুখেও তিনি সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ছাহাবীগণ তাঁকে এতই ভালবাসতেন যে, তাঁরা তাঁর আহ্বানে জীবন দিতেও দ্বিধা করতেন না।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন আমাদের জন্য অনুসরণীয় উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তিনি আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল দিকবিভাগের জন্য শিক্ষা রেখে গেছেন। তাঁর জীবন ছিল ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ যা আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ হেদায়াত-গ্রন্থ কুরআনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল।

মানবজাতিকে আল্লাহ্র 'ইবাদাতের সর্বোত্তম পথ দেখানোর জন্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে নবী ও রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়। তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে তিনি পরিপূর্ণরূপে এ দায়িত্ব পালন করেন।

# এক নযরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনকাহিনী

## মক্কার জীবন

জন্ম ঃ ৫৭১ খৃষ্টাব্দ। (এ প্রসঙ্গে 'জন্ম ও শৈশব' উপশিরো-নামের পাদ টীকা দ্রষ্টব্য)
তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

| | |
|---|---|
| ৬ বছর বয়সে | মাতা আমিনাহর ইন্তেকাল। |
| ৮ বছর বয়সে | দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল। |
| ১২ বছর বয়সে | আশ্-শামে (সিরিয়ায়) প্রথম বাণিজ্যসফর। |
| ১৫ বছর বয়সে | আল্-ফিজার যুদ্ধ। |
| ১৬ বছর বয়সে | হিলফুল ফুযুলের সদস্য। |
| ২৪ বছর বয়সে | শামে দ্বিতীয় বাণিজ্যিক সফর। |
| ২৫ বছর বয়সে | হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ। |
| ৩৫ বছর বয়সে | হাজারুল আস্ওয়াদ সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা। |
| ৪০ বছর বয়সে | ৬১০ খৃস্টাব্দে নবুওয়াত লাভ। |

নবুওয়াতের

| | |
|---|---|
| ১ম বছর | ২ রাকা'আত করে ফজর ও 'আছরের ছালাত আদায়ের হুকুম নাযিল। |
| ১ম-৩য় বছর | আল্-আর্কামের গৃহকে কেন্দ্র করে গোপনে দাওয়াত। |
| ৩য় বছর | ছাফা পাহাড়ের ওপর থেকে ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত। |
| ৩য়-৫ম বছর | মক্কার কাফিরদের হিংসাত্মক দুশমনী। |
| ৫ম বছর | মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত। |
| ৬ষ্ঠ বছর | হযরত হামযাহ ও হযরত 'উমারের ইসলাম গ্রহণ। |
| ৭ম-৯ম বছর | মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে বয়কট ও শি'বি আবি তালিব-এ অবরুদ্ধ জীবন। |
| ১০ম বছর | দুঃখের বছর। চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী হযরত খাদীজাহ (রাঃ)র ইন্তেকাল। |
| ১০ম বছর | তায়েফ গমন। |
| ১০ম বছর | মি'রাজ (২৭শে রজব) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়। |

১১শ বছর আল-'আকাবাহর প্রথম অঙ্গীকার (৬২১ খৃস্টাব্দ)।

১২শ বছর আল-'আকাবাহর দ্বিতীয় অঙ্গীকার (৬২২ খৃস্টাব্দ)।

১৩শ বছর ইয়াছ্রীবে (মদীনায়) হিজরত (৬২২ খৃস্টাব্দের ২৭শে ছাফার)।

## মদীনার জীবন

### হিজরতের

১ম বছর কুবায় আগমন। ৮ই রাবী'উল আউয়াল (৬২২ খৃস্টাব্দে)।
মদীনায় আগমন (৬২২ খৃস্টাব্দের কোন এক শুক্রবার)।
ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি।
আল্-মাসজিদুন্ নাবাবী নির্মাণ।
প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

২রা হিজরী জিহাদ ফরয হয় (১২ই ছাফার)।
আযান ও যাকাত প্রচলন।
কিবলাহ্ পরিবর্তনের হুকুম নাযিল (১৫ই শা'বান)।
রামাদান মাসের ছাওম বাধ্যতামূলক হয়।
'ঈদুল ফিৎর্ (১লা শাওয়াল)।
বদরের যুদ্ধ (১৭ই রামাদান)।
হযরত 'আলী ও হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)-এর বিবাহ (বদরের যুদ্ধের পর)।
বানূ কাইনুকাকে অবরোধ।

৩রা হিজরী মদ পানের ওপর প্রথম বারের মত কড়াকড়ি আরোপ করে আয়াত নাযিল।
উহুদ যুদ্ধ (৫ই শাউয়াল)।
রিবা' (সূদ) সম্পর্কে প্রথম হুকুম নাযিল।
ইয়াতীম, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও স্ত্রীদের অধিকার বিষয়ক আইন নাযিল।

৪র্থ হিজরী নারীদের জন্যে হিজাবের হুকুমসহ আয়াত নাযিল।
মদ হারাম করে আয়াত নাযিল।

৫ম হিজরী দাওমাতুল জান্দাল ও বানূ আল্-মুস্তালিক-এর যুদ্ধ।
ব্যভিচার (যিনা) ও মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কিত আইন নাযিল।
আহ্যাবের যুদ্ধ
বানূ কুরাইযাকে শাস্তি দান।

৬ষ্ঠ হিজরী হুদায়বিয়াহর সন্ধি।

খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ওয়ালিদ ও 'আমর বিন আল্-'আসের ইসলাম গ্রহণ।

৭ম হিজরী বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট পত্র প্রেরণ।

খায়বার অবরোধ।

স্থগিত রাখা 'উমরাহ্ পালন।

বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন নাযিল।

৮ম হিজরী মু'তাহর যুদ্ধ।

মক্কাহ্ বিজয় (২০শে রামাদান)।

হুনাইনের যুদ্ধ (শাউয়াল মাসে)।

তায়েফ অবরোধ।

রিবা' (সূদ) হারাম করে চূড়ান্ত হুকুম নাযিল।

৯ম হিজরী তাবূকের যুদ্ধ।

জিয্ইয়াহ (অমুসলিমদের জিহাদে অংশগ্রহণের পরিবর্তে দেয় কর) সম্পর্কিত হুকুম নাযিল।

হাজ্জ ফরয হয়।

১০ম হিজরী বিদায়ী ভাষণ (৯ই যূলহিজ্জাহ)।

১১ই হিজরী সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তেকাল। (১২ই রাবী'উল আউয়াল, ৬৩২ খৃষ্টাব্দ)।

## অনুশীলনী (তিন ঃ ক)

### ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কোথায় ও কখন জন্মগ্রহণ করেন?

২। তাঁর পিতা ও মাতা কে ছিলেন?

৩। 'মুহাম্মাদ' নামের অর্থ কি?

৪। কা'বাহ্ পুনঃনির্মাণের ঘটনা বর্ণনা কর।

৫। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে তাঁর উত্তম চরিত্রের কারণে আর কি কি নাম দেয়া হয়েছিল?

৬। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম কি? তাঁদের বিবাহের সময় তাঁদের বয়স কত ছিল?

৭। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পুত্র-কন্যাদের নাম বল।

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। বাহীরার সাথে হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা কর।

২। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাল্যকালের ঘটনাবলী কিভাবে তাঁর মধ্যে দয়া-অনুগ্রহ সৃষ্টি করে থাকতে পারে?

৩। 'হিল্ফুল্ ফুযূল' কি ছিল?

৪। কোন্ বিষয় হযরত খাদীজাহ্ (রাঃ)কে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে তুমি মনে কর?

৫। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবার আগে মক্কার লোকেরা তাঁকে কি কি খেতাব দিয়েছিল? তিনি নবী হওয়ার পরে তাঁর প্রতি তাদের মনোভাবের মধ্যে কোন্ পরিহাস লক্ষ্য করা যায়?

### একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। তোমার মতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চরিত্রের কোন্ গুণগুলো তাঁকে নবুওয়াত লাভের উপযুক্ত একজন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিল?

২। সামাজিক তৎপরতায় তরুণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ভূমিকা আলোচনা কর। এ থেকে তুমি কি শিক্ষা লাভ করতে পার?

৩। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাছাই করে নাও এবং এসব ঘটনার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

## অনুশীলনী (তিন ঃ খ)

### ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। কখন ও কিভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নবী হলেন?

২। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নৈশভোজ অনুষ্ঠান ও হযরত 'আলী (রাঃ)-এর ঘটনা কেন কিশোর-তরুণ মুসলমানদের জন্যে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত?

৩। নাজাশী কে ছিলেন? কিভাবে মুসলমানরা তাঁদেরকে আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে তাঁকে রাযী করিয়েছিল।

৪। হযরত 'উমারের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা কর। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জন্য এ ঘটনা এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন?

৫। প্রাথমিক যুগের পাঁচজন মুসলিম পুরুষ ও পাঁচজন মুসলিম মহিলার নাম লিখ।

৬। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেন মক্কাহ ত্যাগ করেন?

৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হিজরতের বর্ণনা দাও।

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। সর্বপ্রথম কখন ও কোথায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ওয়াহী লাভ করেন।

২। দশ বছর বয়সী বালক হযরত 'আলী (রাঃ) কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন? তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার ঘটনা সম্পর্কে পত্রিকার জন্যে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৪। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে প্রধান প্রধান ফলাফল (ভাল ও মন্দ নির্বিশেষে) কি হয়েছিল?

৫। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে তাঁর মিশন পরিত্যাগ করানোর লক্ষ্যে কুরাইশরা কোন্ কোন্ পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল– আলোচনা কর। কেন তুমি মনে কর যে, তাতে কোন কাজ হয় নি?

৬। আল্-ইস্‌রা ও আল্-মি'রাজ কি?

৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেন মক্কাহ ত্যাগ করলেন? এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কি বলা হয়?

৮। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মক্কাহ থেকে মদীনায় হিজরতের বর্ণনা দাও। কেন এ ঘটনা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে একটি ক্রান্তিমূহূর্ত বলে গণ্য হয়?

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। যে পরিস্থিতি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে মক্কাহ থেকে মদীনায় হিজরতে বাধ্য করে তার বর্ণনা দাও।

২। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক প্রচারিত বাণীর প্রতি মক্কাবাসীদের দুশমনীর কারণসমূহ বর্ণনা কর।

৩। আল্-মি'রাজের বর্ণনা দাও ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

## অনুশীলনী (তিন ঃ গ)

৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪) বছর)

১। নীচের শব্দ দু'টির অর্থ লিখ ঃ
ক. মুহাজিরূন খ. আনছার

২। ছালাতের প্রথমে কিবলাহ্ কোন্টি ছিল এবং পরে পরিবর্তন করে কোন্টিকে করা হয়?

৩। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কোন্ চাচা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন?

৪। সালমান আল্-ফারিসী কে ছিলেন এবং কিভাবে তিনি আহ্যাবের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির কাজে মুসলমানদের সাহায্য করেন?

৫। আল-মি'রাজের সময় কি ঘটেছিল লিখ।

৬। মনে কর যে, তুমি মুসলমানদের মক্কাহ বিজয় দেখেছ। তাহলে তুমি কি দেখে থাকবে বর্ণনা কর।

৭। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কখন ইন্তেকাল করেন?

৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। সব জায়গার মুসলমানদের জন্যে মদীনা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেন?

২। আযানের প্রচলন করা হয় কেন? আযানের সময় যে কথাগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলা হয় সেগুলো বাংলায় লিখ।

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে মদীনায় আনছার ও মুহাজিরূনের মধ্যে সংহতি নিশ্চিত করেছিলেন?

৫। ইসলাম যে কোন ধরনের বর্ণবাদকে প্রত্যাখ্যান করে– হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মদীনার জীবন থেকে তার সপক্ষে কয়েকটি উদাহরণ দাও।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। বদর যুদ্ধের বিবরণ দাও এবং এ যুদ্ধের ফলাফলের ওপর তোমার মন্তব্য লিখ।

২। উহুদ যুদ্ধ থেকে আমরা কোন্ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি?

৩। হুদায়বিয়াহ চুক্তির প্রধান দিকগুলো কি ছিল? কিভাবে এ চুক্তি পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়?

৪। মক্কাহ বিজয়ের বিবরণ দাও এবং এ বিজয়কালে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন তার ওপরে মন্তব্য কর।

## অনুশীলনী (তিন ঃ ঘ)

৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪) বছর)

১। আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের জন্য কি রেখে গেছেন?

২। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র সম্পর্কে লিখ। কিভাবে আমরা তাঁর উন্নত চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি?

৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন থেকে পাঁচটি ঘটনা বেছে নাও এবং সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।

২। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত বিবরণ দাও। তোমার জবাবের ব্যাখ্যায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ দাও।

৩। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের হেদায়াতের (পথনির্দেশের) জন্যে কি রেখে গেছেন?

৪। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াত-কালের বিখ্যাত যুদ্ধগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটির বর্ণনা দাও এবং তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কে ছিলেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনে তাঁরা কি ভূমিকা পালন করেন?

ক) আবু তালিব খ) খাদীজাহ (রাঃ) গ) আবু বকর (রাঃ) ঘ) 'আলী (রাঃ)

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে।" (সূরাহ আল-আহ্যাব- ৩৩ ঃ ২১) তোমার নিজের ভাষায় কুর'আন মজীদের এ আয়াতের ব্যাখ্যা কর।

২। মক্কাহ ও মদীনার সমাজকাঠামোতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন এ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যুদ্ধ, সন্ধি ও বন্দীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কি কি নীতি প্রবর্তন করেন বর্ণনা কর এবং চলতি একবিংশ শতাব্দীর আচরণবিধি নির্ণয়ে এসব নীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

# চার ঃ আল-খুলাফাউর্ রাশিদূন

## (সঠিক পথে চালিত খলীফাহগণ)

## হযরত আবু বকর (রাঃ)

আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মাহর সামনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে, এখন উম্মাহকে নেতৃত্ব দেবেন কে? ঐ সময়ে মদীনার মাসজিদুন্ নাবাবীতে উপস্থিত সকলের মনেই এ প্রশ্নটি জেগেছিল। এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ কোন জনগোষ্ঠী নেতা ছাড়া চলতে পারে না। নেতৃত্ব ছাড়া একটি জনগোষ্ঠী অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ফলে এরূপ জনগোষ্ঠী উন্নতি-অগ্রগতির  সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলে।

প্রকৃত পক্ষে নেতৃত্বের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র লাশ দাফন করার আগেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

মুসলিম উম্মাহর নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপর সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে মুসলিম উম্মাহর নেতা নির্বাচিত করা হয়। তিনি হলেন মুসলমানদের প্রথম খলীফাহ। খলীফাহ মানে 'উত্তরাধিকারী' বা 'স্থলাভিষিক্ত'। মুসলিম উম্মাহর নেতা ও শাসক হিসেবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত বিধায় তাঁকে খলীফাহ বলা হয়। আর নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর (রাঃ) এ দায়িত্বের জন্যে যথাযথ ব্যক্তি ছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর এ সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রাঃ) ছাড়া আর কার পক্ষে উম্মাহকে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব ছিল? তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহকারী ছিলেন এবং তাঁর অসুস্থতাকালে ছালাতের জামা'আতে ইমামতী করেন।

একাদশ হিজরীর ১৩ই রাবী'উল আউয়াল খলীফাহ নির্বাচনের পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র লাশ দাফন করা হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মূল নাম 'আবদুল্লাহ। তাঁকে আছ্-ছিদ্দিক্ বা 'সত্যকে প্রত্যয়নকারী' খেতাব দেয়া হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল 'উছ্মান তবে তিনি আবু কুহাফাহ নামেই সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল সাল্‌মা; ডাকনাম উম্মুল খায়ের। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চেয়ে আড়াই বছরের ছোট ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফাহ নির্বাচিত হবার পর সমবেত মুসলিম  জনগণের উদ্দেশে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন ঃ

"হে জনগণ! আমি আপনাদের দ্বারা আপনাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি যদিও আমি আপনাদের কারো তুলনায় অধিকতর উত্তম নই। আমি যদি ভাল কাজ করি, আপনারা আমাকে সহায়তা করবেন, আর যদি কোন ভুল করি তো আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন।

শুনে রাখুন, সত্যই হচ্ছে ন্যায় এবং অসত্যই অন্যায়।

আপনাদের মধ্যে যারা দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তাঁদের প্রাপ্য প্রদান করব, ততক্ষণ তাঁরাই আমার দৃষ্টিতে শক্তিশালী। আর আপনাদের মধ্যে যারা শাক্তশালী, যতক্ষণ না আমি তাঁদের কাছ থেকে অন্যদের প্রাপ্য আদায় করে নেব, ততক্ষণ তাঁরাই আমার দৃষ্টিতে দুর্বল।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন, লোকেরা যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করা ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। কোন জনগোষ্ঠী যদি পাপাচারী হয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের ওপর দুর্যোগ চাপিয়ে দেবেন।

আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করি, তাহলে আপনারাও আমাকে অমান্য করার ব্যাপারে স্বাধীন।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদেরকে কেবল তখনই তাঁর আনুগত্য করতে বলেন যখন তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করেন। এমনই ছিলেন মুসলমানদের প্রথম খলীফাহ। বাস্তবিকই, আমরা যদি হযরত আবু বকরের (রাঃ) মত নেতা পেতাম তাহলে এ পৃথিবী বসবাসের জন্যে অধিকতর উত্তম জায়গায় পরিণত হত।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বন্ধুদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু এবং অন্যদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তিনি বহু ক্রীতদাসকে আযাদ করে দেন। এদের মধ্যে হযরত বিলাল বিন্ রাবাহ্, হযরত 'আম্‌র্ বিন্ ফুহাইরাহ, হযরত উম্মে উবাইস্, হযরত যিন্‌নিরাহ, হযরত নাহ্‌দীয়াহ ও তাঁর কন্যা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম্ ওয়া 'আনহুন্না) ছিলেন অন্যতম। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফিরদের বিরুদ্ধে যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনিও সেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় তাঁর ঈমানকে বেশী ভালবাসতেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমান কাফিরদের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত 'আবদুর রহমান বিন্ আবি বকর (রাঃ) একদিন তাঁর পিতাকে বললেন

ঃ "হে আমার পিতা! বদরের যুদ্ধে দু'দুইবার আপনি আমার তলোয়ারের আওতায় এসে গিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার প্রতি আমার মহব্বত আমার হাতকে (আপনাকে হত্যা করা থেকে) ফিরিয়ে রেখেছিল।" এ কথার জবাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ "হে আমার পুত্র! আমি যদি কেবল একবার তোমাকে আমার তলোয়ারের আওতায় পেতাম তা হলে আর তুমি বেঁচে থাকতে না।" হযরত আবু বকর (রাঃ) ঈমানে এমনই আপোষহীন ছিলেন!

তাবূকের যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সকল ধনসম্পদ যুদ্ধতহবিলে দান করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ?" তখন তিনি জবাব দেন ঃ "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে।" বাস্তবিকই এটা ছিল ত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত!

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইন্তেকালের আগে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে আরবের উত্তর সীমান্তে আশ্-শামে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হযরত উসামাহ বিন যায়েদকে (রাঃ) এ বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন।

উল্লেখ্য, ঐ সময় আশ্-শাম বা বৃহত্তর সিরিয়া 'বাইযান্টাইন সাম্রাজ্য' নামে পরিচিত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোমানরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পাঠানো দূতকে হত্যা করেছিল এবং এ ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় রাযী হয় নি। একারণেই সেখানে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের কারণে হযরত উসামাহর (রাঃ) পক্ষে তখন এ অভিযানে রওয়ানা হওয়া **সম্ভব হয় নি।**

হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফাহ হবার পর ইসলামী হুকুমাতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আশ্-শামে অভিযান চালানোর **সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন** সেহেতু হযরত আবু বকর (রা) হযরত উসামাহর (রাঃ) সেনাপতিত্বে আশ্-শামে সেনাবাহিনী পাঠান।

এদিকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের খবর পেয়ে অনেক লোক মনে করে যে, ইসলামী হুকুমাত দুর্বল হয়ে গেছে। তাই তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে। এই লোকেরা নতুন মুসলমান হয়েছিল এবং তাদের অনেকের অন্তরেই তখনো ঈমান মজবুত হয় নি। তাই তারা ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা করেন ঃ "আল্লাহ্র কসম! কোন লোকের কাছে যদি (যাকাত হিসেবে) একটি ছাগলছানাও পাওনা থাকে তাকে তা অবশ্যই দিতে হবে। সে যদি তা দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

অন্যদিকে বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই 'আল-আস্ওয়াদ্ বিন্ 'আন্যাহ আল্-'আন্সী নামে এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে। ইয়েমেনের মুসলমানরা তাকে সমর্থন করে। এছাড়া মুসাইলিমাহ বিন্ হাবীব ও তুলাইহাহ্ বিন্ খুওয়াইলিদ নামে দু'জন ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটে। এমন কি সাজাহ বিন্তুল্ হারিস নামে একজন নারীও নিজেকে নবী বলে দাবী করে। মালিক বিন্ নুওয়াইরাহ নামে আরেকজন ভণ্ডনবী সাজাহর সাথে যোগ দেয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এসব ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালিদকে তুলাইহাহ্‌র বিরুদ্ধে আভিযানে পাঠান। তুলাইহাহ্ আশ্-শামে পালিয়ে যায়। অবশ্য সে পরে নবুওয়াতের দাবী ত্যাগ করে এবং তাওবাহ করে ইসলামে ফিরে আসে। মালিক বিন নুওয়াইরাহ নিহত হয়।

হযরত 'ইকরামাহ বিন আবি জাহ্‌ল ও হযরত শুরাহবিল বিন হাসানাহ (রাঃ)কে মুসাইলিমাহকে দমন করার জন্যে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁরা মুসাইলিমাহর নিকট পরাজিত হন। ইতিমধ্যে মুসাইলিমাহ সাজাহকে বিবাহ করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবার হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (রাঃ)-কে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান।

যুদ্ধে খালিদ বিন আল ওয়ালিদের বাহিনীর ওয়াহ্‌শী নামের একজন সৈন্যের হাতে মুসাইলিমাহ নিহত হয়। ওয়াহ্‌শী উহূদ যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা হযরত হাম্‌যাহ (রাঃ)কে হত্যা করেছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করে। মুসাইলিমাহকে হত্যা করে ওয়াহ্‌শী হযরত হাম্‌যাহ (রাঃ)কে হত্যার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপ ইসলামী হুকুমাতকে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। এবার তাঁর পক্ষে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। হযরত রাসূলুল্লাহ (রাঃ) তাঁর ছাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ বিন হুযাইফাহর মাধ্যমে পারস্য সম্রাট খসরু দ্বিতীয় পারভীযের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং তাতে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু খসরু পারভীয তাঁর চিঠিকে ছিঁড়ে ফেলে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে গ্রেফতার করার জন্য তার প্রাদেশিক শাসকের কাছে নির্দেশ পাঠায়। কিন্তু খসরু পারভীয তার পুত্র শিরুইয়াহের (Qubadh II or Kavadh II) হাতে নিহত হয় এবং সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

তৎকালে পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত ইরাকের প্রাদেশিক শাসক হুরমুয তার এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদের সাথে খুবই নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইরাকের পার্শীদের বিরুদ্ধে আল-মুছান্নাকে (রাঃ) অভিযানে পাঠান। কিন্তু এ অভিযানের জন্যে আল-মুছান্নার (রাঃ) বাহিনী যথেষ্ট ছিল না। একারণে হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (রাঃ) নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী পাঠানো হয়। মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে একাধিক সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত বিরাট এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হয়।

খলীফাহ্ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এরপর রোমানদের দিকে দৃষ্টি দেন। ঐ সময় রোমানরা ইসলামী হুকুমাতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপদ্রব সৃষ্টি করছিল। ইতিপূর্বে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন যা মুতাহ্র যুদ্ধ নামে পরিচিত।

হযরত আবু বকর (রাঃ) রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আলাদা আলাদা চারটি সেনাবাহিনী পাঠান। এ চারটি বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন যথাক্রমে হযরত আবু 'উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ (রাঃ), হযরত 'আম্র বিন আল-'আস (রাঃ), ইয়াযীদ বিন আবি সুফিয়ান ও হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানাহ্ (রাঃ)। উক্ত চারটি বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করে। রোমানরা মোট দেড় লাখ সৈন্য সমবেত করে। অন্যদিকে মুসলমানদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ২৪ হাজার।

এ অবস্থায় আরো সৈন্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইরাকী রণাঙ্গণে মোতায়েন হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ (রাঃ) কে সেখানকার সেনাপতিত্ব আল-মুছান্না (রাঃ)কে হস্তান্তর করে সিরিয়ায় গিয়ে বিশাল রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেন।

ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ত্রয়োদশ হিজরীর ২১শে জুমাদা'উল আখিরাহ (৬৩৪ খৃস্টাব্দের ২২শে আগস্ট) ইন্তেকাল করেন। তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস ইসলামী হুকুমাতের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পাঠানো মুসলিম সেনাবাহিনী তাঁর ইন্তেকালের পরে হযরত 'উমার (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইয়ারমুকে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে রোমান বাহিনী পরাজিত হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অনেক অবদানের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে কুর'আন মজীদকে কিতাবের আকারে লিপিবদ্ধ ও প্রচার করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

**হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি ছিলেন খুবই দ্বীনদার এবং আল্লাহ্ তা'আলার একজন খালেছ বান্দাহ। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে অনুসরণ করতেন।**

### মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উপদেশ

১। সব সময় আল্লাহ্কে ভয় করবে; তিনি মানুষের অন্তরের খবর রাখেন।

২। তোমার অধীনস্থদের প্রতি দয়া কর এবং তাদের সকলের সাথে সদাচরণ কর।

৩। সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দাও; অতি দীর্ঘ নির্দেশনামা ভুলে যাবার আশঙ্কা থাকে।

৪। অন্যদেরকে তাদের আচরণ সংশোধন করার জন্যে বলার আগে তোমার নিজের আচরণ সংশোধন কর।

৫। শত্রুদের দূতকে সম্মান কর।

৬। তোমার পরিকল্পনার গোপনীয়তা রক্ষা কর।

৭। সব সময় সত্যকথা বলবে যাতে তুমি সঠিক পরামর্শ পেতে পার।

৮। যে সব বিষয়ে তোমার লোকদের সাথে আলোচনায় অসুবিধা নেই সে সব বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা কর; এর ফলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা পালন বৃদ্ধি পাবে।

৯। শত্রুর ওপরে নযর রাখার জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ নাও।

১০। আন্তরিকতা ও ইখলাছ সহকারে সঙ্গী-সাথীদের সাথে আচরণ করবে।

১১। কাপুরুষতা ও অসততা পরিত্যাগ কর।

১২। খারাপ লোকের সাথে মেলামেশা ও চলাফেরা করো না।

## হযরত 'উমার (রাঃ)

**প্রথম খলীফাহ হযরত আবু বকর (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্বে শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হযরত 'উমার (রাঃ)কে মুসলিম উম্মাহ্র দ্বিতীয় খলীফাহ মনোনীত করে যান।**

**হযরত 'উমার (রাঃ)র পিতার নাম ছিল আল-খাত্তাব। ইসলামের ইতিহাসে তিনি 'আল-ফারূক' নামে পরিচিত। 'আল-ফারূক' মানে 'পার্থক্যকারী'; তাঁকে 'সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী' অর্থে এ খেতাব দেয়া হয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতিপূর্বে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনেতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

**হযরত 'উমার (রাঃ) ছিলেন খুবই সাহসী ও স্পষ্টভাষী লোক। মৌলিক নীতিগত বিষয়সমূহে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর ও আপোষহীন। তিনি ছিলেন একজন মহান ও কর্মদক্ষ শাসক। তাঁর খিলাফত কালে ইসলামী হুকুমাতের আয়তন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।**

হযরত 'উমার (রাঃ) নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে খুবই দৃঢ় ছিলেন। তাঁর সময় মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ (রাঃ)। তিনি খালিদের ব্যাপক জন-প্রিয়তার বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং আশঙ্কা করেন যে, তাঁর সম্পর্কে লোকদের উঁচু ধারণা সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে। তাই তিনি হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ (রাঃ)কে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে হযরত আবু 'উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ (রাঃ)কে এ পদে নিয়োগ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ পদক্ষেপের পিছনে আরেকটি কারণ ছিল এই যে, তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন, প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষ অপরিহার্য নন, বরং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যই অপরিহার্য।

'আল্লামাহ্ শিবলী নু'মানী (রঃ)-এর মতে, হিজরী ১৭ সালে সিরিয়া (আশ্-শাম) বিজয়ের পরে হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ (রাঃ)কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য কতক ঐতিহাসিকের মতে, হযরত 'উমার (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর এটা ছিল তাঁর দেয়া প্রথম আদেশ।

হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ (রাঃ) বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্যে খুবই বিখ্যাত ছিলেন এবং এ জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহ্র তলোয়ার) খেতাব দিয়েছিলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে খলীফাহর আদেশ মেনে নেন। তিনি হযরত আবু 'উবাইদাহ (রাঃ)-এর অধীনে একজন সাধারণ সৈন্য হিসাবে থেকে যান। বস্তুতঃ এ হচ্ছে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রথম খলীফাহ্ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নির্দেশে হযরত খালিদ বিন আল ওয়ালিদ (রাঃ) ইরাকী রণাঙ্গণের সেনাপতি হযরত আল-মুছান্না (রাঃ)-এর নিকট অর্পণ করে ইয়ারমুক রণাঙ্গণে চলে যান। হযরত আল-মুছান্না (রাঃ) পারস্য বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করা খুবই কঠিন দেখতে পেলেন এবং খলীফাহ্ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট আরো সৈন্য চাওয়ার জন্যে নিজেই মদীনাহ চলে গেলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় ছিলেন।

এদিকে হযরত আল-মুছান্না (রাঃ) ইরাকে অনুপস্থিত থাকায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পারস্য সৈন্যরা সেনাপতি রোস্তমের অধীনে পুনারায় সংঘবদ্ধ হয়। ইতিপূর্বে মুসলমানরা তাদের কাছে থেকে যে সব এলাকা দখল করে নিয়েছিল তারা পুনরায় তা দখল করে নেয়।

এছাড়া রোস্তম হিরাহ্ ও কাসকারে দুই দল সৈন্য পাঠান। হযরত 'উমার (রাঃ) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে হযরত আবু 'উবাইদ আছ্-ছাকাফী (রাঃ)কে পাঠান এবং তিনি পারস্যের উভয় সৈন্যদলকে পরাজিত করেন।

এ খবর জানার পর পারস্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি রোস্তম তার অধীনস্ত অপর এক সেনাপতি বাহ্মানের অধীনে হাতীসহ এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠান। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং আল-জিছ্‌র বা পুল (Bridge)-এর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়।

খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ) আরেকটি সেনাবাহিনী পাঠালেন এবং হযরত আল-মুছান্না (রাঃ) পরাজিত সৈন্যদেরকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করলেন। তাঁরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন। এবার পারস্য বাহিনী পরাজিত হল।

এরপর পারস্য সম্রাট আরো একটি বড় সেনাবাহিনী পাঠান। ফলে হযরত আল-মুছান্না (রাঃ) পিছু হটে আসতে বাধ্য হন। এ নতুন পরিস্থিতির খবর হযরত 'উমার (রা)কে জানানো হল। তখন তিনি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর অধীন আরো সৈন্য পাঠালেন।

পারস্য বাহিনী ও মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়াহ নামক স্থানে পরস্পর মোকাবিলা করে। কয়েকটি রণাঙ্গণে দীর্ঘ যুদ্ধের পর অল্প সংখক সৈন্যের মুসলিম বাহিনী এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল পারস্য বাহিনীকে পরাজিত করে। মুসলমানরা হিরাহ্ ও অন্যান্য এলাকা পুনরায় দখল করেন। এটা হিজরী চতুর্দশ সালের (৬৩৬ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।

অন্যদিকে হযরত আবু বকর (রাঃ)র সময়ই মুসলিম বাহিনী দামেস্ক অবরোধ করেছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তেকাল ও হযরত 'উমার (রাঃ)-এর খলীফাহ্ হবার পরে আরো ৭০ দিন অবরোধ চলে। হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (রাঃ) আকস্মিক হামলা চালিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করেন। তখন শহরের রোমান প্রশাসক আত্মসমর্পণ করেন ও দু'পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইতিমধ্যে হযরত 'আম্‌র বিন আল-'আস (রাঃ) বায়তুল মাক্‌দিস (জেরুসালেম) অবরোধ করে রাখেন। পরে হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ (রাঃ) ও হযরত আবু 'উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সেনাপতি তাঁর সাথে যোগ দেন।

বায়তুল মাক্‌দিসের খৃস্টান অধিবাসীদের পক্ষে মুসলমানদের মোকাবিলায় জয়লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাই তারা মুসলমানদের হাতে শহর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তারা মুসলমানদের নিকট এই বলে প্রস্তাব দেয় যে, খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ) নিজে বায়তুল মাক্‌দিস এলে তারা শহরটি তাঁর নিকট হস্তান্তর করবে।

খৃস্টানদের এ প্রস্তাবের কথা মদীনায় খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ)কে জানানো হল। তিনি এ প্রস্তাবে রাযী হলেন এবং একজন সাথীসহ একটি উটে চড়ে বায়তুল মাকদিসের পথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা পালাক্রমে উঠে সওয়ার হতেন। কিছু সময় খলীফাহ্ উটের রশি ধরে হেঁটে চলতেন এবং তাঁর সাথী উটের পিঠে বসে থাকত, কিছু সময় সাথী উটের

রশি ধরে হেঁটে চলত এবং খলীফাহ উটের পিঠে বসে থাকতেন। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে ইসলামী ন্যায়নীতি। শাসক ও শাসিতের অধিকার সমান। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের শাসকদের অবশ্যই তাঁদের নিজেদের অধিকারের ওপর নাগরিকদের অধিকার স্বীকার করা উচিত।

ইসলামী হুকুমাতের খলীফাহ সাধারণ পোশাকে বায়তুল মাকদিসে প্রবেশ করেন। ফলে খৃস্টানদের পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন ছিল যে, মুসলিম জাহানের নেতা সেখানে এসেছেন। এমনই সাদাসিধেভাবে চলতেন হযরত 'উমার (রাঃ)। তিনি সব সময়ই অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মত সাদাসিধেজীবন যাপন করতেন। কিন্তু শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই কড়া ও তাঁর যুগের সব চেয়ে সুদক্ষ শাসক। তাঁর কোন অহঙ্কার ছিল না। তিনি কোনরূপ জাঁকজমক ও চাকচিক্য পছন্দ করতেন না। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। আজকের দিনের মুসলিম শাসকরা এ শিক্ষা ভুলে গেছেন; আমাদেরকে অবশ্যই এ শিক্ষার পুনরুজ্জীবন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

যা-ই হোক, হযরত 'উমার (রাঃ) বায়তুল মাকদিসে প্রবেশের পর শহরের খৃস্টান অধিবাসীদের নিরাপত্তার নিয়শ্চয়তা দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ভিত্তিতে খৃস্টানরা শহরটি মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করে।

হযরত 'উমার (রাঃ)-এর খিলাফতকালে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়ের বিশাল এলাকা এবং সমগ্র মিসর ইসলামী শাসনের আওতায় আসে।

হযরত 'উমার (রাঃ) একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনাধীন নাগরিকদের কল্যাণের জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্যে অমূল্য শিক্ষা রেখে যান।

দ্বিতীয় খলীফাহ হযরত 'উমার (রাঃ) ফিরূয নামে একজন অমুসলিম ইরানীর আঘাতে আহত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ফিরূযের ডাকনাম ছিল আবু লু'লু'। ফিরূয তার মনিব আল-মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ্-এর বিরুদ্ধে হযরত 'উমারের (রাঃ) নিকট নালিশ করেছিল। মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ্ তার ওপর কর ধার্য করেছিলেন। হযরত 'উমার (রাঃ) সব কিছু বিস্তারিত শোনার পর ফিরূযকে বলেন যে, এ কর ন্যায়সঙ্গতভাবেই ধার্য করা হয়েছে। এতে ফিরূয ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পরদিন ফজরের ছালাতের সময় সে একটি ছুরি দ্বারা হযরত 'উমার (রাঃ)কে ছয়বার আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং তিনদিন পর ইন্তেকাল করেন। এটা হিজরী ২৩ সালের (৬৪৪ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।

হযরত 'উমার (রাঃ) ইন্তেকালের আগে পরবর্তী খালীফাহ্ নির্বাচনের জন্যে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন এবং তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন খলীফাহ্ নির্বাচনের জন্যে পরামর্শ দিয়ে যান। এই কমিটির সদস্যগণ ছিলেন ঃ হযরত 'উছমান বিন

**'আফফান, হযরত 'আবদুর রহমান বিন 'আউফ, হযরত 'আলী বিন আবি তালিব, হযরত আয্-যুবায়র বিন আল-'আউয়াম, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও হযরত তাল্হাহ্ বিন 'উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)।**

**হযরত 'উমার আল ফারূক দশ বছর ছয় মাস চারদিন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন।**

**হযরত 'উমার (রাঃ)-এর উপদেশ**

১। কারো খ্যাতির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না।

২। কোন লোককে কেবল তার ছালাত আদায় ও ছাওম পালনের দ্বারা বিচার করো না, বরং তার সত্যবাদিতা ও প্রজ্ঞার দিকে নযর দাও।

৩। যে ব্যক্তি গোপনীয়তা রক্ষা করে সে তার কাজকর্ম ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৪। তুমি যে ব্যক্তিকে ঘৃণা কর তাকে ভয় করে চলো।

৫। সে-ই জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান যে নিজের কাজকর্মের মূল্যায়ন করতে পারে।

৬। তোমার কাজকে আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না।

৭। যার গুনাহ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই সে সহজেই গুনাহর ফাঁদে আটকা পড়তে পারে।

৮। কোন ব্যক্তির প্রশ্নের দ্বারা তার জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা কর।

৯। বস্তুগত কল্যাণের ব্যাপারে কম উদ্বেগ ব্যক্তিকে স্বাধীন জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলে।

১০। তাওবাহ করার চেয়ে গুনাহ না করা সহজতর।

১১। কানা'আত্ (অল্পে তুষ্টি) ও শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) দু'টি বিরাট সদগুণ; এর মধ্যে তুমি কোন্টি লাভ করছ তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

১২। যে তোমার দোষত্রুটি দেখিয়ে দেয় তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

## হযরত 'উছ্মান (রাঃ)

**দ্বিতীয় খলীফাহ্ হযরত 'উমার আল-ফারূক (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্বে ছয়সদস্যের যে কমিটি গঠন করে দিয়ে যান সে কমিটি দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত 'উছ্মান বিন 'আফ্ফান (রাঃ)কে ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় খলীফাহ নির্বাচিত করেন।**

**হযরত 'উছমান (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তুলনায় ছয় বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়াহ শাখাগোত্রের লোক। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং অত্যন্ত ধনী ছিলেন। তাঁর খেতাব ছিল 'আল-গানী' (ধনী)।**

**হযরত 'উছমান (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াহকে সাথে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। হুদায়বিয়াহর**

**আলোচনার সময় তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত 'উছমান (রাঃ) ইসলামী সেনাবাহিনীর অফিসারদের উদ্দেশে যে পত্র পাঠান তা থেকেই তাঁর রাষ্ট্রীয় নীতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তিনি লিখেন ঃ**

তোমরা হচ্ছ দুশমনদের হামলা থেকে ইসলামের হেফাযতকারী। 'উমার এমন কতগুলো হুকুম জারী করেছিলেন যেগুলো আমার জানা আছে। প্রকৃত পক্ষে আমার সাথে আলোচনা করেই সেগুলো লেখা হয়েছিল।

সাবধান! আমি তোমাদের দ্বারা কোন সীমালঙ্ঘন হয়েছে বলে রিপোর্ট শুনতে চাই না। তোমরা যদি তাই কর তাহলে তোমাদের জায়গায় অপেক্ষাকৃত উত্তম কাউকে পাঠানো হবে। সব সময় তোমাদের নিজেদের আচরণের দিকে খেয়াল রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা আমার তত্ত্বাবধানে যা কিছু ন্যস্ত করেছেন আমি তার ওপর নযর রাখব।"

একবার তিনি কর আদায়কারীদের উদ্দেশে নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই সুন্দর করে ও ভারসাম্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কেবল তা-ই কবুল করেন যা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। আস্থা স্থাপন আস্থা সৃষ্টি করে। এটা কড়াকড়িভাবে মেনে চলো এবং যারা তা করতে ব্যর্থ তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। বিশ্বস্ততা বিশ্বস্ততা নিয়ে আসে। ইয়াতীমদের ওপর এবং তুমি যাদের সাথে অঙ্গীকার করেছ তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করো না। যারা তা করবে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"

**হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ইরাকে কুফাহ্র আমীর (প্রশাসক/গভর্নর) ছিলেন। তিনি বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে নেয়া একটি ঋণ ফেরত দেন নি বিধায় হযরত 'উছমান (রাঃ) তাঁকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর জায়গায় আল-মুগীরাহকে নিয়োগ করেন।**

**হযরত 'উছমান (রাঃ)-এর আমলে আযারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ দমন করা হয়। এছাড়া আশ্-শামের প্রাদেশিক আমীর মু'আবিয়াহ মিসরের প্রাদেশিক আমীর ইবনে আবি সার্হ-এর সহায়তায় নৌবাহিনী নিয়ে সাইপ্রাসে হামলা চালান এবং দ্বীপটিকে ইসলামী শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। ত্রিপোলীসহ উত্তর আফ্রিকার বিশাল এলাকাও এ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।**

**অন্যদিকে রোমানরা যদিও অতীতে কয়েকবার মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিল তথাপি তারা হযরত 'উছমান (রাঃ)-এর শাসনামলে আরেকবার তাদের হারানো এলাকা পুনর্দখল করার চেষ্টা করে।**

পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের (বাইযান্টাইনের) সম্রাট কনস্টান্টাইন ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং পাঁচ থেকে ছয় হাজার সৈন্যের নৌবাহিনীসহ আলেকজান্দ্রিয়ায় আক্রমণ করেন। কিন্তু আমীর ইবনে আবি সার্‌হ ও আমীর মু'আবিয়াহর নেতৃত্বে নবগঠিত মুসলিম নৌবাহিনীর নিকট রোমান নৌবাহিনী পরাজিত হয়।

হযরত 'উছ্‌মান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ ছয়বছর ছিল আভ্যন্তরীন বিরোধ ও গোলযোগপূর্ণ। এ গোলযোগ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হযরত 'উছ্‌মান (রাঃ) উচ্ছৃঙ্খল ক্রুদ্ধ জনতার হামলায় নিহত হন।

হযরত 'উছ্‌মান (রাঃ)-এর খিলাফত বার বছর স্থায়ী হয়। তিনি ৩৫ হিজরী সালের (৬৫৬ খৃস্টাব্দে) ১৭ই যুল্‌হিজ্জাহ শুক্রবার বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে নিহত হন।

হযরত 'উছ্‌মান (রাঃ) অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তিনি তাঁর সরলতা ও দয়ার কারণে বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন নি। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর নরম প্রকৃতির কারণে তাঁর প্রশাসন হযরত 'উমার (রাঃ)-এর প্রশাসনের মত ভাল ছিল না।

হযরত 'উছ্‌মান (রাঃ) খুবই মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব সময়ই ইসলামের জন্য ও ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার লোক ছিলেন। তিনি সব কিছুর উর্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন ও ভালবাসতেন। কুর'আন মজীদকে কিতাবের আকারে (মুছ্‌হাফ) পেশ করা তাঁর খিলাফাত-কালের সবচেয়ে বড় অবদান।

## হযরত 'আলী (রাঃ)

"আমি আপনাদের মধ্যে সকলের ছোট; আমি একজন বালক হতে পারি, আমার পা যথেষ্ট মযবূত না হতে পারে, কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার সাহায্যকারী হব। যে আপনার বিরোধিতা করবে আমি তাঁর বিরুদ্ধে জানী-দুশমনের মত লড়াই করব।"

এ কথাগুলো আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই হযরত 'আলী (রাঃ)-এর। তিনি যখন দশ বছরের বালক তখন এ কথাগুলো বলেছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরাইশ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের জন্যে যে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন সেখানে হযরত 'আলী (রাঃ) এ কথাগুলো বলেছিলেন।

হযর 'আলী বিন আবি তালিব (রাঃ) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরতের রাতে কাফিরদের ঘাতকদল যখন তাঁর ঘর অবরোধ করে রেখেছিল তখন তাঁকে নিরাপদে মক্কা

ত্যাগে সহায়তা করার জন্যে হযরত 'আলী (রাঃ) তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন। এই হযরত 'আলী (রাঃ)ই হযরত 'উছ্মান (রাঃ)-এর পরে ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্থ খলীফাহ নির্বাচিত হন।

হযরত 'আলী (রাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)কে বিবাহ করেন। তাঁদের ঘরে তিনটি পুত্রসন্তান– হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও হযরত মুহাসসিন (রাঃ) ও দু'টি কন্যাসন্তান– হযরত যয়নাব ও হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহাসসিন (রাঃ) শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে খুবই ভালবাসতেন।

হযরত 'আলী (রাঃ) বদর, আহ্‌যাব ও খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খায়বার যুদ্ধে মূলতঃ হযরত 'আলী (রাঃ)-এর দুর্বার হামলার কারণেই ইয়াহূদীরা পরাজিত হয়েছিল।

হযরত 'আলী (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনকালে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে, প্রথম তিন খলীফাহর খিলাফাত-কালে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

অত্যন্ত জটিল ও সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে হযরত 'আলী (রাঃ) খলীফাহ নির্বাচিত হন। ঐ সময় তৃতীয় খলীফাহ হযরত 'উছ্মান (রাঃ)-এর নিহত হবার পর মুসলিম উম্মাহ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই তাঁর প্রশাসনকে সুসংহত করেন এবং হযরত 'উছ্মান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু হযরত 'উছ্মান (রাঃ)-এর সমর্থকরা তাঁর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আগে খলীফাহর কথা শুনতে রাযী ছিলেন না।

বস্তুতঃ হযরত 'উছ্মান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। এ হত্যাকাণ্ড একক, ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করে ফেলে। উপদলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এর ফলে মুসলিম ঐক্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যে শক্তিশালী ইসলামী বাহিনী একদিন বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং তৎকালীন পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের স্বৈরাচারী শোষণ-নির্যাতনের হাত থেকে মযলুম মানুষদেরকে উদ্ধার করেছিল তারা এখন গুরুতরভাবে আভ্যন্তরীণ সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ল।

প্রাজ্ঞ শাসনকর্তা হযরত 'আলী (রাঃ)কে তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই বিভিন্ন জঙ্গী মুসলিম উপদলকে দমন করার জন্যে ব্যয় করতে হয়। তিনি তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর সাথে আপোষরফা করেন। কিন্তু এতে তিনি তেমন একটা সফল হতে পারেন নি। ফলে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যায় এবং এর পরিণতি হয় খুবই বিপর্যয়কর।

**এ ধরনের চরম সংঘাতমুখর অবস্থায় ইসলামের চতুর্থ খলীফাহ্ হযরত 'আলী (রাঃ) ফজরের ছালাত আদায়ের সময় ইবনে মুল্জাম নামে জনৈক ঘাতকের তরবারীর আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। এর ফলে তিনি হিজরী ৪০ সালের (৬৫৯খৃষ্টাব্দে) ২০শে রামাদান শুক্রবার ইন্তেকাল করেন।**

**হযরত 'আলী (রাঃ) চার বছর নয় মাস ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর পুরো শাসনকালই ছিল গোলযোগপূর্ণ।**

**হযরত 'আলী (রাঃ) অত্যন্ত সহজ সরল, অনাড়ম্বর ও সংযমী জীবন যাপন করতেন। তিনি ছিলেন খুবই সাহসী। তেমনি ন্যায়বিচারের জন্যে প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।**

**হযরত 'আলী (রাঃ) জ্ঞানার্জন ভালবাসতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বাবুল 'ইলম (জ্ঞানের দরজা) খেতাব দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি 'মুর্তাযা' (আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত) ও 'আসাদুল্লাহ্' (আল্লাহ্র সিংহ) হিসেবেও অভিহিত ছিলেন।**

**হযরত 'আলী (রাঃ)-এর কতক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি ঃ**

১। যে নিজেকে চিনেছে সে তার স্রষ্টাকে চিনেছে।

২। তুমি যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে তোমার অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বতকে উৎপাটিত কর।

৩। আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে সুরক্ষিত করে।

৪। কি করে তুমি এ দুনিয়ার জীবনের জন্যে আনন্দ করতে পার যা প্রতি ঘন্টায়ই অধিকতর সংক্ষিপ্ত হচ্ছে?

৫। এক ঘন্টার বিপথগামিতা বিশ্বজোড়া সুখ্যাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

৬। তিনটি ভুল জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে ঃ
ক) প্রতিহিংসাপরায়ণতা খ) পরশ্রীকাতরতা গ) খারাপ চরিত্র।

৭। এই প্রবাহমান জীবনে যে পার্থিব ধনসম্পদের জন্যে গর্বিত সে মুর্খ।

৮। আনন্দের পরেই আসে অশ্রু।

৯। মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাসই হচ্ছে মৃত্যুর দিকে এক একটি পদক্ষেপ।

১০। সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার অধীনস্তদের উপকার করে।

১১। যে নিজেকে সর্বোত্তম মনে করে সে নিকৃষ্টতম।

১২। সেই ব্যক্তি ঘৃণিত যে ভাল কাজের জবাবে মন্দ করে।

১৩। সদগুণ সাফল্যের চাবিকাঠি।

১৪। জ্ঞানীরা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকেন; অজ্ঞ লোকেরা বেঁচে থাকলেও আসলে মৃত।

১৫। অর্জিত জ্ঞানের তুল্য কোন ধনভাণ্ডার নেই।

১৬। জ্ঞানই হচ্ছে বিচক্ষণতা এবং শিক্ষিত লোকেরাই বিচক্ষণ হয়ে থাকে।

১৭। অভিজ্ঞতা হচ্ছে অর্জিত জ্ঞান।

১৮। যে কখনো নিজেকে সংশোধন করে না সে কখনোই অন্যকে সংশোধন করতে পারে না।

১৯। শোন, তাহলে তুমি নিজেকে শিখাতে পারবে; নীরব থাক, আর তাতে তোমার কোন ঝুঁকি নেই।

২০। যে আল্লাহ্‌র নি'আমতসমূহ নিয়ে চিন্তা করে সেই সফল হয়।

২১। ক্যান্সার শরীরের যতখানি ক্ষতি করে অজ্ঞতা মানুষের তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করে।

২২। নির্বোধ লোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘন ঘন মত পরিবর্তন।

২৩। যখন কথা বলার উপযুক্ত সময় নয় তখন কিছুতেই কথা বলো না।

২৪। গীবত থেকে সাবধান থাক; গীবত তিক্ততার বীজ বপন করে এবং আল্লাহ্ ও মানুষ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

২৫। সব চেয়ে বড় সততা হচ্ছে ওয়াদা রক্ষা করা।

২৬। মিথ্যা বলার চেয়ে বোবা হওয়া ভাল।

২৭। চাটুকারিতা করো না; এটা ঈমানের পরিচায়ক নয়।

২৮। মুনাফিকের জিহ্বা পরিষ্কার (কথা সুন্দর), কিন্তু তার অন্তর রোগগ্রস্ত।

২৯। খারাপ লোকের সাথী হবার তুলনায় একা থাকা ভাল।

৩০। যে ভাল কাজের প্রচলন করে সে তার প্রতিদান পাবে।

## উপসংহার

হযরত আবু বকর আছ্-ছিদ্দিক, হযরত 'উমার আল-ফারূক, হযরত 'উছ্মান আল-গানী ও হযরত 'আলী আল-মুরতাযা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) পর পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উত্তরসূরি ও স্থলাভিষিক্ত (খলীফাহ্) হন। এই চারজন খলীফাহ 'খুলাফাউর রাশিদূন' বা 'সঠিক পথে চালিত খলীফাহ্গণ' হিসেবে পরিচিত।

এই চারজন খলীফাহ সর্বমোট তিরিশ বছর ইসলামী খিলাফতের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। তাঁরা পুরোপুরিভাবে কুর'আন মজীদ ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী নিজ নিজ যুগের জনগণকে শাসন করেছেন। একারণেই তাঁদেরকে খুলাফাউর

রাশিদূন বলা হয়। যদিও এসময়ে কিছু অপ্রীতিকর ও বিশৃঙ্খলামূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তথাপি ইসলামী হুকুমাতের এ সময়টি ছিল মানবজাতির ইতিহাসে ন্যায়বিচারের অতুলনীয় স্বর্ণযুগ। এ সময়ে ইসলামী মূলনীতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হত।

খুলাফাউর রাশিদূনের জীবনকাহিনী নিয়ে বিস্তারিত ও গভীর আলোচনা করলে তা আমাদের সামনে ইসলামী জীবনবিধান সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক বিরাট ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে, যা মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যত সমস্যাবলীর সমাধান করতে সক্ষম। বস্তুতঃ ইসলামী শিক্ষা থেকে প্রতিশ্রুত কল্যাণ লাভ করতে হলে আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে তা অনুসরণ বা বাস্তবায়ন করতে হবে। আর কেবল মুখের কথায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেই ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদিও সকল প্রকার অত্যাধুনিক প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামকে তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন, তথাপি কেবল ইসলামের বাস্তব অনুশীলনই কার্যকরভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের সঠিক পথ।

তাই এসো, আমরা ইসলামকে জানা, বুঝা, অনুসরণ ও প্রচারের সিদ্ধান্ত নিই। কেবল তাহলেই আমরা নিজেরাও সুখ ও শান্তির সন্ধান পাব এবং সমগ্র মানবজাতিও অশান্তি ও জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে।

## অনুশীলনী (৪ ঃ ক)

৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। ‘খলীফাহ’ ও ‘খিলাফত’ শব্দদ্বয়ের অর্থ কি?

২। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেতাব কি?

৩। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফাহ হবার পর সর্বপ্রথম যে ভাষণ দেন তাতে কি বলেছিলেন?

৪। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যে পুত্র বদর-এর যুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাঁর নাম কি?

৫। খলীফাহ হযরত ‘উমার (রাঃ)-এর খেতাব কি?

৬। হযরত ‘উমার (রাঃ)-এর সময়কার একজন মুসলিম সেনাপতির নাম বল।

৭। হযরত ‘উমার (রাঃ) কখন ও কিভাবে ইন্তেকাল করেন?

৮। তোমার মতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে তাঁর বিশেষ বন্ধু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কেন?

৯। তোমার মতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দেয়া উপদেশের মধ্যে উল্লেখকৃত দশটি বক্তব্য অধ্যয়ন করে আমরা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কি ধারণা লাভ করতে পারি?

## ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। 'আল-খুলাফাউর রাশিদূন' কথার অর্থ কি?

২। খলীফাহ্ হযরত আবু বকর (রাঃ) যে সব ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন তাদের নাম লিখ।

৩। বদর যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর পুত্রকে কি বলেছিলেন? আমরা এ থেকে কি শিক্ষা পাই?

৪। খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফাহ্ নির্বাচনের লক্ষ্যে যে কমিটি গঠন করে যান তার সদস্যগণের নাম লিখ।

৫। খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ)-এর বায়তুল মাকদিস সফর সম্পর্কে পত্রিকার জন্যে একটি নিবন্ধ লিখ।

৬। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জীবন থেকে এমন কয়েকটি ঘটনা আলোচনা কর যা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

৭। খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ)-এর বার-দফা উপদেশ থেকে কি কি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়?

৮। হযরত 'উমার (রাঃ)-এর চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর এবং সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে তোমার জবাব ব্যাখ্যা কর।

## একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। ইসলামী সমাজে নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইসলাম কেন উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে নির্বাচিত শাসক পছন্দ করে?

২। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফাহ্ নির্বাচিত হবার পর যে ভাষণ দেন আজকের দুনিয়ার নেতাদের অবস্থার আলোকে তা ব্যতিক্রমধর্মী কেন?

৩। হযরত খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ (রাঃ)কে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল কেন?

৪। ইসলামে প্রকৃত পক্ষে নেতা হচ্ছেন জনগণের খাদেম। কোন্ কোন্ প্রলোভন একজন শাসককে দূর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলতে পারে?

## অনুশীলনী (৪ ঃ খ)

৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে হযরত 'আলী (রাঃ)কে কি খেতাব দেয়া হয়েছিল?

২। খলীফাহ হযরত 'আলী (রাঃ)-এর ৩০-দফা উপদেশের মধ্য থেকে দশটি বক্তব্য বেছে নাও এবং তুমি সেগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

৩। খলীফাহদের মহান চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যে প্রত্যেক খলীফাহর জীবন থেকে একটি করে উদাহরণ দাও।

৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। খলীফাহ হযরত 'উছমান (রাঃ) ইসলামী বাহিনীর অফিসারদের নিকট কি লিখেছিলেন?

২। খলীফাহ হযরত 'উছমান (রাঃ)-এর খেতাব কি ছিল?

৩। খলীফাহ হযরত 'উছমান (রাঃ) ও খলীফাহ হযরত 'আলী (রাঃ)র সাথে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে কন্যাদের বিবাহ হয় তাঁদের নাম লিখ।

৪। হযরত 'উছমান (রাঃ) খলীফাহ থাকাকালে মু'আবিয়াহ কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?

৫। হযরত 'উছমান (রাঃ) খলীফাহ থাকাকালে কোন্ কোন্ দেশ মুসলিম শাসনের আওতায় আসে?

৬। খলীফাহ হযরত 'আলী (রাঃ)-এর পিতার নাম কি?

৭। হযরত ফাতিমাহ ও হযরত 'আলী (রাঃ)-এর পুত্র-কন্যাদের নাম লিখ।

৮। খলীফাহ হযরত 'আলী (রাঃ) কখন কিভাবে ইন্তেকাল করেন?

একাদশ-দ্বাদশ শেণী (১৭-১৮ বছর)

১। হযরত 'উছমান (রাঃ) খলীফাহ থাকাকালে জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূল কারণগুলো এবং এ ব্যাপারে তাঁর গৃহীত ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। হযরত 'আলী (রাঃ)-এর খিলাফত সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? শিয়ারা তাঁকে প্রথম খলীফাহ বলে দাবী করে কেন?

৩। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র, উত্তরাধিকারভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ, স্বৈরতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

# পাঁচ ঃ তিন জন মহীয়সী মুসলিম মহিলা

## হযরত খাদীজাহ (রাঃ)

*"যখন কেউ আমার ওপর ঈমান আনেনি তখন খাদীজাহ ঈমান এনেছেন। তিনি তাঁর সম্পদে আমাকে অংশীদার করেছেন।"*

কথাগুলো বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (মহীয়সী খাদীজাহ) (রাঃ) সম্পর্কে।

আব্‌রাহার হস্তীবাহিনীসহ মক্কাহ আক্রমণের ১৫ বছর আগে ৫৫৫ খৃস্টাব্দে হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর জন্ম। তাঁর পিতার নাম ছিল খুওয়াইলিদ ও মাতার নাম ছিল ফাতিমাহ বিনতে যাইদাহ।

হযরত খাদীজাহ (রাঃ) তৎকালে একজন মহীয়সী ও সচ্চরিত্রা ধনী মহিলা হিসেবে মক্কা্ নগরীতে সুপরিচিতা ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স যখন ২৫ বছর ও হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর বয়স ৪০ বছর তখন তাঁদের মধ্যে বিবাহ হয়। তাঁদের ছয়টি সন্তান হয়েছিল– দু'টি পুত্রসন্তান ঃ হযরত আল-কাসিম ও হযরত 'আবদুল্লাহ (রাঃ)। তাঁরা যথাক্রমে তাহির ও তায়্যিব নামেও পরিচিত; এবং চারটি কন্যাসন্তান ঃ হযরত যায়নাব, হযরত রুকাইয়াহ, হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)।

হযরত খাদীজাহ (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে বিবাহের পর ২৫ বছর বেঁচে ছিলেন ও তাঁর সাথে ঘর করেছিলেন। হযরত খাদীজাহ (রাঃ) বেঁচে থাকাকালে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আর কোন বিবাহ করেননি; তখন হযরত খাদীজাহ (রাঃ) ছিলেন তাঁর একমাত্র স্ত্রী।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর সর্বপ্রথম যখন ওয়াহী নাযিল হল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করলেন তখন সাথে সাথেই যিনি তাঁর ওপর ঈমান আনেন তিনি হচ্ছেন হযরত খাদীজাহ (রাঃ)। তিনিই হচ্ছেন প্রথম মুসলমান। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণ মক্কা্বাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে খুবই সহায়ক হয়। তিনি সব সময়ই হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সহায়তা করেন। বিপদাপদের সময় তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সাহস যোগাতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি সাধ্যমত সকল প্রকার সাহায্য করেন।

হযরত খাদীজাহ (রাঃ) তাঁর ধনসম্পদ ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) সব সময়ই ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর হযরত খাদীজাহ (রাঃ) তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা ও অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম করতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত খাদীজাহ (রাঃ)কে বিভিন্ন সময় বহু দুঃখবেদনা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁদের দুই পুত্র হযরত আল-কাসিম ও হযরত 'আবদুল্লাহ (রাঃ) শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পঞ্চম বছরে তাঁদের কন্যা হযরত রুকাইয়াহ (রাঃ) তাঁর স্বামী হযরত 'উছ্‌মান বিন 'আফ্‌ফান (রাঃ)-এর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। হযরত রুকাইয়াহ (রাঃ) বার বছর বয়সে তাঁর পিতামাতার নিকট থেকে দূরে চলে যান এবং চার বছর পর ফিরে আসেন। সন্তান থেকে এ দীর্ঘ বিচ্ছেদ হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর জন্যে খুবই বেদনাদায়ক ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুওয়াত লাভ করার পর কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্যে সাধ্য মত চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে হযরত খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে সাহস যোগান ও সান্ত্বনা দেন। কাফিররা যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বয়কট আরোপ করে এবং তাঁদেরকে শি'বি আবি তালিবে দীর্ঘ তিন বছর কাটাতে হয় তখন হযরত খাদীজাহ (রাঃ)কে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়।

নবুওয়াতের দশম বছরে (৬২০ খৃস্টাব্দে) ১০ই রামাদান তারিখে প্রথম মুসলমান মহীয়সী মহিলা হযরত খাদীজাহ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তাঁর ইন্তেকাল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্যে বিরাট আঘাত ছিল। তিনি বলেন ঃ "আমি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ এর মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত খাদীজাহ (রাঃ)কে এতই ভালবাসতেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করতেন।

হযরত খাদীজাহ (রাঃ) ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতমা মহিলাদের অন্যতম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নিয়মিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তাঁর জন্যে সালাম নিয়ে আসতেন।

হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর ইন্তেকালে তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) খুবই মর্মাহত হন। এর পর থেকে তিনি সব সময়ই পিতার কাছে থাকতেন এবং প্রায়ই মায়ের জন্যে অশ্রুবিসর্জন করতেন ও বলতেন ঃ "কোথায় আমার মা? কোথায় আমার মা?" হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাদীজাহ (রাঃ)কে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন।

মুসলিম কিশোরী ও তরুণীদের জন্যে হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি কতই না আন্তরিক ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র পথে

কতই না চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আজকের দিনে কোন মুসলমান হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর মত স্ত্রী পেলে তিনি গর্বিত হবেন। হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর গুণে গুণান্বিতা মহীয়সী মুসলিম মহিলাগণ এ বিশ্বকে বদলে দিতে পারেন।

## হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চার কন্যার মধ্যে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) ছিলেন সকলের ছোট। তিনি 'সাইয়িদাতুন নিসা'য়ি ফী আহ্লিল জান্নাহ'– অর্থাৎ 'বেহেশ্তের নারীদের নেত্রী' হিসেবে সুপরিচিতা। তাঁর আরেকটি খেতাব হচ্ছে 'আয্-যাহ্‌রা' অর্থাৎ 'দীপ্তিমতী সুন্দরী'। একারণে তাঁকে 'ফাতিমাতুয্-যাহ্‌রা'ও বলা হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর আগে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) ও তাঁর বোনেরা তাঁদের সৎমাতা হযরত সাওদাহ (রাঃ)-এর সাথে হিজরত করেন।

হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁর মাতা হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমত করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাঁকে খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহমমতা প্রদর্শন করতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল স্ত্রীই হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)কে ভালবাসতেন। তিনি দেখতে তাঁর মাতা হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর মত ছিলেন এবং তাঁকে দেখে যে কারোই তাঁর মহীয়সী মাতার কথা মনে পড়ত।

বদর-যুদ্ধের পর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হযরত 'আলী (রাঃ)-এর সাথে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদেরকে খেজুর ও মধুর শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এ সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ১৮ বছর। অবশ্য কোন কোন মতে তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর।

হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁর দাম্পত্য জীবনে খুবই সুখী ছিলেন। তাঁর স্বামী হযরত 'আলী (রাঃ) তাঁকে সম্মান করতেন। অন্যদিকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সব সময়ই প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীকে মেনে চলতে ও তাঁর খেদমত করার জন্যে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)কে উপদেশ দিতেন।

হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) সব সময়ই তাঁর ঘরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন। ফলে তাঁর ঘর দেখতে সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর হলেও তাতে একটা পবিত্র ভাব থাকত। সেখানে সব সময়ই শান্তি ও শান্ত পরিবেশ বিরাজ করত।

হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) ও হযরত 'আলী (রাঃ) তাঁদের বৈবাহিক জীবনে পাঁচজন সন্তান লাভ করেন। তাঁরা হলেন তিন পুত্র ঃ হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও হযরত মুহাস্‌সিন (রাঃ) এবং দুই কন্যা ঃ হযরত যায়নাব ও হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)। হযরত মুহাস্‌সিন (রাঃ) শিশু বয়সে ইন্তেকাল করেন।

বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)র হাসিখুশী ব্যক্তিত্ব, দয়া, নম্রতা ও উচ্চ মর্যাদার কারণে তিনি একজন মহীয়সী মহিলা হিসেবে গণ্য হতেন এবং সমকালীন মহিলারা তাঁকে খুবই সম্মান করতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

"সারা বিশ্বের সকল নারীর মধ্যে চারজন নারী সর্বশ্রেষ্ঠ ঃ খাদীজাহ, ফাতিমাহ,মারইয়াম (হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা) ও আছিয়াহ (ফির'আউনের স্ত্রী)।"

অভ্যাস, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কথাবার্তার দিক থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)-এর খুবই মিল ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন মজলিসে থাকাকালে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) সেখানে প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াতেন এবং নিজের পাশে তাঁর বসার জন্যে জায়গা করে দিতেন।

হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আহত মুসলিম সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। এ যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আহত হলে হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) কাপড় দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থান বেঁধে দেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ যখন মক্কা বিজয় করেন তখনও হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনা থেকে বাইরে যেতেন তখন হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁকে বিদায় জানাতেন। আবার তিনি যখন ফিরে আসতেন তখন হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) এসে তাঁর সাথে দেখা করতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের কয়েক মাস পর হিজরী ১১ সালের ৩রা রামাদান হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি ওয়াছিয়াত করেন যে, তাঁর লাশ যেন এমনভাবে ছালাতুল জানাযার জন্যে নেয়া হয় যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, তা একজন নারীর লাশ, নাকি একজন পুরুষের লাশ।

যেহেতু হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খুব শ্রীঘ্রই ইন্তেকাল করেন সেহেতু তিনি বেশী সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা আঠারো-উনিশটির মত।

হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) ছিলেন একজন আদর্শ মুসলিম কন্যা, স্ত্রী ও মাতা। সকল বয়সের মুসলিম নারীদেরই উচিত তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা।

## হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)কে বিবাহ করেন। এই মহীয়সী মুসলিম নারী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে ৬১৩ বা ৬১৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং নয় বছর বয়সে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর বয়স যখন ১২ বছর, মতান্তরে ১৫ বছর, তখন তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে যান ও তাঁর সাথে বসবাস শুরু করেন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)র পিতা ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খলীফাহ হযরত আবু বকর (রাঃ)। তাঁর মায়ের নাম ছিল হযরত উম্মে রূমান (রাঃ)।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) ছিলেন একজন মহীয়সী মুসলিম মহিলা। তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভার অধিকারী এবং তাঁর স্মরণশক্তি ছিল বিস্ময়কর। তিনি জ্ঞানার্জন খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বিচারক্ষমতার কারণে বিখ্যাত ছিলেন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) ইসলামী পরিবেশে লালিত পালিত ও বড় হন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহান মুসলিম ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিয়মিত তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)-এর যখন বুদ্ধির বিকাশ ঘটে তখনই তিনি মুসলিম হন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) শিশু বয়সেই কুর'আন মজীদের বেশ কয়েকটি সূরাহ্ মুখস্ত করে ফেলেন। তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে জ্ঞানস্পৃহার অধিকারী হন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা্ থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) ও তাঁর বড় বোন হযরত আস্‌মা' (রাঃ) তাঁর সফরের মালামাল বাঁধার কাজে সাহায্য করেন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) ভাগ্যক্রমে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক, আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। এই শিক্ষা তাঁকে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত মহিলায় পরিণত করে। তিনি তাঁর স্বামী হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বত করতেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাঁকে খুবই ভালবাসতেন।

তিনি তাঁর স্বামীর খেদমত করতে ভালবাসতেন। তিনি যাঁতায় পিষে আটা তৈরী করতেন, রুটি তৈরী করতেন ও সেকতেন এবং অন্যান্য গার্হস্থ্য কাজকর্ম করতেন। বিছানা বিছানো এবং সব রকমের ধোয়ামোছার কাজও নিজেই করতেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে সব সময়ই ছালাতের আগে উযূ'র পানি প্রস্তুত রাখতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে কেবল তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যের জন্যে ভালবাসতেন না, বরং তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সঠিক বিচারক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের জন্যও ভালবাসতেন। অন্যদিকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা পছন্দ করতেন হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)ও তা পছন্দ করতেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা অপছন্দ করতেন তিনি তা অপসন্দ করতেন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চেয়ে যদি কাউকে বেশী ভালবেসে থাকেন তো আল্লাহ্‌কে বেশী ভালবাসতেন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষাও ছিল তা-ই।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। কোন কোন সময় পরিবারের সদস্যদের খাবার জন্য কিছুই থাকত না। কোন কোন সময় ঘরে যে খাবার থাকত তা মেহমানদের খাইয়ে নিজেরা না খেয়ে থাকতেন। তাঁরা এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের তুলনায় পরকালীন জীবনের আরাম-আয়েশকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এ-ও ইসলামের অন্যতম শিক্ষা।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) নিয়মিত হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্রন্দন করতেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একাদশ হিজরী সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সহকারে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোলে মাথা রেখেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের সময়ও হাযির ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)কে দাফন করার জন্যে কয় টুকরা কাপড় ব্যবহার করা হয়েছিল। জবাবে তিনি জানান, তিন টুকরা। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর কন্যাকে বলেন যে, তাঁকেও যেন তিন টুকরা কাপড় দিয়ে দাফন করা হয়।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) তাঁর পিতার কবরের পাশে তাঁর নিজের দাফনের জন্যে জায়গা সংরক্ষিত রেখেছিলেন। কিন্তু পরে দ্বিতীয় খলীফাহ হযরত 'উমার (রাঃ) ঘাতকের আঘাতে গুরুতররূপে আহত হলে তিনি তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রাঃ)কে হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)-এর নিকট পাঠান এবং তাঁকে হযরত আবু বকরের (রাঃ) পাশে কবর দেয়ার জন্যে অনুমতি চান। হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) এতে সম্মতি দেন এবং বলেন, "আজকে আমি 'উমারকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছি।" এ থেকেই বুঝা যায় তিনি কত বড় মহান হৃদয়ের মহিলা ছিলেন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ) সব সময়ই সত্যের পক্ষে সমর্থন জানাতেন। তিনি অনেককে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ইসলামী বিধি-বিধানের অনেক বিষয়ে, বিশেষ করে নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)-এর জীবন ইতিহাস থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুসলিম মহিলা উন্নতির কোন্ উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল খুবই নীচু। ইসলাম তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম দেখতে চায় যে, একজন নারী তার মেধা-প্রতিভার উন্নতি ঘটাবে এবং মাতা ও স্ত্রী হিসেবে সমাজে অবদান রাখবে, স্বামীর অনুগত থাকবে ও স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করবে।

মুসলিম কিশোরী ও তরুণীদের জন্যে হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)-এর জীবন একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। তাদের উচিত স্বামীর প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার প্রতি হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)-এর বিশেষ আগ্রহ ও প্রবণতা মুসলিম নারীদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

# অনুশীলনী (৫)

## ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বিবাহের পূর্বে হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর জীবন সংক্রান্ত দু'টি তথ্য উল্লেখ কর।

২। তিনি কত বছর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জীবন যাপন করেন?

৩। তিনি কখন ইন্তেকাল করেন?

৪। ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল (আঃ) হযরত খাদিজাহ (রাঃ) এর জন্য নিয়মিত কি করতেন?

৫। সাইয়িদাতুন নিসা' কাকে বলা হয়?

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী সারা বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম চারজন মহিলার নাম লিখ।

৭। হযরত ফাতিমাহ (রাঃ) কোন্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?

৮। হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)-এর পিতা কে ছিলেন?

৯। কোন একজন মহীয়সী মুসলিম মহিলার নাম কর এবং তাঁর জীবন থেকে প্রকৃতই তোমার পছন্দনীয় এমন একটি বিষয়ের বর্ণনা দাও।

## ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। মহীয়সী মুসলিম মহিলা হযরত খাদীজাহ (রাঃ) ইসলামের জন্যে যে অবদান রাখেন সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)-এর বিশেষ গুণাবলী কি ছিল?

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত হযরত 'আয়েশাহ (রাঃ)-এর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

## একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম মহিলাদেরকে অনেক অধিকার দিয়েছেন এবং তাঁদের ওপর অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করেছেন। তাঁদের এ অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে মুসলিম পুরুষরা যে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব পোষণ করে সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদার সাথে ইসলামপূর্ব যুগের নারীদের মর্যাদার তুলনামূলক বৈপরীত্য উল্লেখ কর। নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে বর্তমানে যা কিছু ঘটছে তার সাথে সেই রূপান্তরকে কিভাবে তুলনা করা যায়?

## ছয় ঃ কয়েকজন নবী-রাসূলের (আঃ) কাহিনী

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

–"তাদের কাহিনীতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।" (সূরাহ ইউসুফ– ১২ ঃ ১১১)

### হযরত আদম (আঃ)

হাজার হাজার বছর আগের কথা। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তা ও জিনদের সামনে ঘোষণা করলেন যে, তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা
তাঁর 'ইবাদাত করবে এবং পৃথিবীর বুকে বসবাস করবে। তিনি বললেন ঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

–"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর বুকে আমার খলীফাহ (প্রতিনিধি) পাঠাব।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৩০)
তখন ফেরেশ্তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জিজ্ঞেস করল ঃ "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে বানাবেন যে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?" (সূরাহ্ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৩০) জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

–"নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৩০) তখন ফেরেশ্তারা চুপ হয়ে গেল।
আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদেরকে বললেন ঃ "আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। আমি যখন তাকে সুষম করব ও তাতে আমার রূহ্ ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো।" (সূরাহ্ ছাদ– ৩৮ ঃ ৭১-৭২)
আল্লাহ্ তা'আলা কাদামাটি দ্বারা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁকে সর্বোত্তম গঠনকাঠামো দিলেন। এরপর তিনি হযরত আদম (আঃ)কে সিজদাহ্ করার জন্যে ফেরেশ্তা ও জিনদের প্রতি হুকুম দিলেন।

ফেরেশ্তারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পালন করল। মূলতঃ ফেরেশ্তারা কখনোই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অমান্য করে না। কিন্তু জিন জাতির সদস্য ইবলীস হযরত আদম (আঃ)কে সিজদাহ করতে অস্বীকার করল (সূরাহ আল-কাহ্ফ– ১৮ ঃ ৫০)। আল্লাহ্

তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদাহ্ করা থেকে কোন্ জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে রাখল?" জবাবে ইবলীস বলল ঃ "আমি তার চেয়ে উত্তম; তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ।" (সূরাহ আল- আ'রাফ– ৭ ঃ ১২, সূরাহ আল-হিজ্র– ১৫ ঃ ৩২-৩৩)। বস্তুতঃ অহঙ্কারের কারণে সে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করল।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন ঃ "অতএব এখান থেকে বেরিয়ে যাও। অতঃপর নিশ্চিতভাবেই তুমি বিতাড়িত। আর নিশ্চিতভাবেই শেষবিচারের দিন পর্যন্ত তুমি অভিশপ্ত।" (সূরাহ আল-হিজ্র-১৫ ঃ ৩৪-৩৫)।

ইবলীস তখন এই বলে শপথ করল যে, সে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদেরকে গোম্রাহ (বিপথগামী) করবে। কিন্তু তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে গোম্রাহ হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে জ্ঞান ও ভালমন্দ পার্থক্য করার পথনির্দেশ (হেদায়াত) দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে কতগুলো নাম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশ্তাদেরকে ঐসব জিনিসের নাম বলতে বললেন। (সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ৩১) ফেরেশ্তারা বলল ঃ "সমস্ত গৌরব আপনার; আপনি আমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৩১)। আল্লাহ্ তা'আলা তখন হযরত আদম (আঃ)কে ঐসব জিনিসের নাম বলতে বললেন। আর তিনি সাথে সাথেই নামগুলো বলে দিলেন। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২ ঃ ৩৩)।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের উদ্দেশে বললেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ ও যমীনের গোপন রহস্যাদি অবগত আছি এবং তোমরা যা কিছু বল ও যা কিছু গোপন কর তা-ও অবগত আছি?" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৩৩)।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমকে (আঃ) বেহেশতে বসবাস করতে বললেন। সেখানে তাঁর প্রয়োজন পূরণ ও আনন্দের সকল উপকরণই ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন একা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর স্ত্রী হিসেবে হযরত হাওয়া ( حواء ) (আঃ)কে সৃষ্টি করলেন। ফলে হযরত আদম (আঃ) পুরোপুরি সুখে ছিলেন এবং হযরত হাওয়া (আঃ)সহ বেহেশতে বসবাস করতে লাগলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে বললেন ঃ "তুমি তোমার স্ত্রীসহ জান্নাতে বসবাস কর। এখানে যা খুশী স্বাধীনভাবে খাও, তবে ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৩৫)। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদেরকে পরীক্ষা করা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা এ-ও দেখতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে ইবলীসের ধোঁকা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে তাঁরা তা ব্যবহার করেন কিনা।

হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)কে গোম্‌রাহ্ করার জন্যে ইবলীস প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে সফল হল এবং তাঁদেরকে সেই নিষিদ্ধ ফল খাবার জন্যে প্রলোভন দিল।

হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) উক্ত গাছটির ফল খাওয়ার সাথে সাথেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা নগ্ন হয়ে পড়েছেন। এর আগে তাঁদের নগ্নতা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। ফলে এজন্য তাঁদের লজ্জিত হবারও কোন কারণ ছিল না। কিন্তু এখন তাঁরা লজ্জা অনুভব করলেন। তাই তাঁরা গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকার চেষ্টা করলেন এবং লুকিয়ে থাকারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে লুকিয়ে থাকা যেতে পারে এমন কোন জায়গাই তো নেই। (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭ ঃ (২০-২২)

আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাওয়ার ও দু'আ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৩৮-৩৯)। তখন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তাঁরা বললেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ ○

–"হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, এখন আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদেরকে দয়া না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (সূরাহ আল-আ'রাফ–৭ ঃ ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দু'আ কবুল করলেন ও তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)কে পৃথিবীতে নেমে যাবার ও সেখানে বসবাস করার আদেশ দিলেন।

তিনি তাঁদেরকে এ-ও জানালেন যে, পৃথিবীর বুকে তাঁরা যাতে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয় সেজন্য তাঁদের নিকট হেদায়াত পাঠাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট ওয়াহী মারফত হেদায়াত পাঠালেন। এভাবে তিনি হলেন পৃথিবীর বুকে প্রথম নবী।

বস্তুতঃ হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনীতে আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে।

## হযরত নূহ্ (আঃ)

হযরত আদম (আঃ)-এর পর শত শত বছর পার হয়ে গেল। তাঁর বংশধরদের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেল। সময়ের প্রবাহে হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধররা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গেল এবং তারা পাথরের তৈরী মূর্তির পূজা করতে লাগল। তারা খারাপ হয়ে গেল, মিথ্যা বলতে ও চুরি করতে লাগল এবং সংকীর্ণমনা ও লোভী হয়ে পড়ল।

এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আঃ)কে নবী করে তাদের কাছে পাঠালেন। হযরত নূহ্ (আঃ) তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে তাওহীদে ফিরে আসা ও আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করার জন্যে আহ্বান করলেন। তিনি তাদেরকে অন্যান্য পাপকর্মও পরিত্যাগ করতে বললেন। তিনি তাদেরকে শেষবিচারের দিনের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। (সূরাহ আল-আ'রাফ– ৭ ঃ ৫৯-৬৪)।

হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর জাতির লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাতের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে বহুবছর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় নি। বরং তারা তাঁকে উপহাস ও বিদ্রুপ করল এবং তাঁর প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণা প্রকাশ করল। এমন কি তারা তাঁকে উন্মাদ ও মিথ্যাবাদী বলল। (সূরাহ আশ-শূ'আরা- ২৬ ঃ ১০৫, সূরাহ আল- জাছিয়াহ– ৪৫ ঃ ৯)।

হযরত নূহ্ (আঃ) ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন (সূরাহ আল-'আনকাবুত– ২৯ ঃ ১৪)। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে খুব অল্প সংখক লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিল। এমন কি তাঁর স্ত্রী ও পুত্র তাঁর ওপর ঈমান আনে নি।

হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর জাতির লোকদের পাষাণহৃদয় অবস্থা ও আচরণে মনে খুবই কষ্ট পান ও তাদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েন। সত্যের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তারা এতই কঠোরতার আশ্রয় নেয় যে, শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ্ (আঃ) তাদের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন ঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○

–"হে আমার রব! এই ধরণীর বুকে একজন কাফিরকেও অবশিষ্ট রেখো না।" (সূরাহ আন-নূহ্– ৭১ ঃ ২৬)।

হযরত নূহ্ (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করলেন ঃ "আমি পরাভূত হয়েছি, অতএব, আমাকে সাহায্য কর।" (সূরাহ্ আল-কামার-৫৪ ঃ ১০) এছাড়া তিনি তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন (সূরাহ্ আশ-শূ'আরা-২৬ ঃ ১১৮)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আঃ)-এর দু'আ কবুল করেন এবং তাঁকে একটি জাহাজ বানাবার নির্দেশ দেন। সূরাহ্ হূদ- ১১ ঃ ৩৭) হযরত নূহ্ (আঃ) একটি বড় আকারের (কাঠের) জাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু হযরত নূহ্ (আঃ) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে জাহাজ তৈরীর কাজ অব্যাহত রাখলেন।

লোকেরা যখন হযরত নূহ্ (আঃ)কে জাহাজ তৈরী করতে দেখল তখন তারা তাঁকে উপহাস ও বিদ্রুপ করতে লাগল। তারা মনে করল যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। কারণ তারা সমুদ্র থেকে শত শত মাইল দূরে এত বড় একটা জাহাজ নির্মাণের পিছনে কোনই যুক্তি খুঁজে পেল না। (সূরাহ্ হূদ- ১১ ঃ ৩৮)

তারা জিজ্ঞেস করল ঃ "এ জাহাজ কি জন্য?" অবশ্য তাদের প্রশ্নের জবাব স্বচক্ষে দেখার জন্যে তাদের খুব বেশী দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার পরিকল্পনা ছিল এই যে, তিনি পৃথিবীকে কাফিরদের অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করবেন এবং কেবল হযরত নূহ্ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান পোষণকারী ও তাঁকে সাহায্যকারীদের বাঁচিয়ে রাখবেন।

হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর প্রতি উপহাসকারীদেরকে বললেন যে, খুব শীঘ্রই এক মহাপ্লাবন হবে এবং তখন তারা আশ্রয় নেয়ার মত কোন জায়গা পাবে না। এতে লোকেরা আরো বেশী হাসাহাসি করল। কিন্তু খুব শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করলেন এবং কাফিররা স্বচক্ষে তা ঘটতে দেখল।

অনেক দিন যাবত কঠোর পরিশ্রমের ফলে জাহাজ তৈরীর কাজ শেষ হল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আঃ)কে সকল প্রকার পশু-পাখীর এক জোড়া (একটি নারী ও একটি পুরুষ) করে জাহাজে তুলে নেয়ার জন্যে বললেন। তিনি তা-ই করলেন এবং এরপর তিনি ও তাঁর অনুসারীরা জাহাজে উঠলেন। (সূরাহ হূদ- ১১ ঃ ৪০-৪১)

হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে গেল। বজ্রপাতসহ বৃষ্টি শুরু হল। আকাশ থেকে যেমন বৃষ্টি ঝরতে লাগল তেমনি মাটির নীচ থেকেও পানি উঠে আসতে লাগল। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই; গোটা ভূভাগই প্লাবিত হয়ে গেল। জাহাজে যারা ছিল তারা বাদে ভূভাগের সকল প্রাণশীল সৃষ্টিই প্লাবনের পানিতে ডুবে গেল। আর জাহাজটি পানিতে ভেসে থাকল। (সূরাহ আল-কামার -৫৪ ঃ ১১-১৫)

প্লাবনের পানি দীর্ঘ পাঁচ মাস পর্যন্ত থাকল। প্লাবনের ফলে কাফিরদের সকলেই ধ্বংস ও নিশ্চহ্ন হয়ে গেল। এমন কি হযরত নূহ্ (আঃ)-এর পুত্র কাফির ছিল বলে সে-ও রক্ষা পেল না।

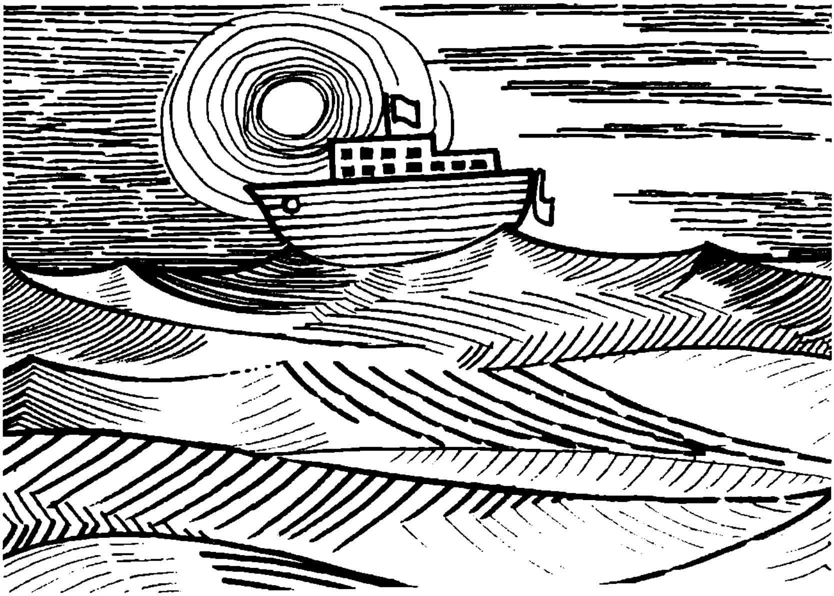

হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর পুত্রকে জাহাজে তুলে নেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেন যে, কাফির পুত্র তাঁর পরিবারের সদস্য নয়। তখন হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর পুত্রকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করার ব্যাপারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চান। হযরত নূহ্ (আঃ) ও তাঁর অনুসারীরা জাহাজে পুরোপুরি নিরাপদে থাকলেন। (সূরাহ হূদ– ১১ ঃ ৪৫-৪৭)

শেষ পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার হতে থাকল এবং হযরত নূহ্ (আঃ)-এর জাহাজ (তুরস্কের) জুদী পাহাড়ে ঠেকল। হযরত নূহ্ (আঃ) ও তাঁর অনুসারীরা জাহাজ থেকে নেমে এলেন। (সূরাহ হূদ– ১১ ঃ ৪৪) এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে রক্ষা করলেন। (সূরাহ আল-'আনকাবুত-২৯ ঃ ১৫)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আঃ)-এর বংশধরদেরকে উন্নতি-অগ্রগতি ও ব্যাপক বংশবৃদ্ধি দান করেন। তারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। (সূরাহ হূদ-১১ ঃ ৪৮)

কাফিরদেরকে এভাবেই ভয়াবহ আযাবে নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে বলেন ঃ "যারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল আমরা তাদেরকে ডুবিয়ে মেরেছি। নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।" (সূরাহ্ আল-আ'রাফ- ৭ ঃ ৬৪) হযরত নূহ্ (আঃ)-এর কাহিনীতে আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে অমান্য করার পরিণতি হচ্ছে সর্বাত্মক ধ্বংস।

## হযরত ইবরাহীম (আঃ)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় নবী-রাসূলগণের (আঃ) অন্যতম। তিনি 'খালীলুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র বন্ধু' হিসেবে সুপরিচিত। (সূরাহ আন-নিসা'-৪ ঃ ১২৫) তিনি ছিলেন বর্তমান ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম ছিল আযার। আযার মূর্তি তৈরী ও বিক্রি করত।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এলাকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। তারা একটি মন্দিরে অনেকগুলো মূর্তি তৈরী করে রেখেছিল এবং সেগুলোকেই পূজা করছিল।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) অত্যন্ত বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন। পাথরের তৈরী যে মূর্তিগুলো না নড়াচড়া করতে পারে, না কথা বলতে পারে, লোকেরা সেগুলোর সামনে নত হয় দেখে তাঁর বড়ই আশ্চর্য লাগত। মূর্তিগুলো এমন কি তাদের চোখ বা নাকের ওপর বসা মাছি পর্যন্ত তাড়াতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ভেবে অবাক হতেন যে, লোকেরা বোকার মত এহেন অক্ষম মূর্তিগুলের পূজা করছে কেন!

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসন্ধিৎসু মন আল্লাহ্ তা'আলার সন্ধান করছিল। তিনি শুধু চিন্তা করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি রাতের আকাশে তারকা দেখে মনে করলেন এই বুঝি তাঁর রব। কিন্তু তারকা অস্ত গেলে তিনি নিজ মনে বললেন ঃ "না, যে জিনিস অস্ত যায় তা আমার রব হতে পারে না।" অর্থাৎ তারকা তাঁর রব নয়। এরপর আলোকোজ্জ্বল চাঁদ দেখে তাঁর মনে হল যে, এ-ই বুঝি তাঁর রব। কিন্তু চাঁদ যখন ডুবে গেল তখন তিনি বুঝলেন যে, এ-ও তাঁর রব নয়। এরপর তিনি সূর্যের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "এটা সব চেয়ে বড়, এটাই আমার রব।" কিন্তু সূর্য যখন অস্ত গেল তখন তিনি নিজ মনে বললেন, "না, এ আমার প্রভু হতে পারে না।" অতঃপর তিনি এ উপসংহারে পৌঁছলেন যে, কেবল চিরজীবী চিরস্থায়ী সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর রব। তারকারাজি, চাঁদ ও সূর্য তাঁর রব হতে পারে না। (সূরাহ আল-আন'আম- ৬ ঃ ৭৬-৭৯)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) একবার তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আমার পিতা!

আপনি কেন মূর্তির পূজা করেন যা কথা বলতে পারে না, শুনতেও পায় না?" এতে আযার রেগে যায় এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে এ ধরনের প্রশ্ন না করার জন্যে সাবধান করে দেয়। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) মনে মনে ঠিক করলেন যে, লোকদেরকে বুঝিয়ে দেবেন, মূর্তিপূজা এক চরম বোকামীর কাজ। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, লোকদেরকে বাস্তব অভিজ্ঞতা দানের মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন।

একদিন লোকেরা যখন একটি উৎসবে ব্যস্ত ছিল তখন যে মন্দিরে মূর্তিগুলো রাখা ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ) সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি মূর্তিগুলোকে বললেন ঃ "কি খবর তোমাদের? এখানে খাদ্য-পানীয় আছে; এগুলোর সদ্ব্যবহার করছ না কেন?" বলা বাহুল্য যে, পাথরের মূর্তিগুলো নীরবই থাকল। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) একটা কুঠার নিয়ে বড় মূর্তিটা ছাড়া বাকী সবগুলো মূর্তিকেই ভেঙ্গে ফেললেন। তিনি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বড় মূর্তিটিকে রেহাই দিলেন। তিনি অন্য মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গার পর কুঠারটি বড় মূর্তিটার ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। (সূরাহ আল-আম্বিয়া'– ২১ ঃ ৫৮)

লোকেরা উৎসব থেকে ফিরে এসে মূর্তিগুলোর পূজা করার জন্যে মন্দিরে প্রবেশ করল। কিন্তু তারা তাদের দেবদেবীদের করুণ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। তারা স্তম্ভিত, মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। "এ জঘন্য কাজ কে করল?" তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল। তারা সকলেই বুঝতে পারল যে, এ কাজ হযরত ইবরাহীমের (আঃ)। কারণ, তারা এর আগে তাঁকে তাদের দেবমূর্তিগুলো সম্বন্ধে বেপরোয়া কথাবার্তা বলতে শুনেছিল।

তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে জিজ্ঞেস করল ঃ "মূর্তিগুলো কে ভেঙ্গেছে?" তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন ঃ "বড়টাকে জিজ্ঞেস কর।" লোকেরা তো জানতই যে, মূর্তি কথা বলতে পারে না। তাই তারা বলল ঃ " হে ইবরাহীম! তুমি কি জান না যে, মূর্তিরা কথা বলতে পারে না?" তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ "তাহলে তোমরা ওগুলোর পূজা কর কেন? ওগুলো কথা বলতে, নড়াচড়া করতে বা কিছু বুঝতে পারে না। কেন তোমরা তাদের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর?"

লোকদের কাছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথার জবাব দেয়ার মত কোন যুক্তি ছিল না। তবে তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)ই মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছেন।

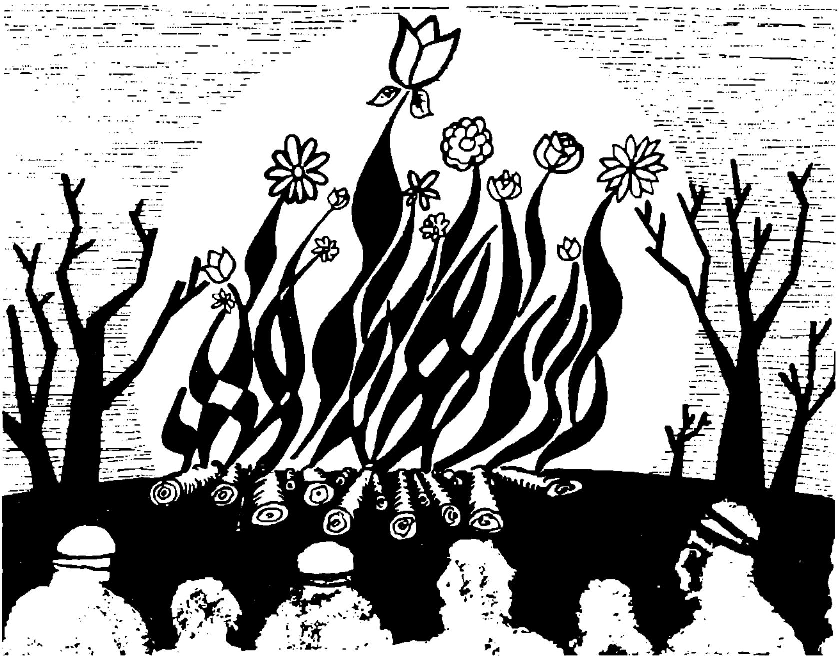

কিন্তু তাদের পক্ষে বিষয়টি এমনি ছেড়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। তারা একটা সভা ডাকল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে। এভাবে তারা তাদের দেবদেবীদের রক্ষা করার উদ্যোগ নিল। (সূরাহ্ আল-আম্বিয়া'– ২১ ঃ ৫৯-৬৮)

অবশ্য হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করেন। ফলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় তিনি ক্ষতি থেকে রক্ষা পান। কারণ তিনি সঠিক কাজই করেছিলেন।

কাফিররা একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে তাতে নিক্ষেপ করে। কিন্তু সাথে সাথেই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। আগুন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে পোড়াল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করলেন। লোকেরা তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরূপই ঘটল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিরাপদ থেকে গেলেন। আর যারা তাঁকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল তারা হতাশ ও দুঃখিত হল এবং নিজেদেরকে অসহায় অনুভব কতে লাগল। (সূরাহ্ আল-আম্বিয়া'-২১ ঃ ৬৯-৭০)

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে সত্যের জ্যোতি প্রদান করলেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও রাসূল। (সূরাহ আন-নাহ্ল-১৬ ঃ ১২০-১২২, সূরাহ মার্ইয়াম-১৯ ঃ ৪১) তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্র হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)কে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই প্রস্তুতিকেই কবুল করে নেন এবং হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে কুরবানী করার জন্যে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দেন। (সূরাহ আছ-ছাফ্ফাত- ৩৭ ঃ ১০১-১০৭)

আমরা এ ঘটনার স্মরণে প্রতি বছর 'ঈদুল আয্হা উদ্যাপন করে থাকি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)ই তাঁর পুত্র হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)-এর সহায়তায় মক্কায় কা'বাহ্ ঘর নির্মাণ করেন। (সূরাহ আল-হাজ্জ- ২২ ঃ ২৬-২৭, সূরাহ আল-বাকারাহ-২ ঃ ১২৫-১২৯, সূরাহ ইবরাহীম-১৪ ঃ ৩৫-৩৭)

## হযরত মূসা (আঃ)

মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নবী ও রাসূল ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। তাঁর পিতার নাম ছিল 'ইমরান। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ৪৫০ বছর পর মিসরে হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। ঐ সময় মিসরে রাজাদেরকে ফির'আউন বলা হত।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা হযরত ইয়াকূব (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নাতী। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল। একারণে তাঁর বংশধরদেরকে বানূ ইসরাঈল বলা হয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সময় থেকে বানূ ইসরাঈল মিসরে বসবাস করছিল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্মের সময় ও তার আগে যে ফির'আউন মিসরে রাজত্ব করত সে বানূ ইসরাঈলকে বিদেশী হিসেবে গণ্য করত এবং তাদের সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করত। সে ভয় করছিল যে, বানূ ইসরাঈলের জনসংখ্যা হয়ত এক সময় খুবই বেশী হয়ে যাবে, ফলে তারা মিসরে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই ফির'আউন বানূ ইসরাঈলের যে কোন পরিবারে কোন পুরুষ শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে সাথে সাথে হত্যা করার জন্যে নির্দেশ দেয়। (সূরাহ আল-কাছাছ- ২৮ ঃ ৪-৬)

বানূ ইসরাঈলের এ কঠিন সময়ে হযরত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা তাঁকে তিনমাস লুকিয়ে রাখেন। এরপর যখন আর তাঁর পক্ষে তাঁকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে একটি পন্থা জাগিয়ে দিলেন। তখন তিনি হযরত মূসা (আঃ)কে এমন একটি ঝুড়ির মধ্যে রাখলেন যাতে পানি প্রবেশ করে না। এরপর তিনি ঝুড়িটিকে নীল নদের পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। (সূরাহ তা-হা– ২০ ঃ ৩৮-৩৯) এরপর কি ঘটে তা দেখার জন্যে তিনি তাঁর মেয়ে মার্ইয়ামকে নযর রাখতে বললেন। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে সেজন্যে মার্ইয়াম দূর থেকে ঝুড়িটির প্রতি নযর রাখতে লাগলেন (সূরাহ আল-কাছাছ– ২৮ ঃ ১১)।

ঝুড়িটি ভাসতে ভাসতে নদীর অপর তীরে গিয়ে ঠেকল। তখন ফির'আউনের পরিবারের একজন সদস্য ঝুড়িটি তুলে নিল এবং এর মধ্যে একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হল। সে মূসা (আঃ)কে ফির'আউনের স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল।

ফির'আউনের স্ত্রী শিশু মূসা (আঃ)কে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন (সূরাহ আল-কাছাছ– ২৮ ঃ ৮-৯)। এ সময় হযরত মূসা (আঃ)-এর বোন মার্ইয়াম ফির'আউনের প্রাসাদে গেলেন এবং বললেন যে তাঁর জানামতে এমন একজন মহিলা আছেন যিনি শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন। আসলে মার্ইয়াম তাঁর মায়ের কথাই বলছিলেন (সূরাহ আল-কাছাছ-২৮ ঃ ১২)। ফির'আউনের স্ত্রী এতে রাযী হওয়ায় হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়া হল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাকে চান এভাবেই রক্ষা করেন।

হযরত মূসা (আঃ) ফির'আউনের ঘরেই বড় হলেন। তিনি পূর্ণ যুবক হবার পর একদিন তিনি দেখতে পেলেন যে, একজন মিসরীয় একজন ইসরাঈলীকে প্রহার করছে। তখন হযরত মূসা (আঃ) ইসরাঈলীর পক্ষ নিয়ে মিসরীয় লোকটিকে ঠেকাবার জন্যে তাকে একটা ঘুষি মারলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে মিসরীয় লোকটি মারা গেল। (সূরাহ আল-কাছাছ– ২৮ ঃ ১৫)

হযরত মূসা (আঃ) ফির'আউনের রাজত্ব ছেড়ে অনেক দূরে মাদ্ইয়ানে চলে গেলেন। (সূরাহ আল-কাছাছ– ২৮ ঃ ২২-২৮) সেখানে তিনি দশ বছর থাকেন। এরপর তিনি সীনাই পাহাড়ের পাদদেশে তুওয়া উপত্যকায় গিয়ে পৌছেন। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওয়াহী নাযিল হয় এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। (সূরাহ আল-কাছাছ– ২৮ ঃ ৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)কে দু'টি মু'জিযাহ দান করেন। একটি মু'জিযাহ ছিল এই যে, তিনি তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে রাখলে তা একটি জীবন্ত অজগরে পরিণত হয়ে যেত। দ্বিতীয়টি এই যে, তিনি তাঁর হাত বগলে নিয়ে বের করে আনলে তা আলোর মত ঝলমল করত। (সূরাহ তা-হা– ২০ ঃ ১৭-২২)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)কে ফির'আউনের নিকট গিয়ে তাকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্যে আদেশ দেন। (সূরাহ তা-হা– ২০ ঃ ৪২-৪৪) তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হযরত হারূন (আঃ)কে তাঁর সহযোগী হিসেবে মনোনীত করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আবেদন কবুল করেন। (সূরাহ তা-হা– ২০ ঃ ২৪-৩৬)

হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) ফির'আউনের কাছে গেলেন। তাঁরা তাকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন এবং ইসরাঈলীদেরকে মুক্তিদানের জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ফির'আউন তাঁদের দাওয়াত ও অনুরোধ উভয়ই প্রত্যাখ্যান করল (সূরাহ তা-হা– ২০ ঃ ৪৭-৫৪, সূরাহ আশ-শু'আরা'– ২৬ ঃ ১৬-১৭)। শুধু তা-ই নয়, সে হযরত মূসা (আঃ)কে ঠাট্টাবিদ্রুপ করল।

তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর বাণীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে ফির'আউনকে মু'জিযাহ দেখালেন। তিনি তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিলেন। সাথে সাথে তা একটা

অজগরে পরিণত হল। হযরত মূসা (আঃ) আবার সেটিকে হাতে তুলে নিলেন ও সাথে সাথে তা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গ ঘটনা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু ফির'আউন হযরত মূসা (আঃ)কে একজন যাদুকর মনে করল এবং তার অনুগত যাদুকরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানাল। ফির'আউনের ধারণা ছিল যে, তার অনুগত যাদুকররা আরো বেশী জমকালো যাদু দেখাতে পারবে। (সূরাহ আশ-শু'আরা'– ২৬ ঃ ২৩-৩৭)

নির্দিষ্ট দিনে ফির'আউনের অধীনস্থ যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে মোকাবেলা করতে এল। কিন্তু তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। যাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিকে কৃত্রিম সাপে পরিণত করল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি সাপে পরিণত হয়ে সেগুলোকে খেয়ে ফেলল। ফির'আউন ও তার যাদুকরদের পক্ষে এটা বিশ্বাস করাই কঠিন ছিল। কিন্তু যাদুকররা সত্যের সামনে নতি স্বীকার কলল এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনল ও ঈমানের কথা ঘোষণা করল। (সূরাহ্ আশ-শু'আরা'– ২৬ ঃ ৩৮-৪৭)

এতে ফির'আউন রেগে গেল এবং সে বানূ ইসরা'ঈলের ওপর আগের চেয়েও বেশী জুলুম-অত্যাচার করতে লাগল।

ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মিসর ত্যাগের জন্যে আদেশ দিলেন। (সূরাহ তা-হা– ২০ ঃ ৭৭) হযরত মূসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের প্রস্তুত হতে বললেন। এরপর তাঁরা রাতের বেলা ফির'আউনের অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা সাগরের তীরে এসে পৌঁছেন।

এদিকে ফির'আউন তাঁদের মিসর ত্যাগের কথা জানতে পেরে তার সৈন্যসামন্তসহ তাঁদেরকে পিছু ধাওয়া করে। তারা ইসরাঈলীদেরকে প্রায় ধরে ফেলে আর কি! এদিকে তাঁদের সামনে রয়েছে বিশাল সমুদ্র। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর হাতের লাঠিটি সাগরের পানিতে ফেলতে বললেন। তিনি লাঠিটি পানিতে ফেলতেই সাগরের পানি দু'ভাগ হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে ইসরাঈলীদের সাগর পার হওয়ার জন্যে একটি পথ তৈরী হয়ে গেল। (সূরাহ্ আশ-শু'আরা'– ২৬ ঃ ৫২-৬৫)

ফির'আউন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের পিছু ধাওয়া অব্যাহত রাখল। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে সাগরের অপর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। ফির'আউন ও তার সৈন্যরা তখনো সাগরের মাঝখানে ছিল। হঠাৎ দুই দিকের পানি এসে তাদেরকে তলিয়ে ফেলল। ফির'আউন ও তার সৈন্যরা সবাই সাগরে ডুবে মারা গেল। (সূরাহ আশ-শু'আরা'– ২৬ ঃ ৬৬) আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দেন ও তাঁর অনুগত বান্দাহদেরকে সাহায্য করেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা বানূ ইসরাঈলের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তারা ছিল খুবই অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমসমূহ অমান্য করে, নবীদেরকে (আঃ) বিদ্রুপ করে, এমন কি কোন কোন নবীকে (আঃ) হত্যা করে। তারা মূর্তিপূজা শুরু করে এবং আল্লাহ্র বাণীকে বিদ্রুপ করে।

এ অবস্থায় দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে আরেকজন নবী পাঠালেন। তিনি হলেন হযরত মার্ইয়াম (আঃ)-এর পুত্র হযরত 'ঈসা (আঃ)। (সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ৮৭) আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর ওপর আসমানী কিতাব ইন্‌জীল নাযিল করেন এবং তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব তাওরাহর সত্যতা স্বীকার করেন। (সূরাহ আল-মায়িদাহ- ৫ ঃ ৪৬, সূরাহ আছ-ছাফ-৬১ ঃ ৬)

হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা। তিনি আল্লাহ্র হুকুমে পিতা ছাড়াই কুমারী হযরত মার্ইয়াম (আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (সূরাহ মার্ইয়াম- ১৯ ঃ ১৭-২১) আল্লাহ্ যা চান, তা-ই করতে পারেন। তাঁর জন্যে সব কিছুই সম্ভব। তিনি যখন কোন কিছু করতে চান তখন তিনি শুধু বলেন, "হও", আর অমনি তা হয়ে যায়। (সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ১১৭)

আমরা জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি যে হযরত 'ঈসা (আঃ)কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এতে অবাক হবার কিছুই নেই।

হযরত 'ঈসা (আঃ) শিশু থাকাকালেই কথা বলতে পারতেন। তার বয়স যখন ৩০ বছর তখন তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তিন বছর নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (সূরাহ মার্ইয়াম- ১৯ ঃ ২৯-৩৪)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা (আঃ)কে কতগুলো মু'জিযাহ দিয়ে-ছিলেন। তিনি মাটি থেকে পাখী বানাতে পারতেন যা জীবন পেয়ে উড়ে যেত। তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সারিয়ে দিতেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং মৃতকেও জীবিত করতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এসব অলৌকিক কাজ করতেন।

কুর'আন মজীদের সূরাহ আলে 'ইমরানে হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও অলৌকিক ক্ষমতাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

-"আর (স্মরণ কর) যখন ফেরেশ্‌তারা বলল ঃ হে মার্ইয়াম আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক

বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম আল-মাসীহ্–মার্‌ইয়ামপুত্র 'ঈসা। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে মহাসম্মানের অধিকারী এবং (আল্লাহ্‌র) ঘনিষ্ঠদের অন্যতম। তিনি দোলনায় থাকাকালে লোকদের সাথে কথা বলবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায়ও (কথা বলবেন)। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্যতম।

সে (মার্‌ইয়াম) বলল ঃ হে আমার রব! কি করে আমার সন্তান হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নি! তিনি (আল্লাহ্) বললেন ঃ এভাবেই (হবে যে,) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হও, আর অমনি তা হয়ে যায়।

আর তিনি (আল্লাহ্) তাঁকে কিতাব, হিক্‌মাহ (পরম জ্ঞান), তাওরাহ ও ইন্‌জীল শিক্ষা দেবেন। আর বানি ইসরাঈলের নিকট তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠাবেন।

সে ('ঈসা) বলল ঃ নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শনাদিসহ তোমাদের নিকট এসেছি। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করি, অতঃপর তাতে ফুঁক দেই, তারপর তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে পাখী হয়ে যায়। আর আমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দেই, আর মৃতকে জীবিত করে দেই আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে। আর তোমরা যা খেয়ে আস এবং তোমরা যা ঘরে রেখে আস আমি তা তোমাদেরকে বলে দেই। এতে অবশ্যই তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, (এ মু'জিযাহসমূহ এজন্য যে,) যাতে আমি আমার পূর্ব থেকে বিদ্যমান তাওরাহর সত্যায়ন করি এবং যাতে তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এমন কতক জিনিসকে হালাল করে দেই। আর আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের কতক নিদর্শনসহ এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদেরও রব। অতএব, তাঁরই 'ইবাদাত কর। এটাই সহজ সরল পথ।" (সূরাহ আলে 'ইমরান–৩ ঃ ৪৫-৫১)

হযরত 'ঈসা (আঃ) লোকদেরকে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার জন্যে দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর কতক অনুসারী তাঁর সম্পর্কে উদ্ভট কল্পকাহিনী তৈরী করে এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র অংশ বলে গণ্য করে, এমন কি তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলেও দাবী করে। (সূরাহ আল-মায়িদাহ– ৫ ঃ ১১৬-১১৭)

মুসলমানরা হযরত 'ঈসা (আঃ)কে একজন রাসূল এবং আল্লাহ্‌র বান্দাহ বলে বিশ্বাস করে। (সূরাহ আয-যুখরূফ–৪৩ ঃ ৫৯)। তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মনে করে না। আল্লাহ্ তা'আলার কোন পুত্র বা কন্যা নেই। তিনি কোন সৃষ্ট প্রাণীর মত নন। তিনিই সব

কিছুকে ও সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এক এবং তিনি অবিভাজ্য। ইসলামে কোন ত্রিত্ববাদী (Trinity) ধারণা নেই। (সূরাহ আন-নিসা'- ৪ ঃ ১৭১)। ত্রিত্ববাদ সুস্পষ্ট শির্ক। কাউকে আল্লাহ্র পুত্র বলে অভিহিত করাকে মুসলমানরা বিরাট পাপ (কবিরা গুনাহ) বলে বিশ্বাস করে। (সূরাহ আল-মায়িদাহ- ৫ ঃ ১৭, সূরাহ মার্ইয়াম- ১৯ ঃ ৩৫)

কুর'আন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী, হযরত 'ঈসা (আঃ)কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় নি। বরং সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তুলে নিয়েছেন। (সূরাহ আন-নিসা'- ৪ ঃ ১৫৭-১৫৮)। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। তিনিই তো হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে আগুন থেকে এবং হযরত মূসা (আঃ)কে ফির'আউনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সমগ্র বিশ্বলোকের এবং এতে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই।

## অনুশীলনী (৬ ঃ ক)

### ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। মানুষের আগে পৃথিবীর বুকে কারা বা কি বসবাস করত?

২। হযরত আদম (আঃ) কে ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা কেন তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন?

৩। হযরত হাওয়া (আঃ) কে ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা কেন তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন?

৪। হযরত আদম(আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) প্রথমে কোথায় বাস করতেন?

৫। কে হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে সিজ্দাহ্ করতে অস্বীকার করেছিল এবং কেন?

৬। হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশ্তে থাকাকালে কি ভুল করেছিলেন?

৭। হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) শয়তানের প্রতারণার শিকার হবার পর যে দু'আ করেছিলেন তা লিখ।

৮। কেন হযরত নূহ্ (আঃ) একটি জাহাজ তৈরী করেছিলেন?

৯। যে সব লোক হযরত নূহ্ (আঃ)-এর কথা শোনে নি তাদের কি হয়েছিল?

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে কুর'আন মজীদ কি বলছে?

২। তোমার মতে ইবলীস হযরত আদম (আঃ)কে সিজ্দাহ্ করতে অস্বীকার করেছিল কেন?

৩। হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)কে বেহেশতে বসবাসের জন্যে পাঠানোর পর তাঁদের কি হয়েছিল? বর্ণনা কর।

৪। হযরত নূহ্ (আঃ)-এর জাহাজের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাঁর পুত্রের ভাগ্যে যা ঘটল তার মধ্য দিয়ে হযরত নূহ্ (আঃ) কোন্ কঠিন শিক্ষা পেলেন?

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৬-১৮ বছর)

১। পাপের সূচনা, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা এবং নারী-পুরুষের সমতা প্রসঙ্গে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী থেকে আমরা কোন্ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি?

২। "প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক লোক মারা যায়, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তি হিসেবে বিচার করা হয়।" এ উক্তিটি নিয়ে আলোচনা কর।

৩। আমাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সৃষ্টি সংক্রান্ত ইসলামী ধারণা এবং পদার্থবিদ ও বিবর্তনবাদীদের দ্বারা উদ্ভাবিত তত্ত্বের মধ্যকার অমিল সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।

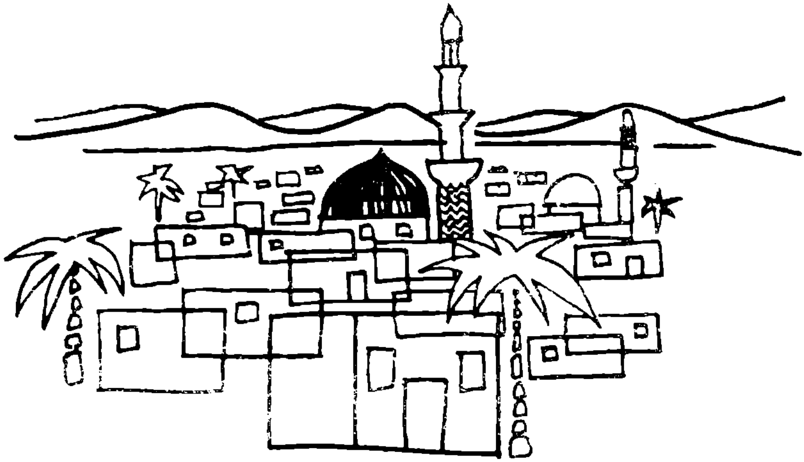

১। ‘খালীলুল্লাহ’ কে ছিলেন এবং এ নামটির অর্থ কি?

২। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম কি?

৩। মূর্তিপূজা সম্পর্কে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে কি বলেছিলেন?

৪। হযরত ইবরাহীম (আঃ) উৎসবের দিনে কি করেছিলেন?

৫। আগুন কি হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে পুড়িয়েছিল? এ ঘটনা থেকে আল্লাহ্ তা‘আলার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পাও?

৬। হযরত মূসার (আঃ) জীবনের মু‘জিযাহ্গুলোর তালিকা তৈরী কর।

[illegible] শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। মূর্তিপূজারীদের আগুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পুড়ে গেলেন না– এ ঘটনার কি গুরুত্ব ছিল?

২। মুসলমানরা মূর্তিপূজাকে বোকামী ও অযৌক্তিক মনে করেন কেন?

৩। “হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবন ছিল এক ধরনের প্রকৃত কুরবানী।” তাঁর জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

৪। হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করে প্রমাণ কর যে, কিভাবে তাঁর ঈমানকে পরীক্ষা করা হয়েছিল? বর্তমানে মুসলমানদেরকে কিভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার উদাহরণ দাও।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। “ফির‘আউনের কাহিনীতে বর্তমান যুগের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এবং উদ্ধত-দাম্ভিক শক্তি একটি জাতিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তারও পরিষ্কার চিত্র ধরা পড়েছে।” এ উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)কে রক্ষা করেন। তোমার মতে, আল্লাহ্ তা‘আলা সকল মহান শহীদকে রক্ষা করেন না কেন? আল্লাহ্র ন্যায়বিচার ও আখিরাতে ঈমান রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। হাজ্জের অনুষ্ঠানের সাথে ইবরাহীমের (আঃ) কাহিনীর সম্পর্ক কি?

## অনুশীলনী ( ৬ ঃ গ)

### ৫ম-৮ম শ্রেণী (১১-১৪ বছর)

১। হযরত 'ঈসা (আঃ)কে ছিলেন?

২। হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর মাতা কে ছিলেন? হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর জন্মের কাহিনী সংক্ষেপ লিখ।

৩। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর ওপর কোন্ কিতাব নাযিল করেছিলেন?

৪। হযরত 'ঈসা (আঃ)কে কি ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল? তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর।

৫। হযরত 'ঈসা (আঃ) কোন্ দিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন?

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। "হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর জীবনে বহু বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একজন মানুষই ছিলেন।" এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ কর।

২। হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা কি ছিল? তিনি কি তাঁর অনুসারীদের তাঁর পূজা করতে বলেছিলেন?

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। তাওহীদের তত্ত্ব ও ত্রিত্ববাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। তুমি কি এ দুই তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারবে? তোমার যুক্তিগুলো উল্লেখ কর।

২। "রিসালাহ হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্র মাঝে যোগাযোগের চ্যানেল।" এ বিষয়ে আলোচনা কর।

৩। যদিও ইসলাম শির্কের পুরোপুরি বিরোধী, তথাপি তুমি কি কুর'আন থেকে এমন কিছু শিক্ষা নির্দেশ করতে পার যাতে কতক খৃস্টানের প্রশংসা রয়েছে?

# সাত ঃ শারী'আহ (ইসলামী আইন)

শারী'আহ হচ্ছে ইসলামী জীবনব্যবস্থার আইন-কানুন। 'শারী'আহ' শব্দের মানে হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট সোজা পথ বা দৃষ্টান্ত। শারী'আহ হচ্ছে মানুষের অনুসরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বোত্তম আইন-ব্যবস্থা।

শারী'আহ বা ইসলামী আইন হচ্ছে মুসলমানদের জন্য আচরণবিধি। দু'টি প্রধান সূত্রের ওপর ভিত্তি করে এসব আচরণবিধি তৈরী করা হয়েছে। এ দু'টি সূত্র হচ্ছে কুর'আন ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ। শারী'আহর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির জন্যে পৃথিবীর জীবনে ও পরকালের জীবনে সাফল্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সমাজে যাতে যা কিছু উত্তম (মারূফ) তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং যা কিছু মন্দ (মুনকার) তা যাতে সমাজ থেকে উৎখাত হয়ে যায় সে উদ্দেশ্যে মানুষকে পথনির্দেশ দেয়ার জন্যে শারী'আহ প্রয়োজনীয় সকল আইন-কানুন দিয়েছে। শারী'আহ এমন একটি সুস্পষ্ট ও সোজা পথ দিয়েছে যা মানুষকে জীবনে উন্নতি অগ্রগতি ও পরিপূর্ণতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে নিয়ে যায়।

কুর'আন হচ্ছে শারী'আহর মূল ভিত্তি। কুর'আন মজীদে শারী'আহর মূলনীতি নিহিত রয়েছে। অন্যদিকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নায় এসব মূলনীতি বাস্তবায়নের নীলনক্সা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, কুর'আন বলেছে ঃ ছালাত কায়েম কর, ছাওম পালন কর, যাকাত দাও, পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নাও, হারাম পথে অর্থ উপার্জন বা ব্যয় করো না– কিন্তু এগুলো কিভাবে করতে হবে তা কুরআনে বলা হয়নি। আমরা কিভাবে আল্লাহ্র হুকুমসমূহ বাস্তবে কার্যকরী করব তা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নায় বলা হয়েছে।

কুর'আন মজীদ হচ্ছে হেদায়াতের মূল কিতাব, আর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এ হেদায়াত অনুসরণের পন্থা শিখিয়ে দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে কেবল হেদায়াত অনুসরণ করতে বলেন নি, বরং তিনি নিজে তার চর্চা করেছেন। তিনি নিজে যা 'আমল করতেন তা-ই তাঁর অনুসারীদের করতে বলতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন ছিল জীবন্ত কুর'আন ।

মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যেই শারী'আহর বিধিবিধান রয়েছে। শারী'আহ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ আইন-বিধান। এর অনুসরণের ফলে এ পৃথিবীর জীবনে ও আখিরাতে সাফল্য, কল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিত হয়।

শারী'আহ্ ও মানুষের তৈরী আইনের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঃ

| মানুষের আইন | [illegible] বা আল্লাহ্‌র আইন |
|---|---|
| ১। মানুষ যখন প্রয়োজন অনুভব করে তখন আইন তৈরী করেন এসব আইনের সংখ্যা শুরুতে থাকে খুবই কম, পরে বছরের পর বছর এর সংখ্যা বাড়তে থাকে। | ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ এবং এতে মানুষের জীবনের সকল দিকই শামিল রয়েছে। জ্ঞানী লোকেরা (আলেমগণ) সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যে শারী'আহর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেন। |
| ২। মানুষের গড়া আইন স্থায়ী নয়। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে এসব আইন পরিবর্তন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন দেশে কোন সময় মদপানকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে, কিন্তু জনগণের চাপ বৃদ্ধি পেলে পরে এ আইন পরিবর্তন হতে পারে। আমেরিকান সরকার একবার সকল প্রকার এ্যালকোহলযুক্ত পানীয় (মদ) নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি, ফলে কিছুদিন পরে আইনটি বাতিল করা হয়। | শারী'আহ হচ্ছে সকল মানুষের ও সকল সময়ের জন্যে স্থায়ী আইন। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে তা পরিবর্তিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামী আইনে মদপান ও জুয়াখেলার কোন অনুমতি নেই। এ আইন কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। এ হচ্ছে এমন আইন যা সব সময়ের মানুষের জন্যে সঠিক এবং সব জায়গায়ই প্রযোজ্য। |
| ৩। মানুষের ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। তাই মানুষের গড়া আইন কালের পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারে না। | আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু জানেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি মহাজ্ঞানী, তাই তাঁর আইন সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ। |
| ৪। মানুষ হচ্ছে সৃষ্ট জীব। তাই তার গড়া আইন হচ্ছে সৃষ্টির সৃষ্টি। | আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, আর তাঁর আইন হচ্ছে তাঁরই সৃষ্টি মানুষের জন্য। |
| ৫। মানুষের তৈরী আইন বিশেষ জাতি বা দেশ বিশেষের জন্যে উপযোগী হতে পারে। কিন্তু তা সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন হতে পারে না। | আল্লাহ্‌র আইন সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল সময়ের জন্য। এ আইন সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন। |
| ৬। মানুষ শুধু তাদের নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আইন তৈরী করে। সংসদ সদস্যরা যদি ধনীদের ওপর করের হার কমাতে চান, তো তাঁরা তা করতে পারেন। এমন কি এর ফলে বেশীর ভাগ মানুষের কষ্ট হলেও এবং দেশে বেকারত্বের হার অনেক বেড়ে গেলেও তাঁরা সেদিকে দৃষ্টি দেন না। | আল্লাহ্ তা'আলা সকল অভাব ও প্রয়োজনের উর্ধে। তিনি কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। তাই তাঁর আইন অল্প সংখ্যক স্বার্থপর লোকের জন্যে নয়, বরং সকল মানুষের জন্যে। |

শারী'আহর আরো দু'টি উৎস আছে। তা হচ্ছে ঃ ইজ্‌মা' (মতৈক্য) ও কিয়াস (একই ধরনের বিষয়ের আলোকে যুক্তিপ্রয়োগ)। তবে এ দু'টি উৎসের আইনকে অবশ্যই কুর'আন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তিশীল হতে হবে।

ইজ্‌মা' বা মতৈক্য কেবল সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে বিষয়ে কুর'আন বা সুন্নাহ্ থেকে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এক্ষেত্রে কুর'আন ও সুন্নাহ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐ বিষয়ের

সমস্যাটির ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত সমাধান উদ্ভাবন করবেন। আল-খুলাফাউর রাশিদূনের যুগে ইজ্‌মা'র উৎপত্তি ঘটে।
কিয়াস মানে হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে অনুরূপ বিষয়ের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যে ক্ষেত্রে কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি কোন পথনির্দেশ পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে কিয়াস প্রয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে অতীতের অনুরূপ কোন পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে যুক্তিবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে একটি সমস্যার সমাধন বের করা হয়।

সুন্নাহ শব্দের মানে হচ্ছে পদ্ধতি পথ বা দৃষ্টান্ত। ইসলামে সুন্নাহ বলতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাজ বা তাঁর জীবনের দৃষ্টান্তকে বুঝায়। আহাদীছে (হাদীছ-এর বহুবচন) এ সুন্নাহ নিহিত রয়েছে। আহাদীছ হচ্ছে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও তাঁর অনুমতিক্রমে করা কাজের বিবরণের সংকলন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতা সহকারে আহাদীছ সংগ্রহ ও সংকলিত করা হয়। ছয়টি হাদীছ সংকলনকে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। এগুলো 'ছিহাহ্ সিত্তাহ্' (নির্ভুল ছয়) নামে সুপরিচিত। এগুলো হচ্ছে ঃ

ছহীহ আল-বুখারী ঃ 'ইমাম বুখারী' নামে সুপরিচিত মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত। তিনি হিজরী ১৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৫৬ সাল মোতাবেক ৮৭০ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

২। ছহীহ্ মুসলিম ঃ 'ইমাম মুসলিম' নামে সুপরিচিত মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত। তিনি হিজরী ২০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৬১ সাল মোতাবেক ৮৭৫ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৩। সুনান আবু দাউদ ঃ 'আবু দাউদ' নামে সুপরিচিত সুলায়মান বিন আশ'আছ (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত। তিনি হিজরী ২০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৭৫ সাল মোতাবেক ৮৮৮ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৪ সুনান ইবনে মাজাহ ঃ 'ইবনে মাজাহ্' নামে সুপরিচিত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত। তিনি হিজরী ২০৯ সাল জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৭৩ সাল মোতাবেক ৮৮৬ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৫। জামি' আত্-তিরমিযী ঃ আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত। তাঁর জন্মতারিখ লিখিত নেই। তিনি হিজরী ২৭৯ সাল মোতাবেক ৮৯২ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৬। সুনান আন্-নাসাঈ ঃ আবু 'আবদুর রাহ্মান আহ্মদ বিন্ শু'আইব আন-নাসাঈ (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত। তিনি হিজরী ২১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩০৩ সাল মোতাবেক ৯১৫ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

এছাড়া ইমাম মালিক (রঃ) (জন্ম ৯৩ হিজরী ও ইন্তিকাল ১৭৯ হিজরী)-এর 'মুওয়াত্তা', আহ্মাদ বিন হাম্বাল (রঃ) (জন্ম ১৬৪ হিজরী ও ইন্তিকাল ২৪১ হিজরী)-এর 'মুস্নাদ' এবং আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন বিন মাস'উদ (রঃ) (ইন্তিকাল ৫১৬ হিজরী সাল)-এর 'মিশ্কাতুল মাছাবীহ্'-ও বিখ্যাত হাদীছ সংকলন। এছাড়া আরো অনেক হাদীছ সংকলন ও হাদীছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণবিশিষ্ট কিতাব রয়েছে।

## ফিক্হ

ইসলামী আইন-কানুন ও বিধিবিধানের বিজ্ঞানকে ফিক্হ বলা হয়। কুর'আন মজীদ ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান সংগ্রহ, সংকলন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এর মধ্যে শামিল রয়েছে। ফিক্হ শব্দের অর্থ হচ্ছে সমঝ বা অনুধাবন ও জ্ঞান।

ইসলামী আইনের পণ্ডিতগণ ফিক্হের মাধ্যমে শারী'আহ বুঝা ও তা মেনে চলাকে সহজ করেছেন। যে ব্যক্তির ফিক্হ সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান রয়েছে তাঁকে ফাকীহ বলা হয়। আর যিনি শারী'আহ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে রায় দেয়ার যোগ্যতা রাখেন তাঁকে মুফ্তী বলা হয়। তিনি যে রায় দেন তাকে বলা হয় ফাত্ওয়া (বহুবচনে ফাতাওয়া)।

কিছু সংখ্যক বড় বড় মুসলিম ব্যক্তিত্ব সহজ পদ্ধতিতে ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অনুধাবনের বিকাশ ঘটাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে চারজন ইসলামী আইন বা শারী'আহর সংকলন ও ব্যাখ্যার জন্যে সব চেয়ে বেশী সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১। আবু হানীফাহ নু'মান বিন ছাবিত (রঃ) (জন্ম হিজরী ৮০ সালে এবং ইন্তিকাল হিজরী ১৫০ সাল মোতাবেক ৭৬৭ খৃস্টাব্দে)। তিনি 'ইমাম আবু হানীফাহ' নামে সুপরিচিত।

২। **মালিক বিন আনাস (রঃ)** (জন্ম হিজরী ৯৩ সালে এবং ইন্তিকাল হিজরী ১৭৯ সাল মোতাবেক ৭৯৫ খৃস্টাব্দে)। তিনি 'ইমাম মালিক' নামে সুপরিচিত।

৩। **মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফিঈ (রঃ)** (জন্ম হিজরী ১৫০ সালে এবং ইন্তিকাল হিজরী ২৪০ সাল মোতাবেক ৮২০ খৃস্টাব্দে)। তিনি 'ইমাম শাফিঈ' নামে সুপরিচিত।

৪। **আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ)** (জন্ম হিজরী ১৬৪ সালে এবং ইন্তিকাল হিজরী ২৪১ সালে মোতাবেক ৮৫৫ খৃস্টাব্দে)। তিনি 'ইমাম ইবনে হাম্বাল' নামে সুপরিচিত।

## ইসলামী আইন মানুষের কাজকর্মকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে ঃ

১। ফরয বা ওয়াজিব (কর্তব্য বা বাধ্যতামূলক করণীয়) ঃ এ সব কাজ করলে পুরস্কার দেয়া হবে এবং না করলে শাস্তি দেয়া হবে।

২। মান্‌দূব (সুপারিশকৃত) ঃ এ সব কাজ করলে পুরস্কার দেয়া হবে, কিন্তু না করলে শাস্তি দেয়া হবে না।

৩। মুবাহ (নীরব/নির্দোষ) ঃ যে সব কাজের জন্যে নীরবতার মাধ্যমে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৪। মাকরূহ (অপসন্দনীয় বা নিরুৎসাহিত) ঃ যে সব কাজ অননুমোদিত, তবে শাস্তিযোগ্য নয়।

৫। হারাম (নিষিদ্ধ) ঃ আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য।

ইসলামী আইন বা শারী'আহ আদর্শ ইসলামী জীবনকে বাস্তব রূপ দান করে। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং শারী'আহ হচ্ছে ইসলামের নির্দেশিত আদর্শ জীবনে উপনীত হবার মাধ্যম। শারী'আহ আমাদের জীবনকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যশীল করার কাজে আমাদেরকে সহায়তা করে। শারী'আহ হচ্ছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হাছিল করার মাধ্যম। শারী'আহর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ইসলামী হুকুমাত বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়া সম্ভব নয়।

১। শারী'আহ কি এবং আমাদের জন্যে এর প্রয়োজন কি?

২। শারী'আহর উৎসসমূহ কি?

৩। সুন্নাহ কাকে বলে? আমরা কোথায় এর দৃষ্টান্ত পেতে পারি?

৪। সুন্নাহর ছয়টি নির্ভরযোগ্য কিতাব কি কি?

৫। ফিক্‌হ শব্দের মানে কি এবং কি কি এতে শামিল রয়েছে?

৬। ইসলামী আইনের সংকলনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত চারজনের নাম লিখ।

৭। মানুষের তৈরী আইনের মোকাবিলায় শারী'আহর গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। ইসলামী আইন অনুযায়ী মানুষের কাজকর্মকে পাঁচভাগে ভাগ কর।

১। আধুনিক বিশ্বে শারী'আহর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর; এতে মানুষের তৈরী আইন-কানুনের দুর্বলতাসমূহ উল্লেখ কর।

২। সুন্নাহ ও ফিক্‌হ কি? বর্তমান যুগে মুসলমানরা যে সব সমস্যা মোকাবিলা করছে তার সমাধান উদ্ভাবনের কাজে সুন্নাহ ও ফিক্‌হ কিভাবে মুসলমানদেরকে সাহায্য করে ?

৩। অনেক সমাজই শারী'আহকে ভয় পায়। এসব ভয় কি যুক্তিসঙ্গত? কিভাবে শারী'আহর অপব্যবহার হতে পারে? পাশ্চাত্য সমাজে কি অপরাধীদের সাথে নরম ব্যবহার করা হয় ?

## ইসলামে পারিবারিক জীবন

পরিবার হচ্ছে ইসলামী সমাজের ভিত্তি। হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষের পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। অতএব, এটা এমন এক সংগঠন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই যা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

–"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করে চল যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের দু'জন থেকে অনেক পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ আন-নিসা'– ৪ ঃ ১)

বিবাহ হচ্ছে ইসলামী পরিবারের ভিত্তি। নারী ও পুরুষ যখন পবিত্র বৈবাহিক চুক্তির মাধ্যমে একটি সুদৃঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ হয় কেবল তখনই একটি উত্তম ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা, আদরযত্ন ও সহযোগিতা গড়ে ওঠে। বিবাহের ফলে মানুষের মনে শান্তি আসে এবং গোটা মানবজাতির বিকাশ ও অগ্রগতির জন্যে নিরাপদ ও সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরী হয়। বিবাহের রীতি না থাকলে মানবজাতি স্থবিরতার শিকার হত। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)সহ অধিকাংশ নবী-রাসূল (আঃ) বিবাহ করেছিলেন।

### বিবাহ (নিকাহ্)

বিবাহ্ হচ্ছে বর ও কনের মধ্যে এক পবিত্র সামাজিক চুক্তি। তাই একজন নারী ও একজন পুরুষের জন্যে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে বিবাহের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

বিবাহের ক্ষেত্রে সব কিছুর আগে দ্বীনদারীর (তাক্ওয়ার) বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"শুধু সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ করো না। কারণ এমনও হতে পারে যে, সৌন্দর্য হয়ত নৈতিক অধঃপতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি সম্পদের জন্যেও বিবাহ করো না। কারণ এমনও হতে পারে যে, সম্পদ হয়ত অবাধ্যতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বরং দ্বীনদারী (তাক্‌ওয়া) দেখে বিবাহ কর।" (ইবনে মাজাহ্)

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো এরশাদ করেছেন ঃ

"একজন নারীকে চারটি জিনিসের জন্যে বিবাহ করা হয় ঃ তার সম্পদ, তার পারিবারিক মর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। অতএব, তোমাদের দ্বীনদার নারী দেখে বিবাহ করা উচিত, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আল-বুখারী)

একজন মুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম নারীকে বিবাহ করবে এটাই কাম্য, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রবতী ইয়াহূদী ও খৃস্টান নারীকে বিবাহ করা যেতে পারে। তবে একজন মুসলিম নারীর জন্য কোন অবস্থায়ই একজন অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করার অনুমতি নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ হচ্ছে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা, শুধু যৌন সম্পর্ক নয়।

মুসলিম সমাজের বিবাহ ঐতিহ্যগতভাবে সন্তানের পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হচ্ছে বিবাহের পাত্রপাত্রীদ্বয়। ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের অবৈধ মেলামেশার অনুমতি দেয় না। তেমনি বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কেরও অনুমতি দেয় না। ইসলামী জীবনবিধান ছেলেদের জন্যে মেয়েবন্ধু (গার্ল ফ্রেন্ড) ও মেয়েদের জন্যে ছেলেবন্ধু (বয় ফ্রেন্ড) প্রথা অনুমোদন করে না। তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মিশ্র সামাজিক অনুষ্ঠান (মিক্সড পার্টি) বা এ জাতীয় অন্যান্য রীতিকেও অনুমোদন দেয় না।

ইসলামী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁর আনুগত্য। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও প্রতিনিধি (খলীফা)। একজন মুসলমানের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য (আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছিল করা)। এ লক্ষ্যের সাথে কোনভাবেই বিবাহের সংঘাত হওয়া উচিত নয়। বরং বিবাহ যাতে এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয় সেদিকেই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ইসলামে তালাকের অনুমতি আছে, তবে একে সবচেয়ে কম পছন্দনীয় জায়েয কাজ বলে গণ্য করা হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

"যে সব কাজ জায়েয করা হয়েছে তার মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হচ্ছে

তালাক।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)। ইসলাম সমঝোতা, আপোষ ও সুখশান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যখন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে একত্রে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন ইসলামী আইন বিবাহবিচ্ছেদ (তালাক)-এর আশ্রয় নিতে নিষেধ করে না।

## ইসলামে নারীর মর্যাদা

নারী ইসলামী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যান্য ধর্মে নারীকে তেমন সম্মান দেয়া হয় নি। কিন্তু ইসলাম নারীকে সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মাতা ও স্ত্রী হিসেবে নারীর গুরুত্বের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এল এবং বলল ঃ ["হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাঃ) আমি যুদ্ধে যেতে চাই; এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।" হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মা বেঁচে আছেন কিনা। সে জানাল যে, তার মা বেঁচে আছেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ "তাঁর কাছে থাক, কারণ তাঁর পায়ের নীচেই (তোমার) বেহেশত" (আন-নাসাঈ)] অর্থাৎ মায়ের সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমেই বেহেশ্‌ত হাছিল করা সম্ভব।

একবার একব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করল ঃ "আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী সেবা পাবার অধিকারী কে?" হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেন ঃ "তোমার মা, (তিনি কথাটি তিনবার বললেন তারপর বললেন ঃ) এরপর তোমার বাবা, এরপর নিকটাত্মীয়গণ।" (আল-বুখারী)

দশম হিজরী সালে হাজ্জের সময় 'আরাফাতে হাজীদের উদ্দেশে দেয়া বিদায়ী ভাষণে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ "হে জনগণ! তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের কতগুলো অধিকার আছে এবং তাদের ওপরেও তোমাদের কতগুলো অধিকার আছে। তাদের সাথে ভাল আচরণ কর, তাদের প্রতি দয়াশীল হও, কারণ তারা তোমাদের অংশীদার ও নিষ্ঠাবান সাহায্যকারী।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম (আচরণকারী)।" (আত-তিরমিযী)

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এসব উক্তি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীকে কতবড় গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। এরপরও বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে কিছু লোক ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে ভুল ধারণা দিচ্ছে। এসব লোকের দৃষ্টিতে একজন

মুসলিম নারী প্রায় 'ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী' একজন 'অ-ব্যক্তি' এবং 'এমন কেউ যার কোন অধিকার নেই', আর 'যে সব সময় পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে বসবাস করে।' এসব ধারণা পুরোপুরি ভুল এবং ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল।

হাজ্জের অন্যতম করণীয় হচ্ছে ছাফা ও মার্‌ওয়াহ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে আসা-যাওয়া করা। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা হযরত হাজার (আঃ)-এর (যিনি বাংলাভাষীদের মধ্যে 'হাজেরা' নামে পরিচিত) ঘটনার স্মরণই এর উদ্দেশ্য। তিনি পানির খোঁজে এ পাহাড় দু'টির মাঝে বার বার ছোটাছুটি করেছিলেন। ইসলাম নারীকে যে গুরুত্ব ও সম্মান দিয়েছে এটা তার আরেকটি প্রমাণ।

এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের লোকেরা যে ভুল ধারণা পোষণ করছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনার সুবিধার্থে অতীতে বিভিন্ন সমাজের নারীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হত সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, রোমান সভ্যতার যুগে নারীকে দাসী হিসেবে গণ্য করা হত। অন্যদিকে গ্রীকরা নারীকে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য বলে গণ্য করত। প্রাথমিক যুগের খৃস্টানরা নারীকে প্ররোচনাদানকারিনী এবং বেহেশত থেকে হযরত আদম (আঃ)-এর পতনের জন্য দায়ী বলে মনে করত।[১]

ভারতে এই কিছুদিন পূর্বেও হিন্দুরা নারীকে মৃত্যু, পোকামাকড়, সাপ, এমন কি নরকের চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করত। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথেই স্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে যেত। অতীতে হিন্দু নারীকে মৃত স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিতে হত।[২]

ইসলামপূর্ব আরবে নারীকে দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির কারণ বলে গণ্য করা হত এবং অনেক সময় কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। কুর'আন মজীদে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ○ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ○

–"যখন জীবিত পুঁতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল" (সূরাহ আত্-তাক্‌ভীর– ৮১ ঃ ৮-৯)

৫৮৭ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল

নারীর মর্যাদা সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং একজন নারীকে প্রকৃত অর্থে মানুষ বলে গণ্য করা যায় কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী নারীদের জন্যে বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ করে দেন। অন্যদিকে গোটা মধ্যযুগব্যাপী ক্যাথলিক চার্চ নারীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করে। ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৪ সালের পূর্বে ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে সমান অধিকার দেয়া হত না। ইংল্যান্ডে ১৮৫০ সালের পূর্বে নারীদেরকে নাগরিক বলে গণ্য করা হত না এবং ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ইংরেজ নারীদের কোন ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না।[৩]

অতীতে বিভিন্ন সমাজে নারীর এই যে মর্যাদা ছিল আমরা যদি তা মনে রাখি এবং ইসলামে নারীর মর্যাদার দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এ উপসংহারে পৌঁছুতে হবে যে, ইসলাম নারীকে অন্ধকার যুগের অখ্যাত অবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা ও প্রায় অস্তিত্বহীনতা হতে এখন থেকে চৌদ্দশ' বছর আগেই মুক্ত করেছে।

ইসলাম সাধারণ বিচারবুদ্ধির ধর্ম ও মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম মানবজীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে। এর মানে এ নয় যে, ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের সমতা স্বীকার করেছে। বরং ইসলাম নারী ও পুরুষের জৈবিক কাঠামোর ভিন্নতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২২৮)

আল্লাহ্ তা'আলা নারী ও পুরুষকে একই রকম করে সৃষ্টি করেন নি, অতএব, নারী ও পুরুষের মধ্যে পুরোপুরি সমতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তা হবে প্রকৃতি বিরোধী। আর তা সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করবে। ফলে সমাজের অগ্রগতি হবে না বরং তার পরিবর্তে বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহবর্হিভূত সন্তানের জন্ম ও পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গনসহ এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হবে যার সমাধান সম্ভব হবে না। পাশ্চাত্য সমাজে এসব জটিল সমস্যা ইতিমধ্যেই বিরাজ করছে। নারীবাদীরা যার প্রবক্তা সেই অবাধ মেলামেশার অনুমতি ও তথাকথিত নারীস্বাধীনতার ফলেই পাশ্চাত্যে স্কুলছাত্রীদের গর্ভবতী হওয়া, ক্রমবর্ধমান হারে গর্ভপাত, বিবাহবিচ্ছেদ ও আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

## ইসলামে নারীর অধিকার

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষসহ প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টিকেই জোড়া হিসেবে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ রূপে সৃষ্টি করেছেন। (সূরাহ আয্-যারিয়াত– ৫১ ঃ ৪৯)। তিনি আদম-সন্তানদেরকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম্মানিত করেছেন। (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল–১৭ ঃ ৭০)। যে সব নারী ও পুরুষ ঈমান এনেছে তারা পরস্পরের বন্ধু। (সূরাহ আত্-তাওবাহ– ৯ ঃ ৭১)। আল্লাহ্

তা'আলা পরকালে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পুরস্কৃত করবেন। (সূরাহ্ আলে 'ইমরান–৩ ঃ ১৯৫)

ইসলাম নারীকে স্বাতন্ত্র্য ও উল্লেখযোগ্য স্বকীয়তা দান করেছে। সে তার স্বামীর আনুষঙ্গিকমাত্র নয়। ইসলাম তাকে ধনসম্পদের মালিক হবার অধিকার দিয়েছে। সে তার নিজের আয়-উপার্জনের মালিক। পিতা, স্বামী বা ভাই কারোই তার সম্পদের বা উপার্জনের ওপর অধিকার নেই। ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমারেখার মধ্যে থেকে সে তার ইচ্ছামত নিজের সম্পদ ও উপার্জন, খরচ ও হস্তান্তর করতে পারে।

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার দিয়েছে। সে তার মৃত পিতা, স্বামী বা সন্তানহীন ভাইয়ের সম্পদে অংশ লাভ করে। (সূরাহ্ আন-নিসা'– ৪ ঃ ৭, ৩২, ১৭৬)

একজন নারীর নিজের জন্যে স্বামী বেছে নেয়ার অধিকার রয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপরে কেউ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। বৈবাহিক জীবন অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে সে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার (খুল্ – خُلْع) অধিকার রাখে।

কোন পুরুষ যদি কোন নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে ভিত্তিহীনভাবে প্রশ্ন তোলে তাহলে ঐ পুরুষলোকটি সাক্ষ্যদানের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে (সূরাহ্ আন্-নূর– ২৪ ঃ ৪)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কিভাবে একজন নারীর ইজ্জতকে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ থেকে রক্ষা করে।

কুর'আন মজীদ মুসলিম পুরুষদেরকে নারীদের সাথে সদাচারণ করতে বলেছে। (সূরাহ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ১৯) কুর'আন মুসলিম স্বামীদেরকে তাদের ভরণ-পোষণের জন্যে দায়িত্বশীল করেছে। এর পরিবর্তে নারীদের কাছ থেকে অনুগত ও সতী থাকার প্রত্যাশা করা হয়েছে (সূরাহ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ৩৪)।

একজন নারীর ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করার জন্যে নিজের প্রতিভার বিকাশের অধিকার রয়েছে। ইসলাম একজন বিবাহিতা অমুসলিম নারীকে নিজ ধর্মের ওপর অটল থাকার অধিকার দেয় এবং তার স্বামী তার এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কোন ইয়াহূদী বা খৃস্টান নারী কোন মুসলিম পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলে সে এ অধিকার লাভ করবে। অবশ্য, মুসলিম স্বামী নিজের ব্যবহার দ্বারা এ ধরনের স্ত্রীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবেন এটা স্বাভাবিক।

## ইসলামে নারীর কর্তব্য

ইসলাম হচ্ছে একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম যেভাবে নারীর অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে তেমনি তার কর্তব্যও সুনির্ধারিত করে দিয়েছে। একজন মুসলিম নারীর কাছ থেকে নীচের কাজগুলো প্রত্যাশা করা হয় ঃ

১। তাওহীদে বিশ্বাস পোষণ করা ও ইসলাম অনুযায়ী আমল করাই হবে তার প্রথম কর্তব্য। একজন মুসলিম নারীকে অবশ্যই ছালাত আদায় করতে হবে, ছাওম পালন করতে হবে, তার নিজ সম্পদের যাকাত দিতে হবে (যদি প্রযোজ্য হয়) এবং সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করতে হবে। তার হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) চলাকালে তাকে ছালাত আদায় থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে এবং ঐ সময়কার ছাওম পরে পূরণ করতে হবে। ছালাতুল জুমু'আহকে তার জন্যে ঐচ্ছিক করা হয়েছে।

২। তাকে সব সময় তার সতীত্ব রক্ষা করতে হবে। সে কারো সাথে কোন বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রাখবে না। পুরুষের জন্যেও একই হুকুম।

৩। ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী সন্তানদের লালন-পালন করা তার কর্তব্য। তাকে পরিবারের দেখাশোনা করতে হবে এবং পরিবারের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যদিও পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবার পরিচালিত হয়ে থাকে। সে হচ্ছে পরিবারের রাণী এবং গার্হস্থ্য বিষয়াদির ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার)।

৪। সে যখন বাইরে যাবে এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন বাদে অন্য প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করবে তখন অবশ্যই তাকে ভদ্র পোশাক ও হিজাব পরিধান করতে হবে। (সূরাহ আল- আহ্যাব– ৩৩ ঃ ৫৯, সূরাহ আন্-নূর- ২৪ ঃ ৩০-৩১)। সে পুরুষের পোশাক পরতে পারবে না।

৫। সে তার স্বামীর সাহায্যকারিনী। একজন বিশ্বস্ত স্ত্রী একটি পোশাকের মত; সে তার স্বামীর জন্যে শান্তি, ভালবাসা, সুখ ও পরিতৃপ্তির উৎস। (সূরাহ্ আর-রূম– ৩০ ঃ ২১, সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ১৮৭)

৬। তাকে যদি আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করতে বলা হয় তাহলে সে অবশ্যই তার স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের এ ধরনের আদেশ অমান্য করবে। (সূরাহ আত্-তাওবাহ– ৯ ঃ ২৩)

৭। তার কাছ থেকে আশা করা হয় যে, সে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর ধন-সম্পদ- ও উপায়-উপকরণের হেফাযত করবে।

ইসলাম একজন স্বামী ও একজন স্ত্রীকে পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে করে। দু'জনের কেউ কারো ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে না। উভয়েরই নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। তারা উভয় মিলে একটি সুখশান্তিতে ভরা পরিবার গঠন করে। আর এ ধরনের পরিবারই সুস্থ, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজের প্রাণ বা কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ।

ইসলামে নারী ও পুরুষ পুরোপুরি সমান নয়। আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ হিসাবে তারা আল্লাহ্‌র নিকট সমান মর্যাদার অধিকারী। তাদের স্বতন্ত্র শারীরিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলাম নারীর ওপরে পুরুষের নেতৃত্ব স্বীকার করে (সূরাহ আন্‌-নিসা'– ৪ ঃ ৩৪, সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২২৮)। কিন্তু এর মানে আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ নয়।

গড়ে সাধারণতঃ নারীর তুলনায় পুরুষ অধিকতর শক্তিশালী, ওজনে ভারী ও বেশী লম্বা। নারী গর্ভবতী হতে ও সন্তান জন্ম দিতে পারে, কিন্তু পুরুষ তা পারে না। নারী সাধারণতঃ সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ ও স্নেহমমতার অধিকারী। অন্যদিকে পুরুষ তুলনামূলকভাবে কম আবেগপ্রবণ। আল্লাহ্‌ তা'আলা নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী দিয়েছেন। তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তারা একটি সুখী পরিবার গঠনের লক্ষ্যে পরস্পরকে ভালবাসবে এবং সাহায্য-সহায়তা করবে।

মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে কখনোই নারী ও পুরুষকে সমান গণ্য করা হয় নি। ইসলাম নারীকে তার সঠিক মর্যাদা দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে ঐশী বিধান লঙ্ঘনের চেষ্টা করে নি। অন্যান্য ধর্ম ও দর্শন নারীর সঠিক ও যথাযথ ভূমিকা নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

পাশ্চাত্যে নারীকে ভোগ ও শখের উপকরণে– প্রায় খেলনায় পরিণত করা হয়েছে। আধুনিক যুগে নারীরা প্রকৃত বা কাল্পনিক সমতার জন্যে, সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারে, নিজেদের মর্যাদা হারাবার প্রবণতায় আক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতা ও সমতার শ্লোগান কার্যতঃ তাদেরকে খেলার পণ্যে পরিণত করেছে। অথচ তারা না স্বাধীনতা পেয়েছে, না পূর্ণ সমতা অর্জন করতে পেরেছে। বরং তারা তাদের গৃহের স্বাভাবিক স্থান হারিয়েছে।

এভাবে পাশ্চাত্য সমাজে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, সুবিচার ও পারস্পরিক সহযোগিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্যে এর পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। তাই পরিবারের স্বাভাবিক শান্তি পুনর্বহাল করা অপরিহার্য।

### বহুবিবাহ (Polygamy/Polygyny) ও ইসলাম

ইসলাম বাস্তব জীবনে অনুসরণীয় একটি জীবনবিধান। ইসলাম মানবজীবনের সকল সমস্যারই সমাধান দিতে পারে। ইসলাম শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়। এসব শর্ত পালন করে একজন পুরুষ লোক একই সময়ে সর্বোচ্চ চারজন নারীর সাথে বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারে। তবে সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে একবিবাহ প্রচলিত রয়েছে অর্থাৎ একজন পুরুষ একই সময় একজন স্ত্রী নিয়ে জীবন যাপন করে। মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ মোটামুটিভাবে একটি ব্যতিক্রম।

বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপ করেছে।
কুর'আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝

–"আর তোমরা যদি ভয় কর যে, এতিমদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তাহলে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে ভাল মনে হয় এমন দুই, তিন বা চারজনকে বিবাহ করে নাও। আর যদি আশঙ্কা কর যে, (তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে) ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না তাহলে শুধু একজন নারী বা তোমাদের অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ কর); এতেই তোমাদের অবিচার বা পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে না পড়ার অধিকতর সম্ভাবনা" (সূরাহ্ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ৩)। এ আয়াতে মানুষকে এ নছিহত করা হয়েছে যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করলে সে যেন সব স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ ও সুবিচার করে। যদি তা না করতে পারে তবে যেন একজন নারীকেই বিবাহ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদের অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

–"তোমরা কখনোই স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না, যদিও তোমরা তা আকাঙ্ক্ষা কর। অতএব, এমনভাবে একদিকে ঝুঁকো পড়ো না যে, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় (অনিশ্চিত অবস্থায়) ফেলে রাখবে। আর তোমরা যদি (নিজেদেরকে) শুধরে নাও (বা সমঝোতা কর) ও আল্লাহ্কে ভয় কর, তো (জেনে রেখো,) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল মেহেরবান" (সূরাহ্ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ১২৯)।

এখানেও আবার সদাচরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ইসলাম বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে। এসব পরিস্থিতি হচ্ছে ঃ

১। যখন একজন স্ত্রী বন্ধ্যা– তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, কিন্তু স্বামী সন্তান চায়। এক্ষেত্রে বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক দেয়ার চেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করাই অধিকতর উত্তম। অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের যুক্তিতে বন্ধ্যা স্ত্রী চাইলে তার স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে পারে।

২। স্ত্রী যদি এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে, তার পক্ষে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন ও গার্হস্থ্য কর্ম সম্পাদন সম্ভব না হয় তাহলে সে আরেকজন নারীকে বিবাহ করতে ও এর মাধ্যমে পরিবারিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৩। বহুবিবাহকে সেই সমাজের সামাজিক সমস্যার সমাধান বলে গণ্য করা যেতে পারে যেখানে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী। বিশেষ করে যুদ্ধের পরে এ অবস্থা দেখা দিতে পারে। কুর'আন মজীদের যে আয়াতে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে তা উহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। ঐ যুদ্ধে বহু পুরুষ মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে ঐ দু'টি যুদ্ধের পর পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, যেসব পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব তারা একাধিক নারীকে বিবাহ করবে। বিরাট সংখ্যক নারীকে অবিবাহিতা বা স্বামীহীন অবস্থায় ফেলে রাখার পরিবর্তে এটাই উত্তম।

ইসলাম বিবাহবহির্ভূত যে কোন ধরনের যৌন সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামী সমাজে রক্ষিতা বা উপপত্নী রাখার কোন বিধান নেই। ইসলাম নারীদেরকে বিবাহের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং লোভী ও স্বার্থপর পুরুষদের দ্বারা শোষিত হওয়া থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছে। অন্যদিকে পুরুষদের জন্যেও অনেকগুলো রক্ষিতা বা উপপত্নী রাখার চেয়ে একাধিক স্ত্রীর অধিকারী হওয়া অধিকতর মর্যাদার ব্যাপার।

ইসলাম প্রতিটি মানুষকেই তার কাজকর্মের জন্যে দায়ী গণ্য করে। কেউ একাধিক নারীকে ভোগ করবে অথচ স্বামী ও পিতার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে এটা চলতে দেয়া যায় না। কারণ এটা অমানবিক ও অন্যায়।

একটি আদর্শ ইসলামী সমাজে শুধু মা-কেন্দ্রিক পরিবার বা অবৈধ সন্তান থাকতে পারে না। কেবল দায়িত্বহীন সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ মেলামেশার সমাজেই

এটা সম্ভব হয়ে থাকে। যে নারী কোন পুরুষের দ্বিতীয়া স্ত্রী হতে যাচ্ছে সে ঐ পুরুষটির ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী থাকায় তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। কিন্তু কোন নারী যদি তার স্বামীকে স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেয় এবং এই দ্বিতীয় স্ত্রীও লোকটির প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাকে বিবাহ করতে রাযী হয় তাহলে এতে অন্য লোকদের আপত্তি করার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে?

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমানই একবিবাহ করে থাকে। অর্থাৎ একজন পুরুষের একজনই স্ত্রী। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, খুবই অল্প সংখ্যক মুসলিম পুরুষের একাধিক স্ত্রী রয়েছে। অথচ একেই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্যে ছুতা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এ ধরনের প্রচারণা ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরী করতে পারে। বিশেষ করে যে সব মুসলমান ইসলাম অনুযায়ী আমল করে না এ ধরনের অপপ্রচারে তাদের দৃষ্টান্তকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়।

একই সাথে এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকার বিপরীতে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকার (Polyandry) কথা উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, একই সাথে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকার ধারণাটি একেবারেই অবাস্তব। এর ফলে কোন সমস্যার সমাধান তো সম্ভবই নয়, বরং বহু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ঃ এক্ষেত্রে পিতৃত্ব চিহ্নিত করা যাবে কিভাবে? কোন্ স্বামী সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করবে? এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারই বা কিভাবে নির্ণয় করা হবে? একই সাথে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীর ধারণায় এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

এছাড়া একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীর সাথে বসবাস করা ও তাদের সকলের কাছ থেকে সন্তান লাভ সম্ভবপর। কিন্তু একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। একজন নারী একই সময় কেবল একজন স্বামীর কাছ থেকেই সন্তান গ্রহণ করতে পারে।

ইসলামে একজন স্ত্রীর একই সময় একাধিক স্বামী থাকা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

ইসলাম হচ্ছে বাস্তব জীবনে অনুসরণীয় একটি জীবনব্যবস্থা। ইসলাম বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার দাবীকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ছাড়া ইসলাম মানুষের প্রবণতাসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে ও ভারসাম্য নিশ্চিত করেছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জীবনব্যবস্থা পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত।

সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্যে সর্বোত্তম বিধিবিধান দিয়েছেন। তাই ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আমাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ থাকা উচিত নয়। ইসলাম সমস্ত সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান দিয়েছে। আমরা যদি সে সম্পর্কে না জানি বা তা বুঝতে ব্যর্থ হই সে জন্যে আমরা ইসলামকে দোষারোপ করতে পারি না। আমাদের উচিত পুরো ইসলামের প্রতি দৃষ্টি দেয়া, তার অংশবিশেষের প্রতি নয়। কারণ ইসলাম মানুষের জীবনকে একটি অবিভাজ্য একক বিষয় হিসেবে দেখে এবং একে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে না।

মানবজীবনের সবগুলো ক্ষেত্রই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। নারীর মর্যাদা, বিবাহ ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনব্যবস্থার পৃথক পৃথক অপরিহার্য দিক। ইসলামকে গ্রহণ করলে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। এ থেকে বেছে বেছে কিছু বিষয় গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

## অনুশীলনী–৮

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। ইসলামী পরিবারের ভিত্তি হিসেবে বিবাহের ভূমিকা আলোচনা কর। ইসলাম বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের অনুমতি দেয় নি কেন? তোমার জবাবের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২। ইসলাম নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছে? পুরুষরা কিভাবে নারীর এ মর্যাদাকে পদদলিত করে?

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। ইসলাম কি ধরনের পরিস্থিতিতে বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে? ইসলামের এ বিধানের বাস্তবদর্শিতা ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। "ইসলামে নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দুই-ই দেয়া হয়েছে।" নারীদের অধিকার ও কর্তব্যের উল্লেখসহ এ উক্তিটি সম্বন্ধে আলোচনা কর। যেসব মুসলিম পুরুষ ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ বা প্রকৃত ইসলামকে উপেক্ষা করে তাদের 'আমলের ভিত্তিতে বা পাশ্চাত্য প্রচারমাধ্যমের পক্ষপাতমূলক প্রচারের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে মুসলিম নারীদের সম্বন্ধে কতখানি ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে? – আলোচনা কর।

# নয় ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। একজন ব্যক্তির জীবনের বা একটি সমাজের কোন একটি দিকও ইসলামের আওতার বাইরে রাখা হয় নি। অর্থনৈতিক দিক হচ্ছে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই আমাদের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার জন্যে ইসলাম আমাদেরকে বিস্তারিত পথনির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানতঃ আমরা কোন্ পথে আয় করব ও কোন্ পথে ব্যয় করব সে সম্পর্কে বিধিবিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থা প্রতিটি জিনিসকে যথাস্থানে স্থাপন করেছে।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে অর্থোপার্জন ও অর্থ ব্যয় করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদেরকে শুধু এ কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয় নি। মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে ভাত-কাপড়ের প্রয়োজন, কিন্তু মানুষ কেবল ভাত-কাপড়ের জন্যে বেঁচে থাকে না।

আমাদের জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র খলীফাহ। আমরা শুধু দেহের অধিকারী নই, বরং রূহ ও বিবেকের অধিকারী। বিবেক না থাকলে মানুষের আচরণ পশুর চেয়েও অধম হয় এবং সেক্ষেত্রে তারা সমাজের জন্যে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি করে।

ইসলামের সব কিছুই মানুষের স্বার্থে ও মানুষের কল্যাণের জন্যে। ইসলামের অর্থনৈতিক মূলনীতিসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মানুষ দায়িত্বশীলতা ও সততার সাথে আচরণ করবে। সেখানে কেউ সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্য, সৌজন্য, আস্থা ও দায়িত্বশীলতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে যত বেশী সম্ভব ধন-সম্পদ করায়ত্ত করার জন্যে স্বার্থান্বেষীর ভূমিকা পালন করবে না।

**ইসলামের অর্থব্যবস্থা নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহের ওপর ভিত্তিশীল ঃ**

## এক ঃ হালাল পন্থায় আয় ও ব্যয়

মুসলমানরা খেয়ালখুশী মত যেকোন পন্থায় আয় ও ব্যয় করতে পারে না। আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্যে ইসলামের নিজস্ব আইন-কানুন রয়েছে। এসব আইন-কানুন কুর'আন - সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। যেমন ঃ

ক. এ্যালকোহলযুক্ত পানীয় (মদ) উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ হারাম। জুয়া, লটারী, রিবা (সূদ)-এর লেনদেন থেকে উপার্জিত অর্থও হারাম। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫ ঃ ৯০-৯১, সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ২৭৫)

খ. মিথ্যাচার, ধোঁকা-প্রতারণা, জালিয়াতি ও চুরির মাধ্যমে আয়-উপার্জন করা হারাম। বিশেষ করে প্রতারণামূলকভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ১৮৮; সূরাহ আন্-নিসা'- ৪ ঃ ২; আল-আন্'আম- ৬ ঃ ১৫২; আল-'আ'রাফ- ৭ ঃ ৮৫; আল-মুতাফ্ফিফীন- ৮৩ ঃ ১-৫)

গ. মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজূদ করে রাখা (মজুদদারী করা), চোরাচালানী ও দ্রব্যসামগ্রীর কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করা হারাম। (সূরাহ আলে 'ইমরান- ৩ ঃ ১৮৩; সূরাহ আত্-তাওবাহ- ৯ ঃ ৩৪-৩৫)

ঘ. পতিতাবৃত্তি ও পতিতালয় পরিচালনা এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য অনৈতিক পন্থায় অর্থোপার্জনও হারাম। (সূরাহ আন্-নূর- ২৪ ঃ ২৩)

ইসলাম সমস্ত রকমের পাপাচারের মূলে আঘাত করে এবং একটি ইনসাফ ভিত্তিক সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই একজন মুসুলমানকে অবশ্যই হালাল পন্থায় টাকা-পয়সা আয় করতে হবে। তাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সে যা কিছু করছে আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন। তার সকল কাজকর্মের জন্যে শেষবিচারের দিনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে কোন কিছুই লুকানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইসলামে হারাম পন্থায় উপার্জনের যেমন অনুমতি নেই, তেমনি হারাম কাজে টাকা-পয়সা ব্যয় করারও অনুমতি নেই। একজন মুসলমান দায়িত্বহীনভাবে তার টাকা-পয়সা ব্যয় করতে পারে না। বরং তাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও ভেবেচিন্তে টাকা-পয়সা ব্যয় করতে হবে।

অমিত ব্যয় ও অপচয়কে ইসলাম কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। (সূরাহ আল-আ'রাফ- ৭ ঃ ৩১; বানি ইসরাঈল- ১৭ ঃ ২৬; মার্‌ইয়াম- ১৯ ঃ ২৭-৩১; আল-ফুর্‌কান- ২৫ ঃ ২৮)

## দুই ঃ সম্পদের অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

ইসলামের বিধান অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি তার উপার্জিত টাকা পয়সা ও ধনসম্পদের অধিকারী নিজেই। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা ও কাজ করার বা উপার্জনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তার স্বাধীনতার দ্বারা যেন সমাজের বৃহত্তর কল্যান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রতিটি ব্যক্তিই তার কাজকর্মের জন্য

শেষবিচারের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। (সূরাহ আন্-নিসা'- ৪ ঃ ৭; ইয়া-সীন- ৩৬ ঃ ৭১; আন্-নাহ্‌ল্- ১৬ ঃ ১১১)

### তিন ঃ যাকাত ব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক মূলনীতি হচ্ছে বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদান। প্রত্যেক স্বচ্ছল মুসলমানের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান ব্যাধ্যতামূলক (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যাকাত ধনী ও গরীবদের মধ্যকার ব্যবধান কমাতে সহায়তা করে।

আসলে যাকাত এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার (তথা মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের) নিশ্চয়তা বিধান করতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্রে কারো কোনরূপ নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষুধা-দারিদ্রের ভয় থাকার কথা নয় (সূরাহ আত্-তাওবাহ- ৯ ঃ ৬৯ ও ১০৩; সূরাহ্ আল-বাইয়িনাহ- ৯৮ ঃ ৫)। যাকাতের মাধ্যমেই এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

এছাড়া ইসলাম ঐচ্ছিক দান (ছাদাকাহ)কে খুবই উৎসাহিত করেছে। ছাদাকাহ সমাজের দরিদ্রতম ও সর্বাধিক দুর্বল অংশকে সাহায্য করার আরেকটি পন্থা। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ধনসম্পদ দিয়েছেন তারা যাতে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল লোকদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করে (সে উদ্দেশ্যে) ছাদাকাহ দানে উৎসাহিত করা হয়েছে।

### চার ঃ রিবা (সূদ) হারাম

ইসলামী অর্থনীতিতে রিবা (সূদ) সংক্রান্ত সকল প্রকার লেনদেন হারাম করা হয়েছে। রিবাকে অনেক ক্ষেত্রে 'মুনাফা' নামকরণ করা হয়। কিন্তু রিবাকে 'সূদ' বা 'মুনাফা' যে নামেই নামকরণ করা হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই তা হারাম।

আসলে সূদ ব্যবসা বা মুনাফা কোনটাই নয়। সূদ হচ্ছে শোষণ ও সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণের মাধ্যম। কুর'আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۚ

–"তারা বলে ঃ 'নিঃসন্দেহে ব্যবসা রিবার ন্যায়।' কিন্তু আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও রিবাকে হারাম করেছেন।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২৭৫)

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ

–"তোমরা রিবা হিসেবে যা কিছু দাও যাতে লোকদের ধনসম্পদে বৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট তা বৃদ্ধি পায় না।" (সূরাহ আর- রূম- ৩০ ঃ ৩৯)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

–"হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণ ও বহুগুণ করে রিবা খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।" (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৩০)

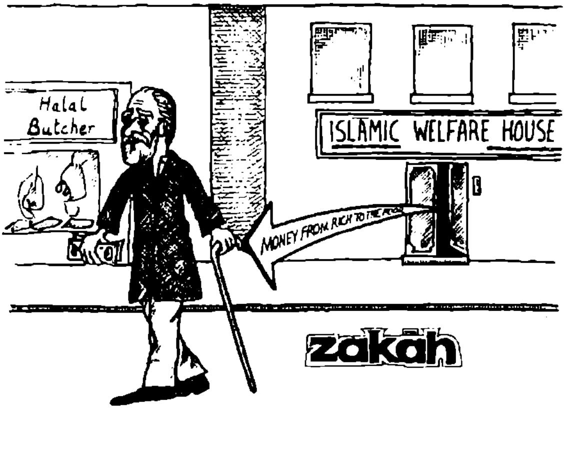

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

–"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং রিবার যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর তোমরা যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের হুশিয়ারী শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবাহ কর তবে তোমাদের মূলধন পাবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।" (সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ২৭৮-২৭৯)

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত মুক্তবাজার অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে রিবা। যাকাতের মাধ্যমে যেখানে ধনীদের সম্পদের একটি অংশ গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়, তার বিপরীতে রিবা বা সূদের মাধ্যমে গরীবদের সম্পদ ধনীদের হাতে চলে যায়। আধুনিক অর্থনীতি রিবা বা সূদের ওপর নির্ভরশীল। ধরে নেয়া হয় যে, সূদ বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক জীবন সচল রাখা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ কোম্পানী সূদবিহীন লেনদেনের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ যে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে তা 'সূদ ছাড়া চলা অসম্ভব'– এ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

অবশ্য এখনো সূদমুক্ত একটি পরিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বর্তমান যুগে অর্থব্যবস্থা একটি জটিল বিষয়। তা সত্ত্বেও বিশ্বের বুকে সামাজিক সুবিচার ও প্রতিটি মানুষের জন্যে সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সূদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। একটি দেশে পুরোপুরি সূদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা কেবল তখনি সম্ভব হতে পারে যদি সেখানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সরকার এ উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

পাঁচ ঃ উত্তরাধিকার আইন (মীরাছ – مِيْرَاث )

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া ধনসম্পদের সুষ্ঠু ও ইনসাফ সম্মত বন্টন নিশ্চিত করার ব্যাপারে ইসলামের উত্তরাধিকার (মীরাছ) আইন এক চমৎকার ব্যবস্থা।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে মৃতব্যক্তির স্বজনদের অধিকার ও তাদের প্রত্যেকের অংশ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। (সূরাহ আন্-নিসা'- ৪ ঃ ৭-১২ ও ১৭৬)

## উপসংহার

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ইসলাম আরো বহু বিধিবিধান ও দিকনির্দেশ দিয়েছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে সকল মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ও কল্যাণকর ব্যবহার অপরিহার্য। সকল প্রকার দুর্নীতি ও অনৈতিক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করতে হবে যদিও দৃশ্যতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে তা আকর্ষণীয়। রাষ্ট্র ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কিছু কিছু ব্যক্তিস্বাধীনতা কুরবানী বা ত্যাগ করা জরুরী হতে পারে।

ইসলাম মানুষকে সহজ-সরল জীবন যাপন, নম্রতা, নমনীয়তা, দান-ছাদাকাহ্, পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতায় উৎসাহিত করে এবং কার্পণ্য, লোভ-লালসা, অমিতব্যয় ও অপচয়ে নিরুৎসাহিত করে।

আমরা এখানে ইসলামী অর্থনীতির প্রধান দিকগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশী আলোচনা করা এ বইয়ে সম্ভব নয়। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বহু বই-পুস্তক রয়েছে, আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা সেসব বই-পুস্তক পড়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করতে পারেন। এ বইয়ের শেষে যে পুস্তকতালিকা রয়েছে তাতেও এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বইয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

## অনুশীলনী-৯

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। যাকাত মানে কি এবং রিবার সাথে এর বৈপরীত্য কোথায় ব্যাখ্যা কর। রিবা গরীব লোকদের জন্য ক্ষতিকর কেন?

২। ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান মূলনীতিগুলো কি কি?

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। "মানুষ শুধু খেয়ে বেঁচে থাকতে আসে নি।" "জীবনের সর্বোত্তম জিনিসগুলো বিনামূল্যে পাওয়া যায়।" উক্তি দু'টি নিয়ে আলোচনা কর।

২। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর। ইসলামী অর্থনীতি কিভাবে সম্পদের অধিকতর সমবন্টন নিশ্চিত করে, ব্যাখ্যা কর।

# দশ ঃ ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

রাজনীতি ইসলামের একটি দিক। ইসলাম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করা সম্ভব নয়। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করা অর্থহীন।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আর রাজনীতি আমাদের সামষ্টিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলাম যেভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে, ছাওম পালন করতে হবে, যাকাত দিতে হবে ও হাজ্জ আদায় করতে হবে, ঠিক সেভাবেই আমাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার গঠন, প্রতিনিধি নির্বাচন, চুক্তি সম্পাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার নীতি শিক্ষা দেয়।

এ পুস্তকে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তাই আমরা এখানে কেবল ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ ও প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করব। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাগণ এ বইয়ের শেষের দিকে সন্নিবেশিত পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত এ সংক্রান্ত বইপুস্তক পড়তে পারেন।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহের ওপর ভিত্তিশীল ঃ

## এক ঃ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব মানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস। ইসলামে ক্ষমতা ও আইন-কানুনের উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। (সূরাহ আলে 'ইমরান- ৩ ঃ ১৫৪; ইউসুফ-১২ ঃ ৪০; আল-ফুরকান-২৫ ঃ ২, আল-মুল্‌ক-৬৭ ঃ ১) মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দাহ্ এবং আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তাঁর বান্দাহ্‌র জন্য কি ভাল, আর কি মন্দ। তাঁর কথাই শেষ কথা। মানুষের তাঁর দেয়া আইন-কানুন পরিত্যাগ বা তাতে পরিবর্তন করা কিছুতেই উচিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

—"পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; এ হচ্ছে তাদের উভয়ের কৃতকর্মের প্রতিদান যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ৩৮) ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলিম হবার দাবীদার কোন শাসক বা সরকারই এ আইন পরিবর্তন করতে পারে না (সূরাহ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ৪৪; সূরাহ আল-বাকারাহ-২ ঃ ২২৯)।

আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে কুর'আন মজীদে বহু আইন-কানুন রয়েছে। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে এসব আইন-কানুনকে বাস্তবায়িত করা।

## দুই ঃ মানুষের খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব)

মানুষ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলার খলীফাহ (প্রতিনিধি)। (সূরাহ আল-বাকারাহ-২ ঃ ৩০; সূরাহ আল-আন্'আম-৬ ঃ ১৬৫) আল্লাহ্ তা'আলা সার্বভৌম ও মানুষ তাঁর প্রতিনিধি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু আদেশ করেছেন মানুষের তা-ই করা উচিত। মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করবে কি করবে না এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকার কারণেই তাকে শেষবিচারের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

'মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফাহ'– রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষকে পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে পৃথিবীর বুকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্যে মানুষকে আমানত হিসাবে ক্ষমতা দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। একজন প্রতিনিধির কাছ থেকে এটাই কাম্য যে, সে তার নিয়োগকর্তা মালিকের পছন্দ অনুযায়ী আচরণ করবে। (সূরাহ ইউনুস-১০ ঃ ১৪)

## তিন ঃ পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (শূরা)

ইসলাম আমাদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে (শূরা) সরকার পরিচালনা, আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে শিক্ষা দেয়। 'শূরা' মানে "আলোচনা, পরামর্শ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ"। (সূরাহ আলে 'ইমরান- ৩ ঃ ১৫৯; সূরাহ আশ-শূরা-৪২ ঃ ৩৮) এটা ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামে স্বৈরতন্ত্রের কোন স্থান নেই।

পরামর্শ (শূরা) অবশ্যই কুর'আন-হাদীস ভিত্তিক হতে হবে। পরামর্শ কিছুতেই কুর'আন -হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

## চার ঃ সরকারের জবাবদিহিতা

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসক ও সরকার প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র নিকট, অতঃপর জনগণের নিকট দায়ী। শাসককে অবশ্যই কুর'আন-সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী জনগণের কল্যাণের জন্যে কাজ করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হচ্ছে জনগণের সেবক।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকরা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে শাসক ও সরকারকে প্রশ্ন করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে শাসক যতক্ষণ কুর'আন-সুন্নাহর অনুসরণ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আনুগত্য করা জনগণের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।

শাসক ও শাসিত উভয়ই আল্লাহ্র খলীফাহ। শেষ বিচারের দিন তাদের উভয়কেই আল্লাহ্র সামনে হাযির হয়ে নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। তবে শাসিতের চেয়ে শাসকের দায়িত্ব অনেক বেশী।

### পাঁচ ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার বা যেকোন সরকারী কর্মচারীকে আদালতে হাযির হবার জন্যে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাধারণ নাগরিকদের থেকে ভিন্ন আচরণ করা হবে না। কুর'আন মজীদে ন্যায়বিচার সম্বন্ধে বহু নির্দেশ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা (সূরাহ আন্-নিসা'- ৪ ঃ ৫৮ ও ১৩৫; সূরাহ আল-মায়িদাহ- ৫ ঃ ৮)। শাসক ও সরকারের বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই।

### ছয় ঃ আইনের চোখে সমতা

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সকল নাগরিকের জন্যে আইনের চোখে সমতার নিশ্চয়তা বিধান করে। ইসলামী ব্যবস্থায় ভাষা, বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র, ধর্ম ও নারী-পুরুষ ভেদে কোনরূপ বৈষম্য করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাক্ওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে, যিনি সব চেয়ে বেশী তাকওয়ার অধিকারী তিনিই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি। (সূরাহ হুজুরাত-৪৯ ঃ ১৩)

### উপসংহার

একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে ছালাত ও যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করা, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং মন্দকাজ প্রতিহত করা। (সূরাহ আল-হাজ্জ- ২২ ঃ ৪৪) মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের দয়িত্ব। রাষ্ট্রকে অবশ্যই মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার) নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই ধর্মবিশ্বাস, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। প্রতিটি নাগরিকই নিজ নিজ মেধা-প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ, ধনসম্পদ উপার্জন ও তার মালিকানা সংরক্ষণের ব্যাপারে

কুর'আন-সুন্নায় বর্ণিত সীমারেখার মধ্যে স্বাধীনতার অধিকারী হবে। যে কোন নাগরিক সরকারের যে কোন নীতিকে ঠিক বা ভুল মনে করলে তার সমর্থন বা বিরোধিতা করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ

ক) ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কুর'আন-সুন্নাহর আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য কর্তব্য। যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না কুর'আন্ মজীদ তাদেরকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে। (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ -৫ ঃ ৪২-৫০)

খ) একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রকে অবশ্যই সম্পদের সুষম ও ইনসাফসম্মত বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। ইসলাম সমবন্টনকে সমর্থন করে না। কারণ তা প্রাকৃতিক বিধান এবং মানুষের মৌলিক প্রকৃতি ও সহজাত প্রবণতার বিরোধী বা বিপরীত।

বর্তমানে বিশ্বে কোন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র নেই। বিশ্বে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র তা-ই যা মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আদর্শে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে এমন দেশ যেখানকার সংখ্যাগুরু জনগণ মুসলমান এবং সেই সাথে কিছু কিছু ইসলামী বৈশিষ্ট্যও সে রাষ্ট্রের রয়েছে।

সে যা-ই হোক, কুর'আন-সুন্নাহর আইন-কানুন বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যেসব সংগঠন ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ মধ্যপ্রাচ্যে আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন; পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও কাশ্মীরে জামা'আতে ইসলামী, ইন্দোনেশিয়ায় নাহ্‌দাতুল উলামা ও দেওয়ান দাক্‌ওয়াহ্ ইসলামিয়াহ (ডিডিআইআই); আলজিরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (এফআইএস); সূদানে ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (বর্তমানে বেআইনী ঘোষিত); মালয়েশিয়ায় পার্টি আল-ইসলাম সে-মালায়সিয়া (পিএএস), তিউনিসিয়ায় হিযবুন নাহ্‌দাহ ও তুরস্কে মিল্লী সালামাত পার্টি। পরে মিল্লী সালামাত পার্টির নাম পরিবর্তন করে হিযবে রিফাহ রাখা হয়, কিন্তু দলটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। অতঃপর এ দলের লোকেরা হিযবে ফাযীলাত নামে নতুন দল গঠন করেন। কিন্তু ২০০১ সালের জুন মাসে হিযবে ফাযীলাতকেও বেআইনী ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে তুরস্কে Justice and development party ক্ষমতাসীন। এ দল মিল্লী সালামাত পার্টির উত্তরসূরী।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আরো বহু ইসলামী সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।

মিসর, পাকিস্তান, সূদান, ইরান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, আলজিরিয়া ও অন্যান্য দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের যে চেষ্টা চলছে তাতে সারা বিশ্বের মুসলিম জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে বিরাট আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এ আশাবাদ কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যদি মুসলমানদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল হয়। কেবল তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সাফল্য প্রদান করবেন। আশা করা যায় যে, এসব প্রচেষ্টার ফলে কোথাও না কোথাও একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটবে যা গোটা বিশ্বকে ন্যায়বিচার, ও সুখ-শান্তির দিকে পথপ্রদর্শন করবে।

## অনুশীলনী–১০

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। “রাজনীতি দ্বীন ইসলামের অঙ্গ।” উক্তিটি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। “পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।” এ ব্যাপারে তোমার অভিমত যুক্তিসহ পেশ কর।

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। ইসলামের ‘শূরা’ নামক সংস্থা ও খিলাফত মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করা সম্ভব নয় কেন? অনেক সমাজই ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করতে চায় কেন?

২। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুযায়ী বিশ্বের বুকে একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কি করা প্রয়োজন? যেসব আধুনিক দেশকে ‘ইসলামী’ বলে উল্লেখ করা হয় সে সব দেশে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। ইসলামের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা কর। গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত ধারণার সাথে তার বৈপরীত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

# এগার ঃ মানবজীবনের আরো কয়েকটি দিক

## খাদ্য ও পানীয়

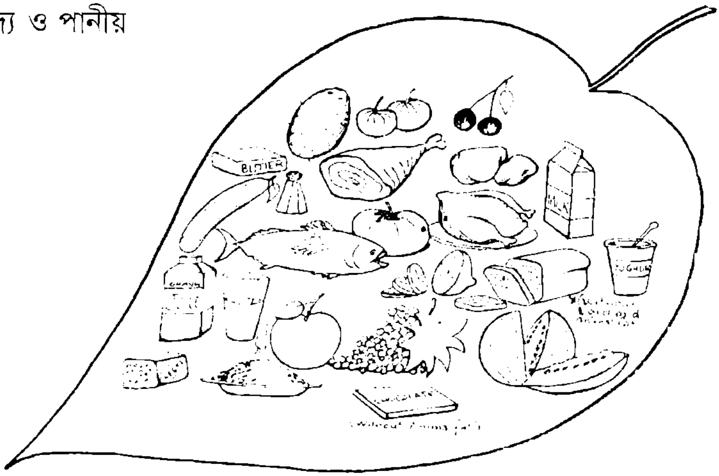

খাদ্য ও পানীয় আমাদের স্বাস্থ্য, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক অবস্থার ওপর বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

ইসলাম আমাদের খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বিধি-বিধান দিয়েছে। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে একটি সুস্থ ও নৈতিকতাসম্পন্ন সমাজ গঠন করা। তাই ইসলাম সকল প্রকার স্বাস্থ্যকর ও পবিত্র খাদ্যবস্তু ও পানীয় গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছে। কুর্'আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ○

–"হে মানবকুল! পৃথিবীর বুকে যে হালাল ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য আছে তা খাও এবং শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরাহ্ আল-বাকারাহ্-২ ঃ ১৬৮)

ইসলাম কেবল সেই সব জিনিসকে হারাম করেছে যা অপবিত্র ও ক্ষতিকর।

ইসলাম নিম্নলিখিত প্রাণীর (পশু ও পাখীর) গোশত হারাম ঘোষণা করেছে ঃ

ক) মৃত প্রাণী (অর্থাৎ যেসব প্রাণী যবেহ্ করা ছাড়াই প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যুবরণ করেছে)।

খ) আল্লাহ্‌র নাম নেয়া ছাড়াই যেসব প্রাণী যবেহ্ করা হয়েছে।

গ) যেসব প্রাণী শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেছে।

ঘ) শূকর।

ঙ) মাংসাশী প্রাণী।

চ) বন্য পশু যে প্রাণীকে শিকার করেছে।

ইসলাম হালাল প্রাণীর ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত রক্তও হারাম করেছে। (সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ১৭৩; আল-মায়িদাহ - ৫ ঃ ৩; আল-আন্'আম- ৬ ঃ ১৪৫; আন্-নাহ্ল- ১৬ ঃ ১১৫)

ইসলাম প্রাণীদের জীবন রক্ষার ও তাদের প্রতি যত্নবান হবার শিক্ষা দেয়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট দয়া যে, তিনি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্যে অনেক প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। তবে এসব প্রাণীর গোশত খাওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় যবেহ্ করতে হবে। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে, এমন ধারালো ছুরি দিয়ে প্রাণীকে যবেহ্ করতে হবে যা তার ঘাড়ের মধ্য পর্যন্ত প্রবেশ করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণীটি যেন খুব তাড়াতাড়ি মারা যায় এবং তার মধ্য থেকে যত বেশী পরিমাণ সম্ভব রক্ত বেরিয়ে যায়। যবেহ্ করার সময় অবশ্যই আল্লাহ্‌র নাম নিতে হবে।

কোন প্রাণীকে এ নিয়মে যবেহ্ করা না হলে তার গোশ্ত ও অন্যান্য উপজাত হারাম হয়ে যাবে। তাই অমুসলিম প্রধান দেশে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে গোশত কিনে খাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মুসলমান কসাইর যবেহ্ করা গোশত কিনতে হবে যাতে তা হালাল হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। কাছাকাছি মুসলমান কসাই না থাকলে যে ইয়াহূদী কসাই ইয়াহূদী ধর্মের বিধান অনুযায়ী যবেহ্ করে তার যবেহ্ করা হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে। কারণ তা মুসলমানদের জন্য হালাল। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে গোশত না খেয়ে শাক-সব্জি খেতে হবে বা হালাল মাছ খেতে হবে।

এ্যালকোহলযুক্ত সব ধরনের পানীয়, যেমন ঃ বিয়ার, মদ, হুইস্কি, স্পিরিট ইত্যাদি হারাম। আসলে কোন সুস্থ সমাজেই এ্যালকোহলযুক্ত পানীয় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কুর'আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ○

–"হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে শরাব (মাদক পানীয়), জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ– এসব হচ্ছে শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে দূরে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার। নিঃসন্দেহে শয়তান মাদক পানীয় ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ছালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। অতএব, তোমরা কি (এসব থেকে) বিরত থাকবে?" (সূরাহ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ৯০-৯১)

মাদক পানীয় সমাজে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে। মাদক পানীয় পান থেকে নানা রকম পাপকাজের উদ্ভব হয়। সুস্থ ও শান্তিময় সমাজের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ইসলাম সকল পাপাচারের মূলোৎপাটন করতে চায়। এছাড়া ইসলাম রোগের চিকিৎসায় অপরিহার্য না হলে মাদকতাযুক্ত ওষুধ (ড্রাগ) গ্রহণকেও হারাম করেছে।

মুসলমানরা *'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম'* (পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে) বলে খাওয়া শুরু করে এবং নীচের দু'আ পড়ে শেষ করে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(আলাহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন।)

–"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে খাদ্য দিয়েছেন, আমাদেরকে পান করিয়েছেন ও আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদেরকে ডান হাত দিয়ে খেতে এবং খাবার আগে ও পরে হাত ধুতে বলেছেন। পুরোপুরি পেট ভরে না খাওয়া উত্তম। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে পানি বা অন্যান্য কোমল পানীয় এক নিঃশ্বাসে না খাবার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। বরং আমাদেরকে থেমে থেমে পান করতে বলেছেন; তিন নিঃশ্বাসে পান করাই বেশী ভাল।

ইসলামী জীবনব্যবস্থার দেয়া আইন-কানুন ও বিধি-বিধানসমূহ মানুষের জন্য খুবই উপকারী। তাই আমাদের এসব আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সাধ্যানুযায়ী মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান এড়িয়ে চলার জন্যে ছুতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা কিছুতেই উচিত নয়; বরং আমাদের এগুলো মেনে চলার জন্যে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করা উচিত।

## পোশাক-পরিচ্ছদ

ইসলাম আমাদের সমাজকে সুন্দর, সুশীল ও সুমহান করার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সব চেয়ে সুন্দর আকৃতি ও দেহকাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি চান যে, তাঁর বান্দাহরা সুন্দর ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করুক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম প্রাণী এবং আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে তা অবশ্যই প্রতিফলিত হওয়া উচিত। যথাযথ পোশাক-পরিচ্ছদ অসৌন্দর্য ও অনৈতিক আচরণ প্রতিহত করে এবং আমাদের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করে।

কুর'আন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ

ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ

–"হে আদম-সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে এবং যা সৌন্দর্যের উপকরণ। আর তাকওয়ার পোশাকই উত্তম।" (সূরাহ আল-আ'রাফ-৭ ঃ ২৬)

ইসলাম আমাদেরকে কোন বিশেষ ধরনের বা ডিজাইনের পোশাক পরার জন্যে বলেনি। তবে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে কতগুলো দিকনির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

১। পুরুষদের কম পক্ষে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।

২। নারীদেরকে ঘরে থাকাকালে তাদের মুখমণ্ডল বা চেহারা, হাত ও পা বাদে সারা শরীর ঢেকে রাখতে হবে। কিন্তু বাইরে বের হলে বা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (মাহ্‌রাম) বাদে অন্য কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাথে সাক্ষাতকালে তাদেরকে হিজাব বা পর্দাসহ সারা শরীর ঢেকে রাখতে হবে। অবশ্য কিছু সংখ্যক ফাকীহ্ (ইসলামী আহ্‌কাম বিশেষজ্ঞ) পুরো চেহারা (Face) খোলা রাখাকে বৈধ বলেছেন।

৩। নারী বা পুরুষ কেউই এমন পোশাক পরতে পারবে না যা দর্শকের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করে। যেমন ঃ এমন পাতলা পোশাক যার ভিতর দিয়ে শরীরের রং বা আকৃতি দেখা যায়, যে পোশাক শরীরের সাথে শক্তভাবে লেপ্টে থাকে (স্কিনটাইট) বা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতিকে ফুটিয়ে তোলে।

৪। পুরুষদের জন্যে পুরোপুরি রেশম (সিল্ক) কাপড়ের তৈরী পোশাক বা স্বর্ণালংকার পরিধান করা নিষিদ্ধ।

৫। পুরুষের জন্য নারীদের পোশাক ও নারীদের জন্য পুরুষের পোশাক পরা নিষেধ।

৬। মুসলমানদের জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় নিদর্শনবাহী পোশাক পরিধান করা নিষেধ।

ইসলাম সহজ-সরল ও সাদাসিধা চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শালীনতাকে উৎসাহিত করে। যে সব পোশাক-পরিচ্ছদে অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় তাকে অপসন্দ করা হয়েছে। পোশাকের ধরন-ধারণ বা ডিজাইন স্থানীয় রীতিনীতি ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই উপরের পথনির্দেশসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

উৎসব, উদযাপনী ও স্মরণীয় দিন

অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামেও উদযাপনের জন্যে কয়েকটি বিশেষ উপলক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। তবে এসব উপলক্ষ্য কেবল আনন্দলাভের জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আন্তরিকতা ও ভক্তি সহকারে উদযাপন করা হয়।

ইসলামের উৎসবগুলো মূলতঃ একই সাথে আল্লাহ্‌র নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন ও আনন্দলাভের মাধ্যম। ইসলামের দু'টি প্রধান বার্ষিক উৎসব হচ্ছে 'ঈদুল ফিত্‌র্‌ ও 'ঈদুল আয্‌হা।

রামাদান মাস শেষ হবার পর শাউয়াল মাসের প্রথম দিনে 'ঈদুল ফিত্‌র্‌ উদযাপিত হয়। একমাস ছাওম পালনের পর মুসলমানরা এদিন জামা'আতে 'ঈদের ছালাত আদায় করার মাধ্যমে আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করে থাকে। সম্ভব হলে এ ছালাত খোলামাঠে বা 'ঈদগাহে আদায় করা হয়, নয়ত কোন মসজিদে আদায় করা হয়।

মূলতঃ মুসলমানরা দীর্ঘ একমাস ব্যাপী ছাওম আদায়ে সক্ষম হওয়ায় এ ছালাতের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট শুকরিয়া জানায়। মুসলিম দেশসমুহে এদিন সাধারণতঃ জাতীয় ছুটি দেয়া হয়। এদিন সকলের ঘরেই সাধ্যমত ভাল ভাল খানাপিনা

তৈরী করা হয় এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে ও আপ্যায়ন করে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে 'ঈদ উপলক্ষ্যে উপহার দেয়া হয়। এদিন সাধারণতঃ সকল মুসলমানই সাধ্যমত নিজ নিজ ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে।

যুলহিজ্জাহ মাসের দশম তারিখ হচ্ছে 'ঈদুল আয্‌হা। এদিন পশু কুরবানী করা হয়। এর পরবর্তী তিন দিনও পশু কুরবানী করা যায়; এ তিনদিনকে আইয়ামুত্‌ তাশ্‌রীক বলা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে তাঁর পুত্র হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)কে কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হন এবং হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানী করার নির্দেশ দেন। এ ঘটনার স্মরণেই 'ঈদুল আয্‌হা উদযাপিত হয়।

প্রতি বছর হাজ্জের পর 'ঈদুল আযহা সমুপস্থিত হয়। সারা বিশ্বের মুসলমানরা 'ঈদুল ফিত্‌রের ছালাতের ন্যায় জামা'আতে 'ঈদুল আযহার ছালাত আদায়ের মাধ্যমে 'ঈদুল আযহা উদযাপন শুরু করে। ছালাতের পরে স্বচ্ছল মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু বা উট কুরবানী করে। কুরবানীর গোশত যেমন কুরবানীদাতা ও

তার পরিবারের সদস্যরা খায় তেমনি তা থেকে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করে।

কুরবানীর মাধ্যমে একজন মুসলমান তার অন্তরের এই অনুভূতিকে প্রকাশ করে যে, প্রয়োজনে তার প্রিয় ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর রাস্তায় কুরবানী (ব্যয় বা দান) করবে। এটাই হচ্ছে 'ঈদুল আযহার শিক্ষা।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট থেকে কুরবানীর পশু বা তার গোশত বা রক্ত চান না। বরং তিনি চান আমাদের আন্তরিকতা ও তাঁর হুকুমের প্রতি আনুগত্য। (সূরাহ আল-হাজ্জ- ২২ ঃ ৩৭)

ইসলামের অন্যান্য উদযাপনী উপলক্ষ্যগুলো হচ্ছে লাইলাতুল কাদ্‌র, (কদরের রাত- ২৭শে রামাযানের পূর্বরাত) ও 'আরাফাহ দিবস (৯ই যুলহিজ্জাহ্)। এছাড়া রয়েছে 'আশূরার দিন (১০ই মুহার্‌রাম)।

প্রতি শুক্রবার যে ছালাতুল জুমু'আহ্ আদায় করা হয় তা-ও মুসলমানদের জন্য একটি সাপ্তাহিক উৎসবদিবস হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ এ দিন তারা ব্যাপকভাবে একত্রিত হয় এবং খুৎবাহ্ শোনে ও জামা'আতে ছালাত আদায় করে।

ইসলামী উপলক্ষ্যগুলো ইসলামী চান্দ্র পঞ্জিকা অনুযায়ী উদযাপন করা হয়। চান্দ্র বর্ষ সৌর বর্ষের তুলনায় প্রায় এগার দিন ছোট। নতুন চাঁদ দেখে চান্দ্র মাসের প্রথম দিন নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে হিসাব করে এসব উপলক্ষ্যের দিন নির্ধারণ করা হয়।

বস্তুতঃ একজন নিষ্ঠাবান দ্বীনদার মুসলমান যখন আজকের বিশ্বে অন্যায়-অনাচার, বেইনসাফী, অবিচার, বৈষম্য ও জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন দেখতে পায় তখন সে নিজেকে খুবই অসুখী অনুভব করে, মনে কষ্ট পায়। বিশ্বের অনেক জায়গার মুসলমানদের ওপর খারাপ নেতৃত্ব চেপে বসে আছে এবং তারা ক্ষুধা-দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে।

বিশ্বের অন্য অনেক অংশের মুসলমানরা কেবল মুসলমান হবার কারণেই নির্যাতিত ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। তাই এমন কি আনন্দ-উৎসবের দিনেও মুসলমানরা যখন তাদের তুলনায় হতভাগ্য ঐসব মুসলমানদের কথা মনে করে তখন তারা অন্তরে দুঃখ অনুভব করে।

যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব দেশে অনেক সময় চাঁদ দেখা নিয়ে বিতর্কের কারণে বিভিন্ন দিনে 'ঈদ উদযাপিত হয়। কিন্তু মুসলমানরা যদি একত্রে 'ঈদ উদযাপন করতে না পারে তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে না। তাই এ অবাঞ্ছিত

সমস্যার সমাধানের জন্যে মুসলমানদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য চেয়ে দু'আ করা দরকার। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও রহমত নাযিল হলে সমাজে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুসলমানরা যথার্থভাবে তাদের উৎসবের দিনগুলো উদযাপন করতে পারবে যা তাদেরকে সুখী ও আনন্দিত করবে।

## অনুশীলনী (এগার)

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। ইসলামের দেয়া খাদ্য-পানীয় সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো কি? মুসলমানদের জন্য যেসব জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ তার একটি তালিকা তৈরী কর।

২। পোশাক সম্বন্ধে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো কি? শালীন পোশাক বলতে কি বুঝায় এবং তা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩। ইসলামের উৎসবসমূহের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখ।

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ইসলামের পোশাক সংক্রান্ত বিধি-বিধানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। মুসলিম পুরুষদের অশালীন পোশাক পরিধানের উদাহরণ দাও।

২। সামগ্রিকভাবে সমাজে মাদক পানীয় প্রচলনের খারাপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। কেন "আমরা খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যা করব।" বিশ্বে নিরামিষ-ভোজীদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে গোশত খাওয়া সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

## বার ঃ বিভিন্ন বিষয়ে কুর'আন মজীদের কিছু বাছাই করা আয়াত

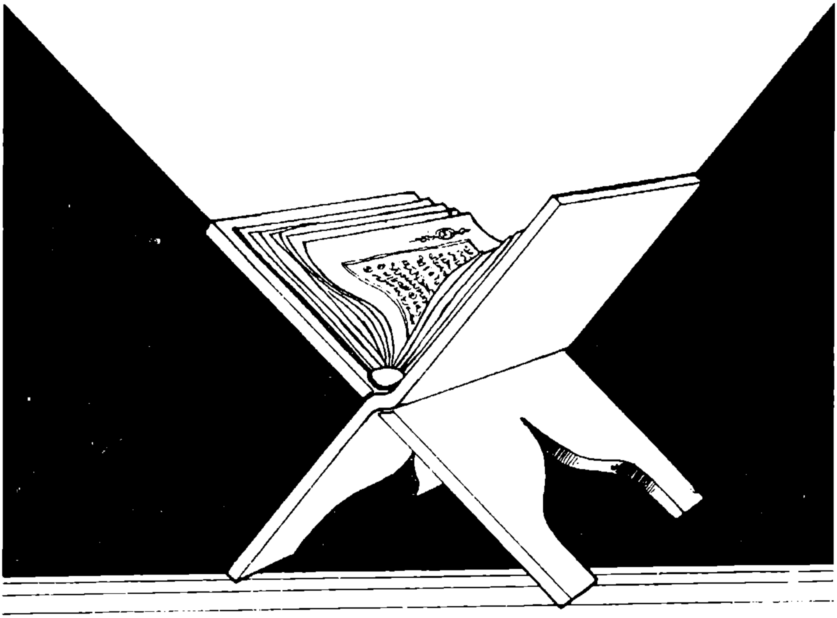

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

–"অবশ্যই এই কুর'আন সেই দিকে হেদায়াত (পথপ্রদর্শন) করে যা সুদৃঢ়তম এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।" (সূরাহ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৯)

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

–"আর (তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন এই বলে যে,) এ হচ্ছে আমার (দেয়া) সরল সঠিক পথ, অতএব, তোমরা এ পথের অনুসরণ কর এবং অন্য সব পথের অনুসরণ করো না, কারণ তা হলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তিনি

তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার।" (সূরাহ আল-আন্'আম- ৬ ঃ ১৫৩)

## তাওহীদ

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا
فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ
أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا
شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ
وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥

–"আল্লাহ্– তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই; তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে যে তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর সামনে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে (ভবিষ্যতে) যা আছে ও তাদের পিছনে (অতীতে) যা আছে তা তিনি জানেন এবং তিনি যা (দিতে) ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞান থেকে আর কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন (কর্তৃত্ব-আধিপত্য) আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত; আর এতদুভয়কে হেফাযত করতে তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হয় না এবং তিনি সমুন্নততম ও মহানতম।"(সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২৫৫)[১]

## রিসালাহ্

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ
وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ... ٣٦

–"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি (এ বাণীসহ) যে, তোমরা (একমাত্র) আল্লাহ্র 'ইবাদাত কর এবং মিথ্যা খোদা ও দেবদেবীদের (তাগুত্) থেকে দূরে থাক।" (সূরাহ আন্-নাহ্ল– ১৬ ঃ ৩৬)

[১] এ আয়াতটিকে আয়াতুল কুর্সী বলা হয়

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

-"আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিকট তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত-সমূহ পড়ে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব (আল্লাহ্‌র আইন-কানুন ও বিধি-বিধান) ও হিকমাহ শিক্ষা দেন অথচ তারা অনেক পূর্ব থেকেই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।" (সূরাহ আলে 'ইমরান- ৩ ঃ ১৬৪)

ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

-"তিনিই (আল্লাহ্‌ই) তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে দেন, মুশরিকরা তা যতই না অপসন্দ করুক।" (সূরাহ আছ্-ছাফ- ৬১ ঃ ৯)

## আখিরাহ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٧﴾

-"হে লোক সকল! তোমরা যদি (তোমাদেরকে) পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে সন্দেহে থেকে থাক তো (ভেবে দেখ,) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর বীর্য ও ডিম্বের নিষিক্ত অবস্থা থেকে, এপর পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ মাংসপিণ্ড থেকে যাতে আমি তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টিক্ষমতাকে) সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরি। এরপর আমি যা চাই তা একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মাতৃগর্ভে রেখে দেই, এরপর (তোমাদেরকে বৃদ্ধি পেতে দেই) যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায় এবং কেউ অথর্ব বার্ধক্যে উপনীত হয় যাতে সে আর জানা বিষয়েও জ্ঞাত থাকে না। আর তুমি ভূমিকে অনুর্বর দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তার ওপর পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে ওঠে এবং তাতে সকল প্রকার মনোরম সুদৃশ্য উদ্ভিদ জন্ম নেয়। এরূপ আল্লাহ্‌র কারণেই হয়ে থাকে এবং তিনি সত্য, তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাবান। সেই সময় (কিয়ামত) অবশ্যই আসবে; এতে কোনই সন্দেহ নেই, আর যারা কবরে আছে আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন।" (সূরাহ আল-হাজ্জ - ২২ ঃ ৫-৭)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾

-" যারা কাফির হয়েছে তারা বলে ঃ আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা যখন মাটি হয়ে যাব তারপরও কি আমাদেরকে পুনরায় বের করে আনা হবে (জীবিত করা হবে)?" (সূরাহ আন্-নাম্‌ল- ২৭ ঃ ৬৭)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

-"তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না?" (সূরাহ আল-মু'মিনুন- ২৩ ঃ ১১৫)

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ
وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

-"আর আল্লাহ্ সত্যতাসহকারেই আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা এ জন্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেন সে যা অর্জন করেছে তদ্রুপ প্রতিদান দেয়া হয়; এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" (সূরাহ আল-জাছিয়াহ- ৪৫ ঃ ২২)

## মু'মিনের গুণাবলী

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ
فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ
أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ
لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ
ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾

–"মু'মিনগণ সফলকাম যারা তাদের ছালাতে বিনয়নম্র, আর যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে; আর যারা যাকাত প্রদান করে, আর যারা স্বীয় স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের কাছে ব্যতীত নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে (সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখে) তাহলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর যে এ ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করবে সে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা মানত ফিরিয়ে দেয় ও ওয়াদা রক্ষা করে, আর যারা তাদের ছালাতের হেফাযত করে (ছালাতের ব্যাপারে মনোযোগী থাকে), তারাই উত্তরাধিকারী– যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (সূরাহ মু'মিনুন– ২৩ ঃ ১-১১)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

–" হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ঠিক যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম (আল্লাহ্র প্রতি অনুগতআত্মসমর্পিত) অবস্থায় ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১০২)

## পুত্রের প্রতি হযরত লুকমান[১] (আঃ)-এর উপদেশ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

–"আর (স্মরণ কর) লুকমান যখন তার পুত্রকে বলল– আর সে তাকে উপদেশ দিচ্ছিল ঃ হে আমার পুত্র! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না; নিঃসন্দেহে শির্‌ক (আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা) মহাঅন্যায় (মারাত্মক পাপ)।" (সূরাহ্ লুকমান– ৩১ ঃ ১৩)

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ
مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ
مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨ وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ
وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

–"হে আমার পুত্র! ছালাত কায়েম কর, ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর, আর বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিঃসন্দেহে এটা দৃঢ়তার পরিচায়ক। আর অংহকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীর বুকে গর্ভভরে পথ চলো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দাম্ভিক-অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আচরণে মধ্যম পথাবলম্বী (ভারসাম্যপূর্ণ) হও, ও তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সব চেয়ে বিরক্তিকর।" (সূরাহ্ লুকমান– ৩১ ঃ ১৭-১৯)

## দায়িত্ব-কর্তব্য

### পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

...وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا... ٨٣

–"... পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদাচরণ ও তাদের কল্যাণ করবে এবং মানুষের সাথে ভালভাবে (সৌজন্য, ভদ্রতা ও বিনয় সহকারে) কথা বলবে। ..." (সূরাহ্ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৮৩)

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ
وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤

১. তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের জন্যে সমগ্র আরবে সুপরিচিত ছিলেন। যদ্দুর সম্ভব তিনি আরবীবাসী আফ্রিকান ছিলেন। তিনি নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।

–"আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের ওপর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, আর তাকে দুধ ছাড়াতে দু'বছর লাগে। (তাকে এ নির্দেশও দিয়েছি যে,) আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।" (সূরাহ লুকমান– ৩১ : ১৪)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى
صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

–"তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ বা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে (বিরক্তিসূচক) 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে দয়ার্দ্রভাবে ও সম্মান সহকারে কথা বল। তাদের জন্য ভালবাসা ও দয়ার্দ্রতার সাথে বিনয়নম্রতার পাখা বিস্তার করে দাও (বিনয়পূর্ণ আচরণ কর), আর বল : হে আমার রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করুন। ঠিক যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।" (সূরাহ বানী ইসরাঈল– ১৭ : ২৩-২৪)

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ
بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

–"আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। তারা যদি আমার সাথে কোন কিছু শরীক করার জন্যে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই (তুমি জান যে, আল্লাহ্র কোন শরীক নেই) তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করছিলে।" (সূরাহ আল-'আনকাবুত– ২৯ : ৮)

## সামাজিক সৎগুনাবলী
### আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অভাবীদের প্রতি কর্তব্য

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

**–"আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে তাদের হক প্রদান কর এবং কিছুতেই অপচয় করো না।" (সূরাহ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ২৬)**

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ ... ﴿٩١﴾

**–"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, দয়া ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করার জন্যে আদেশ করেন ....।" (সূরাহ আন্-নাহ্ল– ১৬ ঃ ৯০)**

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ
فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

**–"(মীরাছ) বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও অভাবগ্রস্তরা হাযির হয় তখন তা থেকে তাদেরকে খানাপিনা করাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর।" (সূরাহ আন্–নিসা'- ৪ ঃ ৮)**

... وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ... ﴿٣٦﴾

**–"... আর পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ কর, এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সফরসঙ্গী ও অসহায় মুসাফির এবং দাসদাসীদের প্রতিও।" (সূরাহ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ৩৬)**

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى
يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

–"আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন যে পরকালকে অস্বীকার করে? সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতিমকে গলাধাক্কা দেয় এবং অভাবীদেরকে খাওয়ানোর জন্যে (অন্যদেরকে) উৎসাহিত করে না।" (সূরাহ আল-মা'উন–১০৭ ঃ ১-৩)

## ইয়াতীমের অধিকার

فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

–"অতএব, ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না।" (সূরাহ আদ্-দুহা– ৯৩ ঃ ৯)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى
بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

–"নিঃসন্দেহে যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় কার্যতঃ তারা আগুন দ্বারা তাদের পেট পূর্ণ করে, আর শীঘ্রই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।" (সূরাহ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ১০)

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ... ﴿٢﴾

–"ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও, আর ভাল মালকে খারাপ মালের সাথে বদল করে নিও না। ..." (সূরাহ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ২)

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ... ﴿١٥٢﴾

–" কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যতীত ইয়াতীমদের সম্পদের কাছেও যেয়ো না যতদিন না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।" (সূরাহ আল-আন্'আম– ৬ ঃ ১৫২; সূরাহ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৩৪)

## সামাজিক আচরণ

### ভ্রাতৃত্ব

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

–"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব, তোমার ভাইদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করিয়ে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা (আল্লাহ্‌র নিকট থেকে) দয়াপ্রাপ্ত হও।" (সূরাহ হুজুরাত– ৪৯ ঃ ১০)

### সালাম বিনিময় বা সম্ভাষণ

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِنَا فَقُلْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ ... ﴿٥٤﴾

–" যারা আমার নিদর্শনাদির (আয়াতের) উপর ঈমান পোষণ করে তারা যখন তোমার নিকট আসবে তখন তাদেরকে বল ঃ তোমাদের ওপর শান্তি।" (সূরাহ আল-আন'আম– ৬ ঃ ৫৪)

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟
بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

–"কেউ যখন তোমাদেরকে সম্ভাষণ করে তখন তার চেয়েও উত্তম সম্ভাষণ কর, অথবা অনুরূপভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরাহ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ৮৬)

... فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ
تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةً طَيِّبَةً ... ﴿٦١﴾

–" ... অতঃপর তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বরকতময় ও পবিত্র সম্ভাষণ (এর কথা উল্লেখ ) সহকারে তোমাদের নিজেদের ওপর (পারস্পরিকভাবে) সালাম কর।" (সূরাহ আন্-নূর–২৪ ঃ ৬১)

## সহযোগিতা

...وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ... ﴿٢﴾

–"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপকর্ম ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করো না।" (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্ – ৫ ঃ ২)

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ... ﴿١٠٣﴾

–"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রশি (ইসলাম)কে মযবূতভাবে আকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ো না। ..." (সূরাহ্ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১০৩)

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ... ﴿٧١﴾

–"আর ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ পরস্পরের সহায়ক; তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে। ..." (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্– ৯ ঃ ৭১)

## সভা-মজলিস

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ... ﴿٧١﴾

–"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় ঃ 'মজলিসে জায়গা করে দাও,' তখন জায়গা করে দিও; আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে জায়গা করে দেবেন। যখন বলা হয় ঃ 'উঠে যাও' তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যারা জ্ঞানবান আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করে দেবেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবগত।" (সূরাহ্ আল-মুজাদিলাহ্– ৫৮ ঃ ১১)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ
عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ... ﴿٦٢﴾

**–"প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং কোন সামষ্টিক ব্যাপারে তাঁর (রাসূলের) সাথে (পরামর্শসভায়) থাকলে তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে যায় না। (হে রাসূল!) নিঃসন্দেহে যারা আপনার নিকট অনুমতি চায় তারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলে ঈমান পোষণ করে। ..." (সূরাহ্‌ আন্‌-নূর– ২৪ ঃ ৬২)**

وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ
وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

**–"পথচলার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে চল এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সবচেয়ে বিরক্তিকর।" (সূরাহ্‌ লুকমান– ৩১ ঃ ১৯)**

## কারো ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟
وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ... ﴿٢٨﴾

**–"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘরে ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর ও গৃহবাসীদেরকে সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; আশা করা যায় যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। তোমরা যদি গৃহে কাউকে না পাও তাহলে (তোমাদেরকে) অনুমতি দেয়ার পূর্বে তাতে প্রবেশ করো না। ..." (সূরাহ্‌ আন্‌-নূর– ২৪ ঃ ২৭-২৮)**

## ওয়াদা পালন

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ ... ﴿١﴾

–"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ কর।" (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ১)

... وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

–"... তোমরা ওয়াদা পূরণ কর; নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৩৪)

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ ... ﴿٢٣﴾

**–"মু'মিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত তাদের ওয়াদা পালন করেছে। ..." (সূরাহ্ আল-আহ্যাব– ৩৩ ঃ ২৩)**

وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ ... ﴿١٧٧﴾

–"... (সৎকর্মশীল তারা) যারা তাদের কৃত ওয়াদা পালনকারী ...।" (সূরাহ্ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ১৭৭)

## মৌলিক সৎগুণাবলী

### সততা

وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ... ﴿٣٥﴾

**–"যখন (পাত্র দিয়ে) মেপে দেবে তখন সঠিকভাবে মেপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। ..." (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৩৫)**

وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾

–" আর তোমরা ন্যায্য ওজন করবে এবং পরিমাপে কম করবে না।" (সূরাহ্ আর্-রাহ্মান– ৫৫ ঃ ৯)

...وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ... ﴿١٥٢﴾

–"আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ভারসাম্য সহকারে ও ন্যায়ভাবে কথা বলবে যদিও নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে (বা তাদের সাথে) হয়। ..." (সূরাহ্ আল-আন্'আম– ৬ ঃ ১৫২)

সত্যবাদিতা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

–"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ– ৯ ঃ ১১৯)

لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ
إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ... ﴿٢٤﴾

–"যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং চাইলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন ...।" (সূরাহ্ আল-আহ্যাব– ৩৩ ঃ ২৪)

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ
وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ
...أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

–"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী ... আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।" (সূরাহ্ আল-আহ্যাব– ৩৩ ঃ ৩৫)

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ
يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

–"আল্লাহ্ বললেন ঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা উপকৃত করবে; তাদের জন্যে বেহেশত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হচ্ছে; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র ওপর সন্তুষ্ট। আর এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য।" (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ১১৯)

## ধৈর্য, দৃঢ়তা ও ক্ষমা

...ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ... ﴿١٢٨﴾

–"... তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাও ও ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র; তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকার দান করেন।" (সূরাহ আল-আ'রাফ– ৭ ঃ ১২৮)

...رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

–"... হে আমাদের রব! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ করে দাও, আর আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২৫০)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

–"যে ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে নিঃসন্দেহে তা দৃঢ়তার পরিচায়ক।" (সূরাহ আশ্-শূরা– ৪২ ঃ ৪৩)

وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

–"(হে রাসূল!) তারা (কাফেররা) যা কিছু বলে তার মুকাবিলায় ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদেরকে নম্রতার সাথে এড়িয়ে চলুন।" সূরাহ আল- মুয্‌যাম্মিল– ৭৩ ঃ ১০)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

–"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য (দৃঢ়তা) ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের (দৃঢ়তার অধিকারীদের) সাথে আছেন।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ১৫৩)

...وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ
صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

–"... আর যারা অভাব অভিযোগে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধে ধৈর্য-ধারণকারী, তারাই সত্যানুসারী এবং তারাই মুত্তাকী।" (সূরাহ্ আল-বাকারাহ্– ২ ঃ ১৭৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ
وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

–"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় অগ্রবর্তী হও, (দুশমনদের প্রতি) সতর্ক দৃষ্টি রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।" (সূরাহ্ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ২০০)

فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾

–"অতএব (হে মুহাম্মাদ!) উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন।" (সূরাহ্ আল-মা'আরিজ– ৭০ ঃ ৫)

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ... ﴿٣٥﴾

–"অতএব (হে মুহাম্মাদ!) দৃঢ়তার অধিকারী রাসূলগণ যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছিলেন সেভাবে ধৈর্যধারণ করুন (দৃঢ়তার পরিচয় দিন) ...।" (সূরাহ্ আল-আহ্‌কাফ– ৪৬ ঃ ৩৫)

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

–"ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের থেকে দূরে থাক।" (সূরাহ্ আল-আ'রাফ– ৭ ঃ ১৯৯)

## নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা

...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

–"... নিশ্চয়ই মু'মিনদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায়কে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।" (সূরাহ্ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ১০৩)

### সাহস

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

–"যাদেরকে লোকেরা বলেছে ঃ 'নিঃসন্দেহে জেনে রেখো, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের জন্য) সমবেত হয়েছে, অতএব তাদেরকে ভয় কর,' তাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি

পেয়েছে এবং তারা (মু'মিনগণ) বলে ঃ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার নির্ভরস্থল!" (সূরাহ্ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৭৩)

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

–"মু'মিনরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন বলল ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।' এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধি পেয়েছে।" (সূরাহ্ আল-আহ্যাব– ৩৩ ঃ ২২)

দয়া

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ... ﴿١٥٩﴾

–"অতএব, হে মুহাম্মদ আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছেন। আর আপনি যদি রূঢ় ও কঠোরহৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার চারদিক থেকে সরে যেত। অতএব, তাদেরকে ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা চেয়ে দু'আ করুন এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। ..." (সূরাহ্ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৫৯)

... وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ... ﴿٧٧﴾

–"... আর দয়া কর ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করেছেন।..." (সূরাহ্ আল-ক্বাছাছ– ২৮ ঃ ৭৭)

## বিশ্বস্ততা

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

–"(নূহ বলল ঃ) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে পাঠানো বিশ্বস্ত রাসূল, অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।" (সূরাহ্ আশ-শু'আরা'– ২৬ ঃ ১০৭-১০৮)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ... ﴿٥٨﴾

–"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ সেসবের মালিকদের কাছে পৌঁছে দাও। ..." (সূরাহ আন্-নিসা'– ৪ ঃ ৫৮)

ন্যায়বিচার

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ
وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ... ﴿٢٥﴾

–"আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদণ্ড (ন্যায়বিচারের বিধান) নাযিল করেছি যাতে লোকেরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। ..." (সূরাহ আল-হাদীদ– ৫৭ ঃ ২৫)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ ... ﴿٩٠﴾

–"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন,..." (সূরাহ আন্-নাহল– ১৬ ঃ ৯০)

... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ
أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ﴿٨﴾

–"... কোন জনগোষ্ঠীর শত্রুতার কারণে তোমরা যেন ন্যায়বিচার পরিত্যাগ না কর। তোমরা ন্যায়বিচার কর; এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। ..." (সূরাহ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ৮)

হিজাব ও সতীত্ব

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

–"(হে রাসূল!) মু'মিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন (গায়রে মাহ্‌রাম নারীদের সামনে) তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং (হারাম যৌনকর্ম থেকে) তাদের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্যে অধিকতর পরিশুদ্ধতা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।" (সূরাহ আন্‌-নূর– ২৪ ঃ ৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ
ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ
ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟
إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

–"আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন (গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে) তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং (হারাম যৌনকর্ম থেকে) তাদের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযত করে রাখে, আর যা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় তাছাড়া যেন তারা তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে এবং নিজেদের বুকের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে, আর তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীর পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাদের বোনের পুত্র, তাদের নারীদের, তাদের অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী, যৌন কামনামুক্ত বৃদ্ধ পুরুষ, ও নারীর গুপ্তাঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ শিশুদের ছাড়া অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমন জোরে না হাঁটে যাতে তাদের লুকিয়ে রাখা সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরাহ আন্‌-নূর– ২৪ ঃ ৩১)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ
ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

–"হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে ও মু'মিনদের নারীদেরকে বলুন তারা যেন (বাইরে বের হবার সময়) তাদের চাদর নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। তাহলে তাদেরকে চেনা সহজ হবে যাতে তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াবান।" (সূরাহ আল-আহ্যাব– ৩৩ ঃ ৫৯)

## সমাজে পরিবর্তন সাধন

...إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ... ﴿١١﴾

–"... নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন করে ...।" (সূরাহ আর-রা'দ– ১৩ ঃ ১১)

## দানশীলতা

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ... ﴿٩٢﴾

–"তোমরা কিছুতেই উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করবে। ..." (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ৯২)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم
بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

–"যারা রাতে ও দিনে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের ধনসম্পদ (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে তাদের জন্যে তাদের রবের নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২৭৪)

আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ
فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ
بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

–"আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না, আর তিনি যদি তোমাদেরকে সাহায্য না করেন তাহলে এমন কে আছে যে তাঁর পরিবর্তে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? অতএব, মু'মিন-দের উচিত আল্লাহ্‌র ওপরে তাওয়াক্কুল করা।" (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৬০)

...وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ... ﴿٣﴾

–" ... আর যে আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট ...।" (সূরাহ আত্‌-তালাক– ৬৫ ঃ ৩)

## খারাপ ও হারাম কাজসমূহ

### মিথ্যা বলা

...فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَـٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

–"... অতএব, তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ কর।" (সূরাহ আল-হাজ্জ– ২২ ঃ ৩০)

...لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٧﴾

–"... সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত।" (সূরাহ আন্‌-নূর– ২৪ ঃ ৭)

# গীবত, গোয়েন্দাগিরি ও সন্দেহ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ
وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

–"হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশীর ভাগ ধারণা ও সন্দেহ থেকে দূরে থাক; নিঃসন্দেহে কতক ধারণা ও সন্দেহ গোনাহ। আর তোমরা (কেউ কারো বিরুদ্ধে) গোয়েন্দাগিরি করো না (দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না) এবং তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণা করে থাক। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাওবাহ কবুলকারী ও দয়ালু।" (সূরাহ আল-হুজুরাত– ৪৯ ঃ ১২)

প্রতারণা

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

–"যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্যে মারাত্মক দুর্ভোগ রয়েছে– যারা লোকদের কাছে থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় মেপে নেয়, আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়।" (সূরাহ আল-মুতাফ্‌ফিফিন– ৮৩ ঃ ১-৩)

অপব্যয়

...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ
كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

–"... আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিঃসন্দেহে অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভ্রাতৃসম্প্রদায়। আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।" (সূরাহ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ২৬-২৭)

ঔদ্ধত্য

وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

–"পৃথিবীর বুকে দম্ভভরে পথ চলো না; নিঃসন্দেহে তুমি কখনোই ধরণীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনোই পর্বতসমান উঁচু হতে পারবে না।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৩৭)

... وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

–"... আর আল্লাহ্ কোন উদ্ধত-অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরাহ্ আল-হাদীদ– ৫৭ ঃ ২৩)

কার্পণ্য ও মজুদদারী

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا
لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ... ﴿١٨٠﴾

–"আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, একাজ তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তারা যে সম্পদে কার্পণ্য করে খুব শীঘ্রই কিয়ামতের দিন সে সবকে বেড়ী বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে ..।" (সূরাহ্ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৮০)

... وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

–"... আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।" (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্– ৯ ঃ ৩৪)

দূর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা

... كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

–" ... তোমরা আল্লাহ্র দেয়া রিয্ক থেকে খাও ও পান কর এবং পৃথিবীর বুকে দুর্নীতিপরায়ণরূপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" (সূরাহ্ আল-বাকারাহ্– ২ ঃ ৬০)

বিদ্রুপ ও উপহাস

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ... ﴿١١﴾

–"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অন্যদের বিদ্রুপ বা উপহাস না করে; এমনও হতে পারে যে, তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম।.." (সূরাহ্ আল-হুজুরাত– ৪৯ ঃ ১১)

নিফাক

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

–"আর লোকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্‌র ওপরে ও শেষ দিনের ওপরে ঈমান এনেছি, কিন্তু (প্রকৃত পক্ষে) তারা ঈমানদার নয়।" (সূরাহ্ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ৮)

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾

–"(হে মুহাম্মাদ!) মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসবে তখন তারা বলবে ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ তো জানেনই যে, নিঃসন্দেহে আপনি তাঁর রাসূল। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ্ আল-মুনাফিকুন– ৬৩ ঃ ১)

গর্ভপাত ও দারিদ্র্যের ভয়

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

–"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা; আমরাই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিয্‌ক দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা বিরাট গোনাহ।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৩১)

রিবা

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟... ﴿٢٧٥﴾

–" আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও রিবাকে হারাম করেছেন ... ।" (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২৭৫)

মদ ও জুয়া

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

–"হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, দেবমূর্তি ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ হচ্ছে শয়তানের অপবিত্র কর্ম, অতএব, এসব থেকে দূরে থাক। তাহলে আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ৯০)

ব্যভিচার

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

–"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিঃসন্দেহে তা অশ্লীল কাজ; আর এটা নিকৃষ্ট পথ।" (সূরাহ বানী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৩২)

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ... ﴿٢﴾

–"ব্যভিচারকারী পুরুষ ও ব্যভিচারকারী নারী তাদের উভয়ের প্রত্যেককেই একশ' বেত্রাঘাত কর। ..." (সূরাহ আন্-নূর– ২৪ ঃ ২)

চুরি

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟
أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

–"পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের অর্জিত প্রতিদান হিসেবে উভয়ের হাত কেটে দাও; এ হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (অন্যদের জন্যে) হুশিয়ারী। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ – ৫ ঃ ৩৮)

## অনুশীলনী (বার)

### ৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। কুর'আন মজীদ তাওহীদ, রিসালাহ্ ও আখিরাহ্ সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয়? এ তিনটি বিষয়ে কুর'আন মজীদ থেকে তোমার পক্ষে যতগুলো আয়াত বের করা সম্ভব বের কর।

২। হযরত লুকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৩। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অভাবীদের প্রতি একজন মুসলমানের কর্তব্য কি কি?

৪। সামাজিক আচরণের ব্যাপারে আমরা কুর'আন থেকে কি শিক্ষা পাই?

৫। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে যেসব সদ্‌গুণের অধিকারী দেখতে চান এমন দশটি গুণের নাম লিখ।

### একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। "ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম কেবল ছালাত আদায় ও তোতাপাখীর মত শিখানো কাজ করার নাম নয়।" কুর'আন মজীদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথাটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

২। "মুসলমানদের শুধু দাড়ি ও হিজাবের দ্বারা পরিচিত হওয়া উচিত নয়, বরং তাদের আচার-আচরণের দ্বারা পরিচিত হওয়া উচিত।" এ সম্বন্ধে আলোচনা কর। কুর'আন মজীদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথাটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

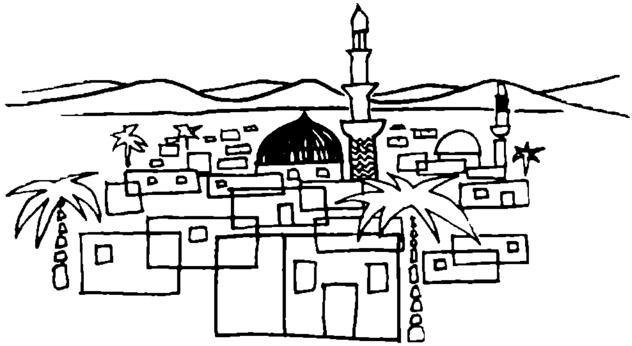

# তের ঃ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ

হাদীছ' (বহুবচনে 'আহাদীছ') মানে 'খবর' বা 'তথ্য'। তবে ইসলামী পরিভাষায় এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। ইসলামে 'হাদীছ' অর্থ আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কথা ও কাজ এবং তাঁর অনুমোদিত বিষয়।

## দায়িত্ব-কর্তব্য

### জিহাদ

"ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার জান-মালসহ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে।" (আল-বুখারী)
"সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্যকথা বলা।" (আল-বুখারী)

### ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সান

"ঈমান মানে এই যে, তুমি আল্লাহ্তে (তাওহীদে), তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর রাসূলদের ওপর (রিসালাহতে) ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ওপর (আখিরাহতে) বিশ্বাস রাখবে।"
ইসলাম মানে তুমি আল্লাহ্র 'ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করবে না, ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে ও রামাযানের ছাওম পালন করবে।
ইহ্সান মানে তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র 'ইবাদাত করবে যে, তুমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ এবং তুমি যদি তাঁকে দেখতে না-ও পাও নিঃসন্দেহে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।" (আল-বুখারী)

### রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন (ঈমানদার) হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার পুত্র ও সমগ্র মানবজাতির চেয়ে বেশী প্রিয় হই।" (আল-বুখারী)

## ছালাত ও তাহারাহ.

"ছালাত বেহেশ্‌তের চাবি এবং তাহারাহ (পবিত্রতা) হচ্ছে ছালাতের চাবি।" (মিশকাত)

## পিতামাতা

"এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে আমার কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী ভাল আচরণের অধিকারী?' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ 'তোমার মা'। লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ 'এরপর কে?' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ 'তোমার মা'। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল ঃ 'এরপর কে?' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ 'তোমার মা'।" (আল-বুখারী)

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এল এবং বলল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যুদ্ধে যেতে চাই এবং এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মা বেঁচে আছেন কিনা। সে জানাল যে, তার মা বেঁচে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মায়ের কাছে থাক, কারণ, মায়ের পায়ের নীচেই বেহেশ্‌ত (অর্থাৎ মায়ের খেদমতের মাধ্যমে বেহেশ্‌ত অর্জন করা যায়।)" (আন-নাসাঈ)

"পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।" (আত্‌-তিরমিযী)

## স্ত্রী

"ঈমানদারদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণতার অধিকারী তারা যারা চারিত্রিক দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তারা যারা তাদের স্ত্রীদের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম।" (আত্‌-তিরমিযী)

## সন্তান

"সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, যে ছোটদেরকে স্নেহ করে না ও বড়দেরকে সম্মান করে না।" (আত্‌-তিরমিযী)

"পিতা তার সন্তানকে উত্তম আচরণ শিক্ষা দেয়ার চেয়ে ভাল কিছু দান করতে পারে না।" (আত্‌-তিরমিযী)

"আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার কর্তব্যের ব্যাপারে সতর্ক হও এবং তোমার ছেলেমেয়েদের সাথে উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ কর।" (আল-বুখারী)

"যে ব্যক্তি তার দু'টি কন্যাসন্তানকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত যথাযথভাবে লালন-পালন করবে বেহেশ্‌তে সে ব্যক্তি ও আমি দু'টি পাশাপাশি আঙ্গুলের মত ঘনিষ্ঠভাবে থাকব।" (মুসলিম)

### মেহমান

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" (আল-বুখারী)

### প্রতিবেশী

"আল্লাহ্র কসম, সে মু'মিন নয় (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কথাটি তিনবার বললেন) যার প্রতিবেশীরা তার ক্ষতিকর আচরণ থেকে নিরাপদ নয়।" (আল-বুখারী)

"সে ঈমানদার নয় যে পেট পুরে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে।" (আল-বুখারী)

"জিবরা'ঈল প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণের জন্যে এতই সুপারিশ করছিল যে, আমি ভাবছিলাম তাদেরকে হয়ত উত্তরাধিকার দেয়া হবে (অর্থাৎ মীরাছে অংশীদার করা হবে)।" (আল-বুখারী)

### ইয়াতীম

"মুসলমানদের গৃহের মধ্যে সেই গৃহ সর্বোত্তম যেখানে ইয়াতীমের সাথে ভাল আচরণ করা হয় এবং নিকৃষ্টতম গৃহ হচ্ছে সেটি যেখানে ইয়ামীতের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়।" (ইবনে মাজাহ)

### অভাবী

"যে ব্যক্তি কোন বিধবা বা কোন দরিদ্রকে সাহায্য করার চেষ্টা করে সে যেন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করছে।" (আল-বুখারী)

## মৌলিক গুণাবলী

### নিয়্যত

"নিয়্যতের ভিত্তিতেই কাজের বিচার করা হবে, মানুষ তা-ই পাবে যে জন্য সে নিয়্যত করেছে।" (আল-বুখারী)

## সামাজিক সৎগুনাবলী

### সত্যবাদিতা

"আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, তাহলে আমি তোমাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দেব। তুমি যখন কথা বলবে তখন সত্য বলবে, ওয়াদা পালন করবে, আমানত ফিরিয়ে দেবে, যৌন চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করবে, দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং জবরদস্তি করা থেকে তোমার দুই হাতকে (নিজেকে) বিরত রাখবে।" (আল-বুখারী)

"নিঃসন্দেহে সত্যবাদিতা নেক 'আমলের দিকে এগিয়ে দেয় এবং নেক 'আমল বেহেশ্‌তের দিকে নিয়ে যায়।" (আল-বুখারী)

ওয়াদা পালন

"তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, অথবা তাকে উপহাস করো না বা তার সাথে এমন ওয়াদা করো না যা তুমি পালন করতে পারবে না।" (আত্‌-তিরমিযী)

সহনশীলতা

"আমার মধ্যে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে আল্লাহ্‌ যা খুবই পছন্দ করেন। তা হচ্ছে সহনশীলতা ও চুক্তি পালন বা ওয়াদা রক্ষা।" (আহ্‌মাদ, আত্‌-তিরমিযী)

নম্রতা

"আল্লাহ্‌ নম্র আচরণকারী এবং তিনি নম্রতা পছন্দ করেন।" ('মুসলিম' থেকে সংক্ষেপিত)

লজ্জাশীলতা

"লজ্জাশীলতা (হায়া) ঈমানের অঙ্গ।" (আল-বুখারী, মুসলিম)

ভ্রাতৃত্ব

"তোমাদের প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ; তুমি যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাও তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে তা থেকে মুক্ত হতে বলবে।" (আত্‌-তিরমিযী)

"মু'মিনগণ পরস্পর একটি অট্টালিকার বিভিন্ন অংশের মত যার একটি অংশ অপর অংশকে (যথাস্থানে থাকতে) সাহায্য করে।" (আল-বুখারী)

"তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্যে তা-ই ভালবাসবে যা সে তার নিজের জন্য ভালবাসে।" (আল-বুখারী)

"ঐ ব্যক্তিই মুসলিম যার জিহ্বা (কথা) ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।" (আল-বুখারী)

দান

"প্রতিটি নেক 'আমলই এক ধরনের দান; আর বন্ধুর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও একটি নেক 'আমল।" (আল-বুখারী)

"এমন লোকও রয়েছে যে দান করে এবং সে তা এমনভাবে গোপন করে রাখে যে, তার বাম হাতও জানে না তার ডান হাত কি দান করল।" (আল-বুখারী)

"পথ থেকে ক্ষতিকর বস্তু অপসারণ করাও দান সমতুল্য।" (আল-বুখারী)

তৃপ্তি

"মালামালের প্রাচুর্য সম্পদ নয়, বরং অন্তরের তৃপ্তিই সম্পদ।" (আল-বুখারী, মুসলিম)

জ্ঞানার্জন

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে কুর'আন শিক্ষা করেছে ও এরপর (অন্যদের) তা শিক্ষা দিয়েছে।" (আল-বুখারী)

"প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।" (মিশকাত)

"আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে জ্ঞান রেখে গেছেন। যে এ উত্তরাধিকার লাভ করল সে বিরাট সৌভাগ্য লাভ করল।" (আল-বুখারী)

দয়া

"যে মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ্ তাকে দয়া করেন না।" (আল-বুখারী, মুসলিম)

"যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দয়ালু ও সহমর্মী আল্লাহ্ তাদের জন্য তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ বিস্তার করে দেন। পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখাও যাতে আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করেন।" (আবু দাউদ, আত্-তিরমিযী)

কৃতজ্ঞতা

যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।" (আত্-তিরিমিযী)

দৃঢ়তা

সুফিয়ান বিন 'আবদুল্লাহ বলেন ঃ "আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছু বলুন যা আমি সব সময় 'আমল করতে পারি।' তিনি বললেন ঃ বল ঃ 'আল্লাহ্ই আমার রব্'; এর উপর (একথার ওপর) দৃঢ় থাক।" (আন্-নাবাবীর 'চল্লিশ হাদীস')

তাওবাহ

"আল্লাহ্র কসম, আমি (মুহাম্মাদ) দৈনিক সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই ও তাওবাহ করি।" (আল-বুখারী)

হাদীয়াহ বা উপহার

"তোমরা পরস্পরকে হাদীয়াহ দাও, কেননা হাদীয়াহ্ মনোমালিন্য দূর করে।" (মিশকাত)

"রাসূলুল্লাহ সব সময়ই হাদীয়াহ্ গ্রহণ করতেন এবং বিনিময়ে হাদীয়াহ্ দিতেন।" (আল-বুখারী)

অসুস্থকে দেখতে যাওয়া

**"অসুস্থকে দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং বন্দীদের মুক্ত কর।" (আল-বুখারী)**

## আচার-ব্যবহার

### সাক্ষাত ও সম্ভাষণ

**"লোকেরা যেখানে বসে আছে তোমাদের কেউ সেখানে প্রবেশ করলে সে যেন তাদেরকে সালাম দেয়, আর যখন সে চলে যেতে চাইবে তখনও যেন সে তাদেরকে সালাম দেয়।" (আবু দাউদ)**

**"দুই ব্যক্তির মাঝখানে তাদের উভয়ের অনুমতি ছাড়া বসবে না।" (আবু দাউদ)**

**"দেখা-সাক্ষাত আমানতের ন্যায়, কেবল তিন ধরনের সাক্ষাত এর ব্যতিক্রম ঃ হারাম রক্তপাতের জন্য বা ব্যভিচারের জন্য বা কারো সম্পদ অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য।" (আবু দাউদ)**

**"তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে সে যেন তাকে সালাম দেয়।" (আবু দাউদ)**

**"যে বয়সে ছোট সে বড়কে সালাম দেবে, হেঁটে আসা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং যারা সংখ্যায় কম তারা বেশী সংখ্যক লোকের দলকে সালাম দেবে।" (আল-বুখারী)**

**"সর্বোত্তম (পন্থায়) সালাম হচ্ছে মুসাফাহা (করমর্দন)।" (আত্-তিরমিযী)**

### কথা বলা

**"যে সত্যিসত্যিই আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান পোষণ করে সে হয় ভাল কথা বলবে অথবা চুপ থাকবে।" (আল-বুখারী, মুসলিম)**

**"যে নীরব থাকে সে নিরাপদ থাকে।" (আত্-তিরমিযী)**

### পানাহার

**"খাদ্যের বরকত হচ্ছে খাবার খাওয়া শুরু করার আগে ও খাবার খাওয়া শেষ হবার পর হাত ধোয়ায়।" (মিশকাত)**

**"আল্লাহ্‌র নাম (বিসমিল্লাহ্) বল এবং ডান হাত দিয়ে খাও, আর খাদ্যের প্লেটের নিকটবর্তী স্থান থেকে খাও।" (আল-বুখারী)**

**"পান করার সময় কেউ যেন পানপাত্রে (গ্লাসে) শ্বাস না ফেলে।" (আল-বুখারী)**

### পোশাক-পরিচ্ছদ

**"খাও, পান কর, ছাদাকাহ দাও ও ভাল কাপড়-চোপড় পরিধান কর, তবে এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না (অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করো না) এবং অপচয় ও ঔদ্ধত্যের পর্যায়ে যেয়ো না।" (আন্-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)**

"যে পুরুষ ব্যক্তি এ দুনিয়ায় রেশমের কাপড় পরিধান করবে পরকালীন জীবনে এ বস্তুতে তার কোন অংশ থাকবে না।" (আল-বুখারী, মুসলিম)

"আমার উম্মাহর নারীদের জন্যে স্বর্ণ ও রেশম হালাল করা হয়েছে, কিন্তু পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।" (আত্-তিরমিযী, আন্-নাসাঈ)

"যে সব পুরুষ লোক নারীদের পোষাক পরে ও যেসব নারী পুরুষদের পোশাক পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের প্রতি লা'নত (অভিশাপ) বর্ষণ করেছেন।" (আবু দাউদ)

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু বকরের কন্যা আসমা'কে বললেন ঃ 'একজন নারী যখন সাবালেগ হয় তখন এই এই অংশ বাদে তার শরীরের অন্য কোন অংশই চোখে পড়া উচিত নয়।' একথা বলার সময় তিনি তাঁর চেহারা এবং দুই হাত (কব্জি পর্যন্ত) দেখালেন।" (আবু দাউদ)

### সম্পর্কহীন বিষয় পরিত্যাগ করা

"একটি চমৎকার ইসলামী অভ্যাস হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তির সাথে যে বিষয়ের সম্পর্ক নেই সে বিষয় পরিত্যাগ করা।" (মালিক, আহ্মাদ)

## খারাপ আচরণ

### মিথ্যা বলা

"তাদের জন্য আফসোস যারা লোকদেরকে হাসানোর জন্যে মিথ্যা কথা বলে; তাদের জন্য আফসোস! তাদের জন্য আফসোস! " (আহ্মাদ, আত্-তিরমিযী)

"এটা একটা বড় বিশ্বাসঘাতকতার কাজ যে, তুমি তোমার ভাইকে কিছু বললে এবং সে তা সত্য বলে মনে করল অথচ তুমি মিথ্যা বলেছ।" (আবু দাউদ)

### গীবত করা

"কেউ যদি আমার নিকট ওয়াদা করে যে, সে তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে (হিসাব করে কথা বলবে), যৌন চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করবে, অন্যদের দোষের কথা বলবে না বা কারো বিরুদ্ধে তোহ্মত (মিথ্যা অপবাদ) দেবে না ও গীবত করবে না এবং ব্যভিচার ও অনুরূপ অন্যান্য অপরাধ থেকে বিরত থাকবে, তাহলে আমি তাকে বেহেশ্তের ওয়াদা দেব।" (আল-বুখারী)

### সন্দেহ

"সন্দেহ থেকে সাবধান! কারণ সন্দেহ মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তিশীল হতে পারে। পরস্পরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না এবং অন্যদের গোপন দোষ প্রকাশ করে দিও না।" (আল-বুখারী)

ঈর্ষা

ঈর্ষা থেকে দূরে থাক, কারণ আগুন যেভাবে কাঠকে পুড়ে ফেলে ঠিক সেভাবেই ঈর্ষা নেক আমলসমূহকে ধ্বংস করে ফেলে।" (আবু দাউদ)

"একজন মুসলমানের সুনামকে অন্যায়ভাবে নষ্ট করার চেয়ে নৃশংসতা আর কিছু হতে পারে না।" (আত্-তিরমিযী)

ক্রোধ

"সে বেশী শক্তিশালী নয় যে শক্তিতে অন্যকে পরাভূত করে, বরং সে-ই বেশী শক্তিশালী যে তার ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" (আল-বুখারী, মুসলিম)

"কারো মধ্যে ক্রোধ জাগলে সে যেন বসে পড়ে, তাতেও কাজ না হলে (ক্রোধ দূর না হলে) যেন শুয়ে পড়ে।" (আত্-তিরমিযী)

অহংকার

"কারো অন্তরে যদি এক অণুপরিমাণও অহঙ্কার থাকে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না।" (আল-বুখারী)

গালি

"কোন মুসলমানকে গালি দেয়া গোনাহ্র কাজ, আর তাকে হত্যা করা কুফ্র।" (আল-বুখারী, মুসলিম)

নিফাক

"মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, তার কাছে আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করে।" (আল-বুখারী)

কটাক্ষ করা

"একজন মু'মিন কাউকে কটাক্ষ করে না, বা অভিশাপ দেয় না, বা অশ্লীল কথা বলে না, বা আড্ডা দেয় না (অর্থহীন গল্পগুজবে সময় কাটায় না), বা অযথা বেশী কথা বলে না।" (আত্-তিরমিযী)

"কোন মুসলিম ভাইয়ের দুর্দশায় আনন্দিত হয়ো না, কারণ আল্লাহ্ তার দুর্দশা দূর করে দিতে ও তোমাকে তার অবস্থায় নিক্ষেপ করতে পারেন।" (আত্-তিরমিযী)

"মনে রেখো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এমন এক টুকরা মাংস আছে যা সুস্থ থাকলে সারা শরীরই সুস্থ থাকে এবং যা অসুস্থ হয়ে পড়লে সারা শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রেখো, তা হচ্ছে হৃদয়।" (আল- বুখারী, মুসলিম)

## অনুশীলনী (তের)

৯ম-১০ম শ্রেণী (১৫-১৬ বছর)

১। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত কর।

২। আমাদেরকে খারাপ অভ্যাস ও আচরণ পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে এমন বক্তব্য বিশিষ্ট দশটি হাদীছ লিখ।

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন থেকে তাঁর দৃঢ়তা, দয়া ও সত্যবাদিতার উদাহরণ দাও। সেই সাথে এসব বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত কর।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি অবলম্বনে ভ্রাতৃত্বের ধারণার ব্যাখ্যা কর।

২। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে 'জীবন্ত কুর'আন ' বলা হত কেন?

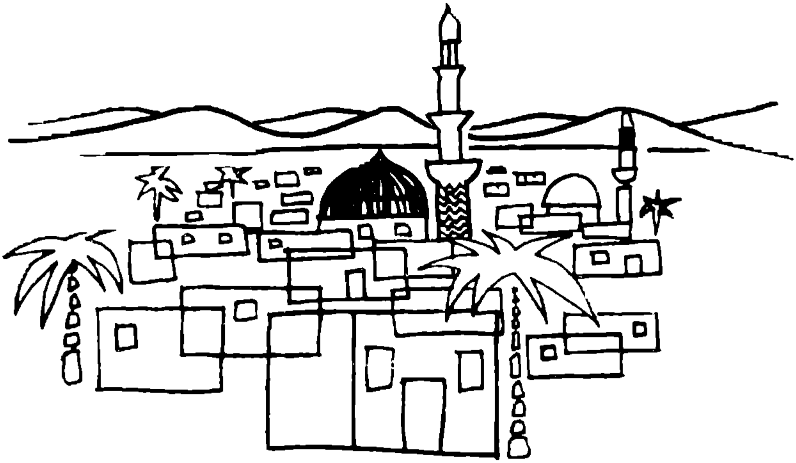

# চৌদ্দ ঃ মুসলিম জাহান

## জনসংখ্যা ও সম্পদ

সলমানরা বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন তারা সকলে মিলে একটি জাতি (মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ)। ইসলামের দৃষ্টিতে ভৌগলিক অবস্থান, বর্ণ, গোত্র বা

ভাষা ঐক্যের ভিত্তি নয়, বরং ঈমানই মানুষের ঐক্যের ভিত্তি। তবে ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বতকানে বিশ্বে ৫৩টি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। বতকানে বিশ্বে মোট মুসলিম জনসংখ্যা ১৩০ কোটির বেশী। বস্তুতঃ মুসলমানরা বিশ্বের এক শক্তিধর মহা জনশক্তি।

মুসলিম দেশগুলো বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ জ্বালানী তেল, শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ রাবার, ৭৫ ভাগ পাট, ৬৭ ভাগ মশলা, দুই তৃতীয়াংশ পাম-অয়েল, ৫০ ভাগ ফসফেট, ও ৪০ ভাগ টিন উৎপাদন করে। এছাড়াও বিপুল পরিমাণ তুলা, চা, কফি, পশম, ইউরেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট ও আরো অনেক জিনিস ও খনিজদ্রব্য উৎপাদন করে। মুসলিম দেশসমূহে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে।

বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম দেশগুলো কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী। ভূমধ্য সাগরের শতকরা ৬০ ভাগ মুসলিম দেশসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর পুরোপুরি মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ইতিহাসের উত্থান-পতনের গতিধারায় মুসলমানরা তাদের অতীব প্রয়োজনীয় ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে। মানবজাতির কল্যাণে এ ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

মুসলমানরা এক সময় বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছিল। তারা ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হলে পুনরায় একইভাবে অবদান রাখতে সক্ষম। কারণ কেবল ইসলামী শিক্ষা ও মূলনীতির আন্তরিক অনুসরণের মাধ্যমেই প্রকৃত মানবিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধার ও সমস্যার ভারে বিপর্যস্ত এ বিশ্বকে মানবজাতির বসবাসের উপযোগী শান্তিপূর্ণ স্থানে পরিণত করার লক্ষ্যে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হবে। অতীত ঐতিহ্যের গর্ব তখনই অর্থবহ হবে যখন অতীতের আলোকে বতকানকে গঠন করে ভবিষ্যতের জন্য আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করা যাবে। মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সে সম্ভাবনা রয়েছে; এখন কেবল ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আন্তরিক অনুসরণ প্রয়োজন।

## মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ

| নাম | আয়তন (বর্গকিলোমিটার) | মোট জনসংখ্যা (লাখে) | মুসলিম জনসংখ্যার হার (%) |
|---|---|---|---|
| ১। আইভরি কোস্ট | ৩,২২,০০০ | ১৬৮ | ৬০ |
| ২। আযারবাইজান | ৮৬,৫৯৯ | ৭৮ | ৯৩ |
| ৩। আফগানিস্তান | ৬,৫২,২২৫ | ২৭৮ | ৯৯ |
| ৪। আলজেরিয়া | ১৯,৮৮,০০০ | ৩২৩ | ৯৯ |
| ৫। আলবানিয়া | ২৮,৭৫০ | ৩৫ | ৭০ |
| ৬। ইথিওপিয়া | ১১,৫৩,০০০ | ৬৭৭ | ৫০ |
| ৭। ইন্দোনেশিয়া | ১৯,১৯,৪৪১ | ২৩১৩ | ৮৮ |
| ৮। ইরাক | ৪,৩৪,৯২৩ | ২৪০ | ৯৭ |
| ৯। ইরান | ১৬,৪৮,০০০ | ৬৬৬ | ৯৯ |
| ১০। ইরিত্রিয়া | ১,২৪,৯৯৩ | ৪৫ | ৫১ |
| ১১। ইয়েমেন | ৫,২৭,৯৬৯ | ১৮৭ | ১০০ |
| ১২। উযবেকিস্তান | ৪,৪৭,৩৯৯ | ২৫৬ | ৮৮ |
| ১৩। ওমান | ৩,০০,০০০ | ২৭ | ১০০ |
| ১৪। কমোরো | ২,১৭০ | ৬ | ৮৬ |
| ১৫। কাযাকিস্তান | ২৭,১৭,৩০১ | ১৬৯ | ৪৭ |
| ১৬। কাতার | ১১,৪৩৭ | ৮ | ৯৫ |
| ১৭। কিরগিযিস্তান | ১,৯৮,৫০০ | ৪৮ | ৭৫ |
| ১৮। কুয়েত | ১৭,৮১৮ | ২১ | ৮৫ |
| ১৯। গাম্বিয়া | ১০,৩৮০ | ১৫ | ৯০ |
| ২০। গিনি | ২,৪৫,৮৬১ | ৭৮ | ৮৫ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২১। গিনি-বিসাউ | ৩৬,১২০ | ১৩ | ৪৫ |
| ২২। চাদ | ১২,৫৯,২০৬ | ৯০ | ৫০ |
| ২৩। জর্দান | ৮৯,২১৩ | ৫৩ | ৯৬ |
| ২৪। জিবুতি | ২২,০০০ | ৬ | ৯৪ |
| ২৫। তাজিকিস্তান | ১,৪৩,১০০ | ৬৭ | ৮৫ |
| ২৬। তিউনিসিয়া | ১,৬২,১৫৫ | ৯৮ | ৯৮ |
| ২৭। তুরস্ক | ৭,৭৪,৮১৫ | ৬৭৩ | ১০০ |
| ২৮। তুর্কমেনিস্তান | ৪,৮৮,১০১ | ৪৮ | ৮৯ |
| ২৯। নাইজার | ১২,৬৭,০০০ | ১০৬ | ৮০ |
| ৩০। নাইজেরিয়া | ৯,২৩,৭৭০ | ১২৯৯ | ৫০ |
| ৩১। পশ্চিম সাহারা | ২,৬৬,০০০ | ৩ | ১০০ |
| ৩২। পাকিস্তান | ৭,৯৬,০৯৫ | ১৪৭৭ | ৯৭ |
| ৩৩। ফিলিস্তিন (স্বায়ত্তশাসিত এলাকা)☆ | ৬,২২০ | ২৭ | ৮৫ |
| ৩৪। বসনিয়া ও হার্যেগোভিনা | ৫১,২৩৩ | ৪০ | ৪০ |
| ৩৫। বাংলাদেশ | ১,৪৭,৫৭০ | ১৩৩৪ | ৮৮ |
| ৩৬। বাহরাইন | ৬২০ | ৭ | ১০০ |
| ৩৭। বুরকিনা ফাসো | ২,৭৪,২০০ | ১২৬ | ৫০ |
| ৩৮। ব্রুনাই | ৫,৭৬৫ | ৪ | ৬৩ |
| ৩৯। মরোক্কো | ৪,৪৬,৫৫০ | ৩১১ | ৯৯ |
| ৪০। মালদ্বীপ | ২৯৮ | ৩ | ১০০ |
| ৪১। মালয়েশিয়া | ৩,২৯,৭৫৮ | ২২৭ | ৫৮ |
| ৪২। মালি | ১২,৩৯,৯৯৯ | ১১৮ | ৯০ |
| ৪৩। মিসর | ১০,০১,৪৪৯ | ৭০৭ | ৯৪ |

☆ ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা (জর্দান নদীর তীর ও গাযাহ) নিয়ে এখনো ইসরাঈলের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৪। মৌরিতানিয়া | ১০,৩০,৭০১ | ২৮ | ১০০ |
| ৪৫। লিবিয়া | ১৭,৫৯,৫৪০ | ৬০ | ৯৭ |
| ৪৬। লেবানন | ১০,৪০০ | ৪১ | ৭০ |
| ৪৭। সউদী আরব | ২২,৫৩,৩০০ | ২৩৫ | ১০০ |
| ৪৮। সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮৩,৬০০ | ২৯ | ৯৬ |
| ৪৯। সিয়েরা লিওন | ৭১,৬১৪ | ৫৬ | ৬০ |
| ৫০। সিরিয়া | ১,৮৫,১৭৯ | ২০৯ | ৯০ |
| ৫১। সূদান | ২৫,০৫,৮১৩ | ৩৭১ | ৭০ |
| ৫২। সেনেগাল | ১,৯৬,১৯৩ | ১০৬ | ৯২ |
| ৫৩। সোমালিয়া | ৬,৩৭,৬৩৮ | ১০৭ | ১০০ |

তথ্যসূত্র ঃ


১। The Observer (24 OcTber 1999), London, UK. Page 26 (World Extra)

২। Population Reference Bureau, 2002

৩। ২০০০ সালে উক্ত দেশগুলোর বেশীর ভাগের লন্ডনস্থ দূতাবাস কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য।

৪। The World Fact Book 2002, CIA


টীকা ঃ মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যার হার নিকটতম সংখ্যায় হিসাব করা হয়েছে (Approximate)।

# মুসলিম সংখ্যালঘু দেশসমূহ

বিশ্বের প্রায় সকল এলাকায়ই মুসলমান রয়েছে। এখানে মুসলিম সংখ্যালঘু দেশসমূহের মোট জনসংখ্যা ও মুসলিম জনসংখ্যা উল্লেখ করা হল ঃ

| নাম | মোট জনসংখ্যা (লাখে) | মুসলিম জনসংখ্যার হার (%) | মুসলিম জনসংখ্যা (হাজারে) |
|---|---|---|---|
| ১। অস্ট্রেলিয়া | ১৯৫ | ১.৯ | ৩৭১ |
| ২। আর্জেন্টিনা | ৩৬৮ | ১.৪ | ৫২৯ |
| ৩। ইটালী | ৫৭৫ | ০.৩ | ১৭২ |
| ৪। ইসরাঈল | ৫৮ | ১৪.৬ | ৮৪০ |
| ৫। উগান্ডা | ২৩৬ | ১৬.০ | ৩,৯৫২ |
| ৬। কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ২৭ | ২.৩ | ৬২ |
| ৭। কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | ৫০৫ | ১০.০ | ৫,০৪৮ |
| ৮। কম্বোডিয়া | ১২৮ | ৫.১ | ৬৫৩ |
| ৯। কানাডা | ৩১৯ | ০.৬ | ২৮৭ |
| ১০। কেনিয়া | ৩১১ | ২৮.০ | ৮,৭০৮ |
| ১১। ক্যামেরুন | ১৬২ | ১৬.০ | ২,৫৯২ |
| ১২। ক্রোয়েশিয়া | ৪৭ | ১.২ | ৫৬ |
| ১৩। গাইয়ানা | ৭ | ১৫.১ | ১০৬ |
| ১৪। গ্রীস | ১০৭ | ১.৭ | ১৮২ |
| ১৫। ঘানা | ১৮৯ | ৩১.২ | ৫,৮৯৩ |
| ১৬। চীন | ১২,৮৪৩ | ৩.০ | ৩৮,৫২৯ |
| ১৭। জর্জিয়া | ৫১ | ১.২ | ৫৫৭ |
| ১৮। জাম্বিয়া | ৯৭ | ১১.৭ | ১,১৩১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯। জার্মানী | ৮২১ | ২.৬ | ২,১৩৪ |
| ২০। তাঞ্জানিয়া | ৩৭২ | ৩৫.০ | ১৩,০২০ |
| ২১। টোগো | ৫১ | ১০.০ | ৫০৮ |
| ২২। ত্রিনিদাদ ও তোবাগো | ১১ | ৬.০ | ৬৬ |
| ২৩। থাইল্যান্ড | ৬২৪ | ৫.০ | ৩,১২০ |
| ২৪। দক্ষিণ আফ্রিকা | ৪৩৪ | ২.০ | ৮৭২ |
| ২৫। নেদারল্যান্ড | ১৫৮ | ৩.০ | ৪৭৪ |
| ২৬। নেপাল | ২৪৩ | ৪.৭ | ১,১৪২ |
| ২৭। ফিজি | ৮ | ৮.০ | ৬৫ |
| ২৮। ফিলিপাইন | ৮৪৫ | ৫.০ | ৪২২৫ |
| ২৯। ফ্রান্স | ৫৯০ | ৫.২ | ৩,০৬৭ |
| ৩০। বার্মা (মায়ানমার) | ৪৮১ | ১১.৫ | ৫,৫৩২ |
| ৩১। বুরুন্দী | ৬৪ | ৪.৯ | ৩১৪ |
| ৩২। বুলগেরিয়া | ৮২ | ২১.৩ | ১,৭৪৬ |
| ৩৩। বেনিন | ৬৮ | ১৫.০ | ১,০২০ |
| ৩৪। বেলজিয়াম | ১০৩ | ৪.৪ | ৪৫৩ |
| ৩৫। ব্রাজিল | ১,৭৬০ | ০.৪ | ৭০৪ |
| ৩৬। ভারত | ১০,৪৫৮ | ১৪.৫ | ১,৫১,৬৪১ |
| ৩৭। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ৩৬ | ১৫.০ | ৫৪০ |
| ৩৮। মঙ্গোলিয়া | ২৬ | ৪.০ | ১০৫ |
| ৩৯। মরিশাস | ১২ | ২০.০ | ২৩৬ |
| ৪০। মাদাগাস্কার | ১৪৯ | ১৩.১ | ১,৭৯৬ |
| ৪১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৮০৬ | ২.৪ | ৬,৭৩৪ |
| ৪২। মালাভী | ১০৭ | ২০.০ | ২,১৪০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৩। মোযাম্বিক | ১৯১ | ২০.০ | ৩,৮২৪ |
| ৪৪। ম্যাসিডোনিয়া | ২০ | ৩০.০ | ৬০৭ |
| ৪৫। যুক্তরাজ্য | ৫৯৮ | ৩.৪ | ২,০০০ |
| ৪৬। রাশিয়া | ১,৪৬৪ | ১৫.০ | ২১,৯৫৯ |
| ৪৭। রুয়ান্দা | ৮১ | ৫.০ | ৪০৮ |
| ৪৮। লাইবেরিয়া | ২৯ | ২৮.৪ | ৮৩০ |
| ৪৯। শ্রীলঙ্কা | ১৯৬ | ৮.৪ | ১,৬৪৬ |
| ৫০। সাইপ্রাস☆ | ৮ | ২৩.০ | ১৭৩ |
| ৫১। সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো | ১১২ | ১৯.০ | ২,১২৯ |
| ৫২। সিঙ্গাপুর | ৪৫ | ১৬.৩ | ৭৩৪ |
| ৫৩। সুরিনাম | ৪ | ২০.০ | ৮৬ |
| ৫৪। স্পেন | ৩৯২ | ০.৪ | ১৫৭ |

বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা ১৩০ কোটির ওপরে হিসাব করা হয়েছে। এ হিসাবের সময় বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৫৬০ কোটির ওপরে ছিল। সে হিসেবে বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ মুসলমান।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Muslim World Minorities, Islamabad, 1993 (মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার-এর জন্য)।

২। Population Reference Bureau, 2002 (মোট জনসংখ্যার জন্য)।

৩। www.population.com (মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার-এর জন্য)।

৪। The World Fact Book 2002, CIA (মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার-এর জন্য।)

☆ বর্তমানে সাইপ্রাস দু'টি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে আছে। মুসলিম সংখ্যাগুরু অংশটির নাম 'টার্কিশ ফেডারেটেড স্টেট অব সাইপ্রাস' যা 'তুর্কীর সাইপ্রাস' নামেই বেশী পরিচিত। গ্রীক অধ্যুষিত অংশটির সরকারী নাম 'রিপাবলিক অব সাইপ্রাস' যা 'গ্রীক সাইপ্রাস' নামে বেশী পরিচিত।

# অনুশীলনী (চৌদ্দ)

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর)

১। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের জনসংখ্যা ও সম্পদ সংক্রান্ত সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা কর।

২। বিশ্বের বুকে মুসলিম দেশসমূহের অবস্থান সম্বলিত একটি মানচিত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং এদেশগুলোর অবস্থান ও গুরুত্বের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩। "ঐক্য, ইসলামের অনুসরণ ও বাংলাদেশের মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরী কর। তোমার নিজস্ব মতামতও উল্লেখ কর।

৪। "বিশ্বে ১৩০ কোটির বেশী মুসলমান রয়েছে, কিন্তু তারা মানবতার সাধারণ কল্যাণের জন্যে তাদের সংখ্যাশক্তি ও বস্তুগত সম্পদ কাজে লাগাতে পারে নি।" এ বক্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর

৫। প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তোমার মতামত বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহকারে তুলে ধর।

# Select Bibliography

Only a selection of the many sources consulted during the preparation of this book is given here. Some of these are now out of print.


### The Qur'ān: Translation and Interpretation

| | |
|---|---|
| *The Noble Qur'ān* | Dr M. Taqī-ud-Dīn al-Hilālī and Dr M. Muḥsin Khān, Riyadh, 1994. |
| *The Holy Qur'ān* | 'Abdullāh Yūsuf 'Ali, Madinah, 1991. |
| *The Glorious Qur'ān* | M. Marmaduke Pickthall, Karachi, 1973. |
| *Towards Understanding the Qur'ān* | Abul A'lā Mawdūdī, Leicester, 1988–99. |
| *The Noble Qur'ān* | 'Abdalhaqq Bewley and 'Āisha Bewley, Norwich, UK, 1999. |
| *The Qur'ān* | Ṣaheeḥ International, Jeddah, 1997. |
| *The Qur'ān in Plain English (part 30)* | Iman Torres-al-Haneef, Leicester, 1993. |
| *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr (3 vols.) — Ikhtiṣār wa taḥqīq* | Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, Beirut, 1981. |
| *In the Shade of the Qur'ān (vol. 30)* | Sayyid Quṭb, translated by A. Ṣalāḥī and A. A. Shamis, London, 1979. |
| *The Qur'ān: Basic Teachings (with Arabic)* | T. B. Irving, Khurshīd Aḥmad and Manāzir Aḥsan, Leicester, 1992. |
| *The Qur'ān: Translation & Study (Ajzā' 1–4, 30)* | Jamilun Nisā' bint Rafai, London, 1995. |

### Hadīth

| | |
|---|---|
| *Saḥīḥ al-Bukhārī (9 vols.)* | Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, translated by M. Muḥsin Khān, Riyadh, 1997. |
| *Saḥīḥ Muslim (4 vols.)* | Muslim bin al-Ḥajjaj, translated by A. Ḥamīd Ṣiddīqī, Lebanon, 1972. |
| *Mishkāt al-Maṣabiḥ* | Ibn al-Farrā' al-Baghawī, translated by James Robson, Lahore, 1972. |
| *Al-Muwaṭṭa'* | Imām Mālik, translated by 'Āisha 'Abdarahmān at-Tarjumana and Ya'qūb Johnson, Norwich, UK, 1982. |
| *Riyāḍ-us-Ṣāliḥeen (vols. 1–2)* | Imām an-Nawawī, translated by Dr. Muḥammad Amīn Abū Usāmah al-'Arabī bin Razduq, Riyadh, 1998. |
| *Forty Ḥadīth* | Imām an-Nawawī, translated by 'Ezzeddīn Ibrāhīm and Denys Johnson-Davies, Damascus, 1977. |
| *Commentary on Forty Ḥadīth of al-Nawawī* | Jamāl al-Dīn M. Zarabozo, Boulder, USA, 1999. |

### Sīrah

| | |
|---|---|
| *As-Sīratun Nabawiyyah (Arabic)* | Ibn Hishām, Beirut, 1975. |
| *At-Tabaqāt (vols. I, V, VI)* (Urdu) | Muḥammad ibn Sa'd, translated by 'Abdullāh al-'Amādī, Karachi, 1972. |
| *The Life of Muḥammad* | *Sīrat Rasūl Allāh* of Ibn Isḥāq, translated by A. Guillaume, Oxford University Press, 1970. |
| *Muḥammad* | Martin Lings, Cambridge, 1983. |
| *The Life of Muḥammad* | Muḥammad Ḥusayn Haykal. Trans. Ismā'īl al-Farūqī, Indiana, 1976. |
| *Ar-Raḥeeq al-Makhtum* | Saifur Raḥmān al-Mubarakpuri, Riyadh, 1995. |
| *The Life of Muḥammad* | Tahia al-Ismail, London, 1988. |

*Tarīkh (vol. I) (Urdu)* — A. Raḥmān bin Khaldūn, translated by Aḥmad Ḥussain Alahabadi, Karachi, 1972.
*Siratun Nabī (Urdu)* — Shiblī Nu'mānī, Lahore.
*Ḥayātuṣ Ṣaḥābah (Arabic)* — MuḥammadYūsuf al-Kāndahluwī, Damascus, 1983.
*Muḥammad: Man and Prophet* — Adil Salahi, Leicester, 2002.
*Qaṣaṣul Anbiā' (Arabic)* — 'Abdul Wahhāb an-Najjār, Cairo, 1966.
*Al-Farūq* — Shiblī Nu'mānī, translated by Zafar 'Alī Khān, Lahore, 1970.
*Abū Bakr* — Bahādur Yār Jang, translated by Moinul Ḥaq, Lahore, 1975.
*The Glorious Caliphate* — S. Athar Ḥusain, Lucknow, 1974.
*Tales of the Prophets* — A. H. 'Alī Nadwī, translated by E. H. Nadwī, Lucknow, 1976.
*Jesus: Prophet of Islām* — Muhammad 'Aṭā'ur-Raḥīm and AḥmādThomson, London, 1997.
*The Prophets* — Prof. Syed 'Alī Ashraf, London, 1980.
*Brief Lives of the Companions of Prophet Muḥammad* — Dr M. A. J. Beg, Cambridge, 2002.

**Islam: General**

*Towards Understanding Islām* — Abul A'lā Mawdūdī, Leicester, 1981.
*Introduction to Islām* — Ḥamīdullāh, London, 1979.
*Islām in Focus* — Hammūdah 'Abdal 'Aṭī, Kuwait, 1977.
*Islām: Its Meaning and Message* — Edited by Khurshīd Aḥmad, London 1976.
*Ideals and Realities of Islām* — S. H. Naṣr, London, 1975.
*Islām: Belief, Legislation and Morals* — Aḥmad Shalaby, Cairo, 1970.
*Ḥajj* — 'Alī Shari'atī, Ohio, 1977.
*Fundamentals of Islām* — Abul A'lā Mawdūdī, Lahore, 1978.
*Let us be Muslims* — Abul A'lā Mawdūdī, Leicester, 1985.

**Women in Islām**

*Woman in Islām* — Ayesha B. Lemu and Fāṭima Heren, Leicester, 1976.
*Family Life in Islām* — Khurshīd Aḥmad, Leicester, 1974.
*Purdah and the Status of Women in Islām* — Abul A'lā Mawdūdī, translated by al-Ash'ārī, Lahore.
*Status of Women in Islām* — Gamal A. Badawī, Indiana, 1976.
*Polygamy in Islām* — Gamal A. Badawī, Indiana, 1976.
*The Family Structure in Islām* — Hammūdah 'Abdal 'Aṭī, Philadelphia, 1977.
*Hijāb (veil): The View from the Inside* — Kanla Nakata (Japan), Ruth Anderson (USA), Riyadh, 1995.
*The Muslim Woman's Handbook* — Huda Khattab, London, 1993.
*Women, Muslim Society and Islām* — Lamya al-Faruqi, Indiana, 1988.
*Gender Equity in Islām* — Jamal Badawi, USA, 1995.
*The Laws of Marriage and Divorce in Islām* — Abul A'lā Mawdūdī, Lahore, 1983.

**Islāmic Law and Fiqh**

*The Lawful and the Prohibited in Islām* — Yūsuf al-Qaraḍāwī, translated by Kamal El-Helbawy *et al.*, Indianapolis.
*Questions and Answers* — Dr. S. M. Darsh. London, 1997.
*Islāmic Law and Constitution* — Abul A'lā Mawdūdī, Lahore, 1969.
*Fiqh-az-Zakāt* — Yūsuf al-Qaraḍāwī, translated by Dr. Monzer Kahf, London. 1999.
*Fiqh us-Sunnah (vols. 1–5)* — As-Sayyid Sābiq, translated by Muhammad Sa'eed Dabas et al., Indiana, 1986-93

| | |
|---|---|
| *Nailul Awṭar (Arabic)* | Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad ash-Shawkānī, Beirut, 1979. |
| *Zadul Ma'ad (Arabic)* | Ibn Qayyim, Beirut, 1979. |
| *Islāmic Jurisprudence* | (Shafi'ī's *Risālah*) Majīd Khaddurī, Baltimore, 1961. |
| *Sharī'ah, the Way of Justice* | Khurram Murād, Leicester, 1981. |
| *Sharī'ah, the Way to God* | Khurram Murād, Leicester, 1981. |
| *Sharī'ah: The Islāmic Law* | 'Abdur Raḥmān I. Doi, London, 1984. |
| *Human Rights in Islām* | Abul A'lā Mawdūdī, Leicester, 1976. |


**Islāmic Economics**


| | |
|---|---|
| *Some Aspects of Islāmic Economy* | Nejātullāh Ṣiddīqī, Lahore, 1970. |
| *Islām and the Theory of Interest* | Anwār Iqbāl Qureshi, Lahore, 1974. |
| *Social Justice in Islām* | Sayyid Quṭb, New York, 1970. |
| *Insurance and Islāmic Law* | Muṣleḥuddīn, Lahore, 1969. |
| *Islāmic Economics* | M. A. Mannān, Lahore, 1975. |
| *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islām* | American Trust Publications, 1976. |
| *Objectives of the Islāmic Economic Order* | M. 'Umar Chapra, Leicester, 1979. |
| *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy* | M. 'Umar Chapra, Leicester, 1979. |
| *Economic Development in an Islāmic Framework* | Khurshīd Aḥmad, Leicester, 1979. |
| *Outlines of Islāmic Economics* | AMSS, Indiana, 1977. |
| *Islāmic Economy* | Dr. M. Kahf, Indiana, 1978. |
| *Studies in Islāmic Economics* | Edited by K. Aḥmad, Leicester, 1980. |
| *Muslim Economic Thinking* | Nejātullāh Ṣiddīqī, Leicester, 1981. |


**Miscellaneous**


| | |
|---|---|
| *Encyclopaedia Britannica* | London, 1979. |
| *Da'irah Ma'arifi Islāmiyyah (Urdu)* | Lahore, 1973–75. |
| *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islāmic World* | Oxford University Press, 1995. |
| *The Oxford History of Islām* | Oxford University Press, 1999. |
| *The Bible, The Qur'ān and Science* | Maurice Bucaille, Indiana, 1978. |
| *What everyone should know about Islām and Muslims* | Suzanne Haneef, Lahore, Pakistan. |
| *The Islāmic Ruling on Music and Singing* | Abū Bilāl Mustafā al-Kanadī, Jeddah, Saudi Arabia. |
| *The Muslim Prayer Encyclopaedia* | Ruqaiyyah Waris Maqsood, New Delhi, India, 1998. |
| *Islām and the Environment* | Harfiyah Abdel Halim, London, 1998. |
| *What does Islām say?* | Ibrāhīm Hewitt, London, 1998. |
| *Wisdom of Islāmic Civilisation* | Dr. M. A. J. Beg, Kuala Lumpur, 1986. |
| *The Muslims Supplications Throughout the Day and Night* | Collected by Siddiqah Sharafaddeen, Jeddah, 1994. |
| *Abortion, Birth Control & Surrogate Parenting — An Islāmic Perspective* | Abul Fadl Mohsin Ebrahim, USA, 1989. |
| *The Miracle of Life* | Fatima M. D'Oyen, Leicester, 1996. |
| *The Muslim Marriage Guide* | Ruqaiyyah Waris Maqsood, 1995. |
| *Sex Education – The Muslim Perspective* | Ghulam Sarwar, London, 1996. |
| *Hidayah* | Translated by Charles Hamilton, Lahore, 1963. |

# পরিভাষা কোষ

**আরবী পরিভাষাসমূহ, বিশেষভাবে কুর'আন মজীদ ও হাদীছে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ বাংলা ভাষায় (বা অন্য যে কোন ভাষায়) সঠিকভাবে অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রেই একটি পরিভাষাকে একটি বা দু'টি শব্দে অনুবাদ করে তার পুরো তাৎপর্যকে বুঝানো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মূল আরবী শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। তাই এ পুস্তকেও বেশ কিছু আরবী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। (সেই সাথে কয়েকটি বহুল প্রচলিত ফার্সী পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে।) এখানে সংক্ষেপে এ পরিভাষাগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হল।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| আইয়ামুত্ তাশরীক | أيام التشريق | ঃ | ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিন (১১-১৩ই যুল্হিজ্জাহ্)। এ দিনগুলোও কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট। |
| আইয়ামে জাহেলিয়াহ | أيام الجاهلية | ঃ | অজ্ঞতার যুগ; ইসলামপূর্ব যুগ। |
| আউস্ | أوس | ঃ | মদীনার গোত্রবিশেষ। |
| আওসুক | أوسق | ঃ | (আওসাক-أوساق-ও উচ্চারিত হয়; একবচনে ওয়াসাক وسق) ৫ আওসুকে ৬৫৩ কেজি হয়। এটা ফসলের যাকাতের নিছাব। |
| আকরাম্ | أكرم | ঃ | সর্বাধিক মহানুভব। |
| 'আকাবাহ | | ঃ | আল্-'আকাবাহ দ্রষ্টব্য। |
| আখিরাহ | آخرة | ঃ | মৃত্যুপরবর্তী জীবন। শেষবিচারের দিন এবং বেহেশ্ত বা দোযখের অনন্ত জীবন এর অন্তর্ভুক্ত। |
| 'আছর্ | عصر | ঃ | বিকাল বেলার ছালাতের নাম। এ ওয়াক্তের ছালাতের নাম ছালাতুল 'আছর ( صلاة العصر ) |
| আছ্-ছাদিক | الصادق | ঃ | হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অন্যতম খেতাব। এর অর্থ 'সত্যবাদী'। |
| আছ্-ছাফা | الصفا | ঃ | বাইতুল্লাহ (আল্লাহ্র ঘর)-এর নিকটবর্তী একটি ছোট পাহাড়। হাজ্জযাত্রীদেরকে এ পাহাড়টি ও নিকটবর্তী মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দ্রুত হাঁটতে হয়। (সূরাহ আল্-বাকারাহ- ২ ঃ ১৫৮) |
| আছ্-ছালাতু 'আলান্ নাবীয়্যি | الصلاة على النبى | ঃ | যে কোন ছালাতের শেষ রাক্'আতে তাশাহ্হুদের পরে যে দরূদ পড়া হয়। |
| আছ্-ছিদ্দিক | الصديق | ঃ | প্রথম খলীফাহ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেতাব; এর অর্থ 'সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী'। |
| 'আযাব | عذاب | ঃ | শাস্তি; খোদায়ী শাস্তি। |
| আত্-তাশাহ্হুদ | | ঃ | তাশাহ্হুদ দ্রষ্টব্য। |
| আত-তিরমিযী | الترمذى | ঃ | সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়টি হাদীছ সংকলনের অন্যতম জামিউত্ তিরমিযী جامع الترمذي-এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। |
| আন্ছার | أنصار | ঃ | 'সাহায্যকারীগণ'। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সাহায্যকারী মদীনার মুসলমানদের সমষ্টিগত খেতাব। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আন্‌জাম | اَنجام | ঃ | (ফার্সী) সম্পাদন। |
| আন্‌-নাসাঈ | اَلنَّسائی | ঃ | ছয়টি নির্ভরযোগ্য হাদীছ সংকলনের অন্যতম। |
| ‘আবেদ | عَابِد | ঃ | ‘ইবাদাতকারী, যিনি আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলেন। |
| ‘আমল | عَمَل | ঃ | কাজ (বহু বচনে اعمال )। |
| আমলনামা | اعمال نامه | ঃ | ‘আমলের ফিরিস্তি বা তালিকা। শেষবিচারের দিন প্রত্যেক মানুষের হাতে যে দলীল দেয়া হবে। |
| আমানাহ্ (আমানত) | اَمَانَة | ঃ | (বহুবচন اَمَانَات ) কারো কাছে গচ্ছিত রাখা ধনসম্পদ। (সূরাহ আল্‌-বাকারাহ– ২ ঃ ২৮৩; আন্‌-নিসা’– ৪ ঃ ৫৮; আল্‌-আন্‌ফাল– ৮ ঃ ২৭) |
| আ‘মাল | اَعْمَال | ঃ | (একবচন عَمَل) কাজকর্ম। দ্বীনী পরিভাষায় ভাল বা মন্দ বলে পরিগণিত সব কাজকর্ম। |
| আমীন | اَمِين | ঃ | সূরাতুল ফাতিহাহ্ তিলাওয়াত বা আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট দু‘আ করার পর এ শব্দটি উচ্চারণ করা হয়। এর অর্থ “হে আল্লাহ্! আমার দু‘আ কবুল করুন।” |
| আয্‌-যাহ্‌রা | اَلزَّهْرَاء | ঃ | হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমাহ্ (রাঃ)-এর একটি উপাধি। এর অর্থ ‘প্রোজ্জ্বল সৌন্দর্যের অধিকারিনী’। |
| ‘আযরাঈল | عِزْرَائِيل | ঃ | (আরবীতে ‘ঈযরাঈল হিসেবে উচ্চারিত।) একজন ফেরেশ্‌তার নাম; কুর’আন  মজীদে তাঁকে মালাকুল মাওত–مَلَكُ الْمَوْت অর্থাৎ ‘মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরাহ আস্‌-সাজ্‌দাহ– ৩২ ঃ ১১; তাফসীরে ইবনে কাছীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৩, বৈরুত, ১৯৮১) |
| আযান | اَذَان | ঃ | ছালাতের জন্য আহ্বান। |
| আয়াহ্ (আয়াত) | آيَة | ঃ | (বহুবচনে– آيَات ) কুর’আন  মজীদের এক একটি বাক্য (Verse) বা বাক্যের অংশ। |
| আর্‌কানুল ইসলাম | اَرْكَانُ الْاِسْلَام | ঃ | ইসলামের স্তম্ভসমূহ অর্থাৎ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক কর্তব্যকাজ। |
| ‘আরাফাত্ | عَرَفَات | ঃ | মক্কাহ থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি সমতল জায়গা; হাজ্জের সময় হাজ্জযাত্রীগণ এখানে সমবেত হন। (সূরাহ আল্‌-বাকারাহ- ২ ঃ ১৯৮) |
| ‘আরেফ | عَارِف | ঃ | যিনি আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলী সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতসহ ‘ইবাদাত-বন্দেগী করেন। |
| আল্‌-আমীন | اَلْاَمِين | ঃ | হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি উপাধি। এর অর্থ ‘বিশ্বস্ত’, ‘নির্ভরযোগ্য’ ও ‘আমানতদার’। |
| আল্‌-‘আকাবাহ | اَلْعَقَبَة | ঃ | মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা। এখানে মদীনাহ থেকে আগত মুসলমানগণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট শপথ গ্রহণ করেন |
| আল্‌-‘আনকাবুত | اَلْعَنْكَبُوت | ঃ | কুর’আন  মজীদের ২৯নং সূরাহর নাম; এর অর্থ ‘মাকড়শা’। |

| | | |
|---|---|---|
| আল্-আনছার | اَلْاَنْصَار | আনছার দ্রষ্টব্য। |
| আল্-'আলাক | اَلْعَلَق | কুর'আন মজীদের ৯৬নং সূরাহ্র নাম। 'আলাক দ্রষ্টব্য। |
| আল্-ইসলাম | اَلْاِسْلَام | ইসলাম দ্রষ্টব্য। |
| আল্-ঈমানুল মুফাছ্ছাল | اَلْاِيْمَانُ الْمُفَصَّل | বিস্তারিত ঈমান। |
| আল্-'উয্যা | اَلْعُزّٰى | জাহেলী যুগের আরব মুশরিকদের অন্যতম গোত্র বানু শাইবান-এর দেবমূর্তি। এটি ছিল সে যুগের নামকরা দেবমূর্তিসমূহের অন্যতম। হযরত খালিদ বিন আল্-ওয়ালীদ (রাঃ) এটিকে ধ্বংস করেন। |
| আল্-কাদ্র | اَلْقَدْر | এর অর্থ 'পরিমাণ' বা 'ভাগ্য'। এর দ্বারা সকল সৃষ্টির সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞানকে বুঝানো হয়। |
| আল্-কা'বাহ | اَلْكَعْبَة | মক্কাহ নগরীতে অবস্থিত বাইতুল্লাহ (আল্লাহ্র ঘর)। |
| আল্-কালিমাতুত্ তাইয়্যিবাহ | اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَة | 'পবিত্র বাক্য'; আশ্-শাহাদায় যে কথা বলা হয় তার নাম। |
| আল্-কুর'আন | اَلْقُرْآن | কুর'আন দ্রষ্টব্য। |
| আল্-কুব্রা | اَلْكُبْرٰى | 'বৃহত্তম' বা 'মহানতম' ( اَلْكَبِير -শব্দের স্ত্রীবাচক)। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর উপাধি। |
| আল্-খুলাফাউর রাশিদুন | اَلْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْن | 'সঠিকভাবে পরিচালিত খলীফাহগণ'। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পরে যে চার ব্যক্তি পর পর খলীফাহ্ হন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত 'উমার (রাঃ), হযরত 'উছমান (রাঃ) ও হযরত 'আলী (রাঃ)। |
| আল্-গানী | اَلْغَنِى | খলীফাহ্ হযরত 'উছমান (রাঃ)-এর উপাধি; অর্থ 'ধনী'। |
| আল্-গুর্রুল মুহাজ্জালুন | اَلْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْن | এর অর্থ 'বিশেষভাবে বা দৃষ্টি-গ্রাহ্যভাবে উজ্জ্বল'। মুসলমানদের উযূ'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হাশরের দিনে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে উজ্জ্বলতার অধিকারী হবে এবং ফেরেশ্তাগণ তাঁদেরকে এই বলে সম্বোধন করবে। |
| আল্-জান্নাহ্ | اَلْجَنَّة | জান্নাত দ্রষ্টব্য। |
| আল্-জাহান্নাম | اَلْجَهَنَّم | জাহান্নাম দ্রষ্টব্য। |
| আল্-ফারূক | اَلْفَارُوْق | খলীফাহ্ হযরত 'উমার (রাঃ)-এর উপাধি। এর অর্থ 'সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী'। |
| আল্-বাইহাকী | اَلْبَيْهَقِى | আবু বকর আহ্মাদ বিন হুসাইন আল্- বাইহাকীর হাদীছ সংকলন-এর সংক্ষিপ্ত নাম। |
| আল্-বির্র্ | اَلْبِرّ | এর মানে 'ন্যায়পরায়ণতা'। কুর'আন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্য করা সকল ভাল কাজ ও চেষ্টা-সাধনা বুঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। |
| আল্-বুখারী | اَلْبُخَارِي | ইমাম আল্-বুখারী (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীছ সংকলন ছহীহ আল্-বুখারী-র সংক্ষিপ্ত নাম। |
| আল্-মারওয়াহ্ | اَلْمَرْوَة | আছ্-ছাফা পাহাড়ের বিপরীত দিকে, কা'বা ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত পাহাড়ের নাম। (সূরাহ আল্-বাকারাহ– ২ঃ ১৫৮) |

| | | |
|---|---|---|
| আল্-মাস্জিদুল আক্ছা | اَلْمَسْجِدُالاَقْصٰى | বায়তুল মাক্দিস (জেরু-সালেম)-এর প্রাচীনতম মসজিদ; মক্কার আল্-মাস্জিদুল হারামকে কিবলাহ নির্ধারণের আগে এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলাহ। (সূরাহ বানী-ইসরাঈল– ১৭ ঃ ১) |
| আল্-মাস্জিদুল হারাম | اَلْمَسْجِدُالْحَرام | মক্কাহ নগরীর পবিত্র মসজিদ যা মুসলমানদের কিবলাহ; আল্ কা'বাহ এর মাঝে অবস্থিত। |
| আল্-মাস্জিদুন নাবাবী | اَلْمَسْجِدُالنَّبَوِى | মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মসজিদ। |
| আল্-মি'রাজ | اَلْمِعْرَاج | হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উর্ধলোকে সফর যা তাঁর নবুওয়াতের দশম বছরের রাজাব মাসে সংঘটিত হয়। (সূরাহ আন্-নাজ্‌ম– ৫৩ ঃ ১১-১২) |
| আল্-মুর্তাযা | اَلْمُرْتَضٰى | চতুর্থ খলীফাহ হযরত 'আলী (রাঃ)-এর একটি উপাধি, এর অর্থ 'আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত'। |
| আল্-লাত্ | اَللاّت | জাহেলিয়াতের যুগে আরবের তায়েফ নগরীর আছ্-ছাকীফ গোত্রের দেবমূর্তি। হযরত মুগীরাহ বিন্ শু'বাহ (রাঃ) এটিকে ধ্বংস করেন। |
| আল্-হাজারুল আস্ওয়াদ | اَلْحَجَرُالاَسْوَد | কা'বাহ গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপিত পবিত্র কালো পাথর। |
| 'আলাক | علق | 'যা আঁকড়ে থাকে'; মাতৃগর্ভে নিষিক্ত ভ্রূণের সূচনাকালীনরূপ। একে 'জমাট রক্ত' রূপেও অনুবাদ করা হয়। |
| আলে ইবরাহীম | اٰل اِبْرَاهِيم | হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবার বা বংশ। |
| আলে 'ইম্‌রান | اٰل عِمران | কুর'আন মজীদের তৃতীয় সূরাহর নাম। এর অর্থ 'ইমরান-পরিবার বা ইমরান-বংশ'। |
| আলে মুহাম্মাদ | اٰل مُحَمَّد | আহ্‌লুল বাইত দ্রষ্টব্য। |
| আল্লাহ্ | اَللّٰه | সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তার আসল বা মূল নাম। তিনি শুধু মুসলমানদের ইলাহ্ (উপাস্য) নন, বরং সকল মানুষের ইলাহ্। |
| আশ্-শাহাদাহ | اَلشَّهَادَة | শাহাদাহ দ্রষ্টব্য। |
| 'আশূরা | عَاشُوْرَاء | ইসলামী বর্ষপঞ্জীর প্রথম মাস মুহাররামের দশম দিবস। এ দিনে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) শহীদ হন। |
| আসাদুল্লাহ | اَسَدُاللّٰه | 'আল্লাহ্‌র সিংহ'। চতুর্থ খলীফাহ হযরত 'আলী (রাঃ)-এর একটি উপাধি। |
| আহকাম | اَحْكَام | (একবচন, হুক্‌ম- حُكْم ) ইসলামী বিধি-বিধান। |
| আহযাব | اَحْزَاب | এর অর্থ 'সৈন্যদলসমূহ' বা 'মিত্রবর্গ'। কুর'আন মজীদের ৩৩নং সূরাহর নাম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যে সব যুদ্ধ করেন তার মধ্যে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের নাম। |
| আহ্‌লুল বাইত | اَهْلُ الْبَيْت | গৃহবাসীগণ। ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্যগণ। |
| আহাদীছ | اَحَادِيث | (একবচনে 'হাদীছ'- حَدِيث) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কথা ও কাজ এবং তাঁর অনুমোদিত কার্যাবলীর বিবরণ। |
| ইয়াওমুল কিয়ামাহ | يَوْمُ الْقِيَامَة | মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন ও শেষবিচারের দিন। |

| | | |
|---|---|---|
| ইকরা' | اِقْرَأْ | ঃ আদেশবাচক শব্দ; এর অর্থ 'পড়'। হিরা' গুহায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট নাযিল হওয়া কুর'আন মজীদের প্রথম শব্দ (সূরাহ আল্-আলাক- ৯৬ ঃ ১)। |
| ইকামাহ | اَلْاِقَامَةُ | ঃ ছালাতের জন্যে দ্বিতীয় বারের আহ্বান। জামা'আতে ছালাত শুরুর পূর্ব মূহূর্তে ইকামাহ বলা হয়। |
| ইজ্তিহাদ | اِجْتِهَاد | ঃ কুর'আন ও হাদীছের ভিত্তিতে গবেষণা করে বিভিন্ন বিষয়ে শারী'আহর বিধি-বিধান উদ্‌ঘাটনের কাজ। যিনি একাজ করেন তাঁকে মুজতাহিদ বলা হয়। |
| ইজ্মা' | اَلْاِجْمَاع | ঃ ইসলামী বিধি-বিধানের কোন বিষয়ে ইসলাম-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মতৈক্য। এটি ইসলামী শারী'আহর অন্যতম উৎস। |
| ই'তিদাল | اِعْتِدَال | ঃ ছালাত আদায়কালে রুকূ'র পরে পুনরায় কিয়াম-এর অবস্থায় যাওয়া অর্থাৎ পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়ানো। |
| ইনছাফ | اِنْصَاف | ঃ আভিধানিক অর্থ 'অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যাওয়া'। পারিভাষিক অর্থে 'ন্যায়বিচার' ও 'ন্যায়নীতি'। |
| ইন্‌জীল | اِنْجِيل | ঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব। |
| ইন্তেকাল | اِنْتِقَال | ঃ অর্থ 'স্থানান্তরিত হওয়া'। যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের রূহ্ বস্তুজগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হয়, তাই বাংলা ভাষায় মুসলমানদের জন্য 'মৃত্যু' বুঝাতে ইন্তেকাল ব্যবহার করা হয়। |
| ইফতার | اِفْطَار | ঃ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের মাধ্যমে ছাওম ভঙ্গ করা। |
| ইবলীস | اِبْلِيس | ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য শয়তান-এর ব্যক্তিবাচক নাম। সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে বিতাড়িত হয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করার শপথ গ্রহণ করে। |
| 'ইবাদাহ ('ইবাদত) | عِبَادَةٌ | ঃ সাধারণতঃ বাধ্যতামূলক 'ইবাদাতকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সম্পাদিত যে কোন বৈধ কাজই 'ইবাদাত। এর শাব্দিক অর্থ 'দাসত্ব'। আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে ও তাঁর উপাসনা করে তাঁর দাসত্ব করা হয় বলেই এসব কাজকে'ইবাদাত বলা হয়েছে। |
| ইমাম | اِمَام | ঃ এর মানে 'নেতা'। যিনি জামা'আতে ছালাত আদায়ে নেতৃত্ব দেন; তাঁকেও 'ইমাম' বলা হয়। |
| ইমামাত | اِمَامَة | ঃ নেতৃত্ব ও ছালাতে নেতৃত্ব। |
| 'ইযরাঈল | عِزْرَائِيل | ঃ 'আযরাঈল দ্রষ্টব্য। |
| ইয়াওমুদ্দীন | يَوْمُ الدِّيْن | ঃ মৃত্যুপরবর্তী জীবনে শেষবিচারের দিন। |
| ইয়াওমুল আখির | اَلْيَوْمُ الْآخِرُ | ঃ অর্থ 'শেষ দিন'। অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী জীবনে শেষবিচারের দিন। |
| ইয়াছ্‌রিব | يَثْرِب | ঃ ইসলামপূর্ব যুগে মদীনার নাম। (সূরাহ আল্- আহ্‌যাব- ৩৩ ঃ ১৩) |
| ইয়াতীম | يَتِيم | ঃ পিতৃহীন ছেলে-মেয়ে। |
| ইলাহ্ | اِلٰه | ঃ উপাস্য; যিনি 'ইবাদাত-বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত। |
| 'ইশা' | عِشَاء | ঃ রাতের ছালাত। |

| | | |
|---|---|---|
| ইসরাঈল | إِسْرَائِيل | ঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর আরেক নাম। এ থেকেই বানু ইসরাঈল বা বানী ইসরাঈল অর্থাৎ 'ইসরাইলের বংশধর' কথাটি এসেছে। |
| ইসরাফীল | إِسْرَافِيل | ঃ একজন ফেরেশ্‌তা যার শিঙ্গা ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে বিশ্বজাহানের ধ্বংস এবং সকল মানুষের পুনরুজ্জীবন ও শেষবিচার শুরু হবার সংকেত দেয়া হবে। (সূরাহ্ আল্‌-কাহফ- ১৮ ঃ ৯৯; ইয়া-সীন- ৩৬ ঃ ৫১; আল্‌-মু'মিনুন- ২৩ ঃ ১০১; আয-যুমার- ৩৯ ঃ ৬৮ এবং ছহীহ্ মুসলিম, প্রথম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬৯৪) |
| ইসলাম | إِسْلَام | ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির জন্যে যে দ্বীন বা জীবনবিধান নাযিল করেছেন তিনি তার এ নাম দিয়েছেন। এর শাব্দিক অর্থ 'আত্মসমর্পণ করা' বা 'আনুগত্য করা' এবং পারিভাষিক অর্থ দুনিয়ায় ও আখিরাতে শান্তি লাভের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহকামের নিকট আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর আনুগত্য করা। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে এ দ্বীনের সূচনা হয় এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এ জীবন বিধান পূর্ণতা লাভ করে। |
| ইস্তিগফার | إِسْتِغْفَار | ঃ আল্লাহ্‌র নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা। |
| ইহরাম | إِحْرَام | ঃ হাজ্জের সময় হাজ্জযাত্রীরা যে বিশেষ পোশাক পরিধান করেন তার নাম। |
| ইহ্‌সান | إِحْسَان | ঃ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে ওঠার পর একজন মু'মিন এমনভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমসমূহ মেনে চলে যে সে যেন আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছে এবং সে যদি আল্লাহ্‌কে দেখতে না-ও পায় তো জানে যে, আল্লাহ্ তাকে সব সময়ই দেখতে পান। (সূরাহ আন্‌-নাহল- ১৬ ঃ ৯০) |
| 'ঈদগাহ | عِيدگاه | ঃ (ফার্সী) দুই 'ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত মাঠ। |
| 'ঈদুল আয্‌হা | عِيدُ الأَضْحَى | ঃ দশ থেকে ১৩ই যুলহিজ্জাহ পর্যন্ত পশু কুরবানীর বার্ষিক উৎসব। |
| 'ঈদুল ফিত্‌র | عِيدُ الْفِطْر | ঃ রামাদান মাসের ছাওম-এর পর ১লা শাওয়াল তারিখের বার্ষিক উৎসব। |
| ঈমান | إِيمَان | ঃ বিশ্বাস বা প্রত্যয়। |
| উম্মাহ | أُمَّة | ঃ সম্প্রদায়, জাতি। (সূরাহ আলে'ইমরান- ৩ ঃ ১১০) |
| উম্মী | أُمِّي | ঃ লিখতে পড়তে জানে না এমন ব্যক্তি। কুর'আন মজীদে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। |
| 'উমরাহ | عُمْرَة | ঃ মক্কায় অবস্থিত কা'বাহ গৃহের আনুষ্ঠানিক যিয়ারত (আল-বাকারাহ- ২ ঃ ১৫৮) যা হাজ্জের সময় ছাড়া অন্য সময় করা যায়। একে 'ছোট হাজ্জ'ও বলা হয়। |
| 'উযযা | | ঃ আল্‌-'উযযা দ্রষ্টব্য। |
| উযূ' | وُضُوْء | ঃ ছালাতের জন্যে সুনির্দিক নিয়মে চেহারা ও হাত-পা ধোয়া ও মাথা মাসেহ করা। |
| উস্‌ওয়াতুন হাসানাহ | أُسْوَة حَسَنَة | ঃ 'সুন্দর (অনুকরণীয়) আদর্শ'। কুর'আন মজীদে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। |
| উহুদ | أُحُد | ঃ মদীনা থেকে উত্তরে অবস্থিত একটি পাহাড়। হযরত মুহাম্মাদ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (সাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ এখানে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধ করেছিলেন। |
| এরশাদ | إرْشَاد | ঃ | সঠিক পথ প্রদর্শন। আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর কথা সঠিক পথ প্রদর্শনকারী বিধায় 'বলেন' বুঝাতে 'এরশাদ করেন' ব্যবহৃত হয়। |
| ওয়াকিফহাল | وَاقِفْحَال | ঃ | যিনি অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত বা অবগত। |
| ওয়াক্ত | وَقْت | ঃ | সময়। ছালাত, ইফতার ও সাহুরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। |
| ওয়াজিব | وَاجِب | ঃ | বাধ্যতামূলক। |
| ওয়াদা | وَعْدَه | ঃ | অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি। |
| ওয়াহী | وَحْى | ঃ | আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের (আঃ) নিকট পাঠানো প্রত্যাদেশ। |
| করীম | كَرِيْم | ঃ | মহানুভব। |
| কসম | قَسَم | ঃ | শপথ, কোন কিছু করার জন্য প্রতিজ্ঞা। |
| কাইনুকা' | قَيْنُقَاع | ঃ | হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতকালে সেখানে বসবাসরত একটি গোত্রের নাম ছিল বানু কাইনুকা'। |
| কাওছার | كَوْثَر | ঃ | অর্থ 'আধিক্য', 'প্রাচুর্য'। বেহেশ্‌তের একটি ঝর্ণাধারার নাম যা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইখতিয়ারে থাকবে এবং তিনি মু'মিনদের তা থেকে পান করাবেন। |
| কাদ্‌র | قَدْر | ঃ | এর অর্থ 'পরিমাপ', 'শক্তি' ও 'ভাগ্য'। |
| কাদিসিয়াহ | قَادِسِيَة | ঃ | ইরাকে অবস্থিত একটি জায়গা। এখানে ৬৩৬-৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। |
| কাফন | كَفَن | ঃ | মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর কাপড় দিয়ে আবৃত করা। |
| কাফির | كَافِر | ঃ | (বহুবচনে কাফিরূন, ও কুফ্‌ফার) ইসলামে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তি; অমুসলিম। |
| কা'বাহ | اَلْكَعْبَة | ঃ | আল্‌-কা'বাহ দ্রষ্টব্য। |
| কাযা' | قَضَاء | ঃ | যথাসময়ে আদায় করা হয়নি এমন ছালাত যা পরে আদায় করা হয়। |
| কায়েম | قَائِم | ঃ | দাঁড়ানো অবস্থা, প্রতিষ্ঠিত অবস্থা। 'কায়েম করা' মানে 'প্রতিষ্ঠা করা'। |
| কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ | | ঃ | আল-কালিমাতুত্ তাইয়্যিবাহ' দ্রষ্টব্য। |
| কিতাব | كِتَاب | ঃ | পুস্তক, গ্রন্থ। কুর'আন মজীদে কুর'আনের জন্য আল-কিতাব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। |
| কিবলাহ | قِبْلَة | ঃ | মক্কাহ্ নগরীর কা'বাহ ঘরের দিক, মুসলমানরা এদিকে মুখ করে ছালাত আদায় করে। |
| কিয়াম | قِيَام | ঃ | ছালাতের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা। |
| কিয়ামত | قِيَامَة | ঃ | 'ইয়াওমুল কিয়ামাহ' দ্রষ্টব্য। |
| কিয়াস | قِيَاس | ঃ | ইসলামী শারী'আহতে কোন সমস্যার সমাধান বের করার জন্যে কুর'আন -সুন্নায় সমাধান আছে এমন কোন সমস্যার সাথে তুলনা করা ও এজন্য যুক্তি পেশ করা। |

| | | |
|---|---|---|
| কিরামান কাতিবীন | كِرَامًا كَاتِبِيْن | ঃ অর্থাৎ সম্মানিত লেখকগণ। (সূরাহ আল্- ইনফিতার- ৮২ ঃ ১১) মানুষ পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা অবস্থায় যা কিছু করে তা লিখে রাখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশ্তাদের সম্পর্কে এ পরিচয় দেয়া হয়েছে। |
| কুতুবুল্লাহ | كُتُبُ اللّٰه | ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহ। |
| কুদ্‌রাত | قُدْرَة | ঃ শক্তি, ক্ষমতা। শুধু আল্লাহ্‌র সীমাহীন ও বিস্ময়কর কার্যক্ষমতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। |
| কুরবানী | قُرْبَانِي | ঃ মূল আরবী 'কুরবান' ( قُرْبَان ); আভিধানিক অর্থ 'নিকটবর্তী হওয়া' বা তার মাধ্যম। পারিভাষিক অর্থ 'উৎসর্গ'। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য 'ঈদুল আযহার সময় গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি যবেহ্ করা। |
| কুর'আন | اَلْقُرْاٰن | ঃ মুসলমানদের পবিত্র কিতাব। এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াতের জন্যে নাযিলকৃত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে হযরত জিবরাঈল ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর এ কিতাব নাযিল করা হয়। |
| কুরাইযাহ | قُرَيْظَة | ঃ বানু কুরাইযাহ ছিল মদীনার অন্যতম ইয়াহূদী গোত্র। |
| খন্দক | خَنْدَق | ঃ আগেকার দিনে শহর বা দুর্গ রক্ষার জন্যে যে প্রশস্ত ও গভীর খাদ খনন করা হত তাকে খন্দক বলা হয়। আহ্‌যাবের যুদ্ধের সময় মদীনাহকে রক্ষা করার জন্যে খন্দক খনন করা হয়েছিল বলে একে 'খন্দকের যুদ্ধ'ও বলা হয়। |
| খলীফাহ | خَلِيْفَة | ঃ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি। |
| খাইবার | خَيْبَر | ঃ মদীনাহ্ থেকে ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি মরুদ্যান। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াত্-কালে এখানে ইয়াহূদীরা বসবাস করত। |
| খায্‌রাজ | خَزْرَج | ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় মদীনায় বসবাসকারী অন্যতম গোত্র। |
| খালীলুল্লাহ | خَلِيْلُ اللّٰه | ঃ অর্থ 'আল্লাহ্‌র বন্ধু'। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপাধি। |
| খিলাফাত্ | خِلَافَة | ঃ খলীফাহ্‌র পদ; খলীফাহ্‌র শাসন, খলীফাহ্‌র শাসনকাল। |
| খুত্‌বাহ | خُطْبَة | ঃ ছালাতুল জুমু'আহর আগে প্রদত্ত ভাষণ যাতে সাধারণতঃ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে আলোচনা করা হয়। |
| খুল্'উ | خُلْعٌ | ঃ বৈবাহিক জীবন অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লে ইসলামী আইন অনুযায়ী স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট থেকে তালাক দাবী করার অধিকার। |
| খেদমত | خِدْمَة | ঃ সেবা। 'খেদমতে' মানে 'সেবায়'; 'সমীপে'। |
| খেয়ানত | خِيَانَة | ঃ আমানত নষ্ট বা আত্মসাত, বিশ্বাসঘাতকতা। |
| খোদা | خُدا | ঃ (ফার্সী) অর্থ 'ইলাহ' বা 'উপাস্য', 'সকল কিছুর স্রষ্টা', 'প্রতিপালক'। ব্যক্তি বাচক নাম হিসেবে 'আল্লাহ্'র ফার্সী প্রতিশব্দ। সাধারণ অর্থে 'মালিক; অধিকর্তা' ও 'উপাস্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গযব | غَضَب | ঃ | ক্রোধ; আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। |
| গনীমত | غَنِيمَة | ঃ | যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের হস্তগত হওয়া অমুসলিম শত্রুদের অস্ত্র ও সম্পদ। |
| গায়রু মুআক্কাদাহ (সুন্নাত) | غَيْرُ مُؤَكَّدَة | ঃ | এক ধরনের সুন্নাত ছালাত। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মাঝে মাঝে এ ছালাত আদায় করতেন। এর বিপরীত হচ্ছে সুন্নাতু মুআক্কাদাহ। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এ ধরনের ছালাত নিয়মিত আদায় করতেন, যেমন ঃ ফজরের ফরজ ছালাতের আগে দুই রাক্‌'আত সুন্নাত্ ছালাত। |
| গায়রে মাহ্‌রাম | غَيْرِ مَحْرَم | ঃ | মাহরাম নয় এমন ব্যক্তি। মাহরাম দ্রষ্টব্য। |
| গায়েবী | غَائِبِي | ঃ | (ফার্সী) গোপন উৎসজাত। 'গায়েবী সাহায্য' মানে আল্লাহ্‌র সাহায্য। |
| গীবত | غِيبَة | ঃ | পরচর্চা, কারো অবর্তমানে তার দোষ অন্য ব্যক্তিকে বলা। |
| গুনাহ | گُنَاه | ঃ | (ফার্সী) পাপ। |
| গুস্‌ল | غُسْل | ঃ | পবিত্রতা অর্জনের জন্য সারা শরীর ধোয়া। (সূরাহ আন্-নিসা'- ৪ ঃ ৪৩; সূরাহ্ আল্- মায়িদাহ - ৫ ঃ ৬) |
| গোনাহ | | ঃ | 'গুনাহ' দ্রষ্টব্য। |
| গোলাম | غُلَام | ঃ | ছেলে, যুবক (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ৪০, সূরা্ ইউসুফ– ১২ ঃ ১৯, সূরাহ আল-হিজর্– ১৫ ঃ ৫৩) গোলাম শব্দের আরেক অর্থ 'দাস'। |
| গোমরাহ | گُمْرَاه | ঃ | (ফার্সী) প্রথভ্রষ্ট, সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। |
| গোসল | غُسْل | ঃ | 'গুস্‌ল' দ্রষ্টব্য। |
| ছবর | صَبْر | ঃ | ধৈর্য। ইসলামী পরিভাষায় কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সত্যের ওপর অটল থাকা। |
| ছাওম | صَوْم | ঃ | আল্লাহ্‌র হুকুম পালন ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুব্‌হে ছাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা। একে প্রচলিত কথায় 'রোযা' বলা হয়। রামাদান মাসের ছাওম্ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক কর্তব্যের অন্যতম। |
| ছাওয়াব | ثَوَاب | ঃ | উত্তম প্রতিদান। |
| ছাওর্ | ثَوْر | ঃ | মক্কার নিকটবর্তী একটি পর্বতগুহা; হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-সহ মদীনায় হিজরত-কালে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। (সূরাহ আত্-তাওবাহ– ৯ ঃ ৪০) |
| ছাদাকাহ | صَدَقَة | ঃ | ইসলামী পরিভাষায় ঐচ্ছিক দান। অবশ্য যাকাত বুঝাতেও এ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। (সূরাহ আত-তাওবাহ- ৯ ঃ ৬০) |
| ছানা' | ثَنَاء | ঃ | এর মানে 'প্রশংসা' বা 'গুণকীর্তন'। ছালাতের শুরুতে তাক্‌বীরাতুল্ ইহরাম বলার পর যে "সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা....." পড়া হয় একেও ছানা' বলা হয়। |
| ছাফার্ | صَفَر | ঃ | ইসলামী সালের দ্বিতীয় মাস। |
| ছালাত | صَلَاة | ঃ | বিশেষ নিয়মে দৈনিক পাঁচ বার যে "ইবাদাত করা হয়। ফার্সী ভাষায় এর নাম 'নামায' যা বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ছালাতুল্ জানাযাহ | صَلاةُ الْجَنَازَة | ঃ | দাফনের পূর্বে মৃতদেহ সামনে রেখে যে বিশেষ ছালাত আদায় করা হয়। |
| ছালাতুল্ জুমু'আহ | صَلاةُ الجُمعة | ঃ | শুক্রবার যুহরেরর ওয়াক্তে খুৎবাহসহ জা-মা'আতে যে বিশেষ ছালাত আদায় করা হয়। (সূরাহ আল- জুমু'আহ- ৬২ ঃ ৯) |
| ছাহাবাহ | صَحَابَة | ঃ | (একবচনে صَحَابِي) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ যারা ঈমান সহকারে তাঁকে দেখেছেন। |
| ছাহাবী | صَحَابِي | ঃ | ছাহাবাহ দ্রষ্টব্য। |
| ছিরাতুল মুস্তাকীম | الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم | ঃ | সরল পথ, সুদৃঢ় পথ অর্থাৎ ইসলামের নির্দেশিত পথ। |
| জানাযাহ | جَنَازَة | ঃ | দাফনের আগে মৃত ব্যক্তির জন্যে ছালাত। |
| জান্নাত্ | جَنَّة | ঃ | বেহেশ্‌ত- শেষবিচারের পরে নেককার লোকদের চিরস্থায়ী বসবাসের জন্যে নির্ধারিত সীমাহীন নি'আমতে পরিপূর্ণ জায়গা। আভিধানিক অর্থে জান্নাত্ মানে 'বাগান'। |
| জান্নাতুল ফিরদাউস্ | جَنَّةُ الفِرْدَوْس | ঃ | আকর্ষণীয় বাগান বিশিষ্ট বেহেশত্; একটি বেহেশ্‌তের নাম। |
| জামা'আত্ | جَمَاعَة | ঃ | সারিবদ্ধভাবে ইমামের পিছনে ছালাত আদায়। ইসলামী সংগঠনকেও জামা'আত বলা হয়। |
| জাহান্নাম্ | جَهَنَّم | ঃ | শেষবিচারের পরে পাপীদের চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য নির্ধারিত সীমাহীন দুঃখ-কষ্টময় জায়গা। |
| জাহিলিয়্যাত্ | جَاهِلِيَّة | ঃ | অজ্ঞতা বা মূর্খতা। |
| জিন্ | جِنّ | ঃ | আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী এক বিশেষ প্রজাতি যাদেরকে ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। |
| জিব্‌রাঈল্ | جِبْرَائِيل | ঃ | আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ওয়াহী আনয়নকারী ফেরেশ্‌তা। (সূরাহ আল্-বাকারাহ- ২ ঃ ৯৭-৯৮) |
| জিয্‌ইয়াহ | جِزْيَة | ঃ | ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের হেফাযত ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়ার বিনিময়ে তাদের ওপর আরোপিত বিশেষ কর। (সূরাহ আত্-তাওবাহ-৯ ঃ ২৯, এছাড়া আল্-বুখারী ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৪-৩৮৬) |
| জিহাদ | جِهَاد | ঃ | ইসলাম নির্ধারিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এর অর্থ হচ্ছে জান-মালসহ সবকিছু কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। |
| জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ | جِهَادٌ فِي سَبِيلِ الله | ঃ | আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সমাজে ন্যায়ের (মা'রূফ) প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় (মুন্‌কার) প্রতিহত করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। |
| জূদী | جُودِي | ঃ | তুরস্কে অবস্থিত জূদী পর্বত। এর ওপরে হযরত নূহ (আঃ)-এর কিশ্‌তী (কাঠের তৈরী জাহাজ) অবস্থান গ্রহণ করে। (সূরাহ হূদ- ১১ ঃ ৪৪) |
| জুমাদাল্ আখিরাহ | جُمَادَى الأُخْرَة | ঃ | ইসলামী সালের ষষ্ঠ মাস। একে 'জুমাদাছ্ ছানী'-ও বলা হয়। |
| জুমাদাল্ উলা | جُمَادَى الأُولَى | ঃ | ইসলামী সালের পঞ্চম মাস। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| জুমু'আহ | جُمُعَة | ঃ | শুক্রবার। ছালাতুল্ জুমু'আহ দ্রষ্টব্য। |
| জেরুসালেম | | ঃ | ফিলিস্তিনের প্রধান শহর। মুসলিম শাসনামলে একে আল্-কুদ্স্, বায়তুল মাক্দিস নামে অভিহিত করা হয়। 'মাসজিদুল আক্ছা' এখানে অবস্থিত যা ছিল মুসলমানদের প্রথম কিব্লাহ্। ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। শহরটি বর্তমানে ইসরাঈলী দখলাধীনে রয়েছে। |
| তা'আওউয্ | تَعَوُّذ | ঃ | "আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম্" বলা। |
| তা'আলা | تَعَالىٰ | ঃ | সমুন্নত, মহান। |
| তাওহীদ | تَوحِيد | ঃ | আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও অংশীদার না থাকা সংক্রান্ত ধারণা। |
| তাওবাহ্ | تَوبَة | ঃ | আভিধানিক অর্থ 'প্রত্যাবর্তন'; পারিভাষিক অর্থ গুনাহ্ ও ভুলত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং তা পুনরায় না করার সিদ্ধান্তসহ আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া। এছাড়া কুর'আন মজীদের ৯নং সূরাহ্র নাম 'আত্-তাওবাহ্'। |
| তাওয়াক্কুল | تَوَكُّل | ঃ | নির্ভরতা; ইসলামী পরিভাষায় 'আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতা'। |
| তাওয়াফ্ | طَوَاف | ঃ | হাজ্জ ও 'উমরাহ্র সময় কা'বাহ ঘরের চারদিকে পরিক্রমণ। (সূরাহ আল-বাকারাহ- ২ ঃ ১৫৮) |
| তাওরাহ | تَوْرَاة | ঃ | হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব। |
| তাক্ওয়া | تَقْوَى | ঃ | পরহেযগার; আল্লাহ্ সম্পর্কে সদাসচেতন থাকা বা সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে চলা। |
| তাক্বীর | تَكْبِير | ঃ | আল্লাহু আকবার বলা। |
| তাক্বীরাতুল ইহ্রাম | تَكْبِيرَةُ الإِحْرَام | ঃ | ছালাতের শুরুতে আল্লাহু আকবার বলা। |
| তাগূত | طَاغُوت | ঃ | আভিধানিক অর্থ 'বিদ্রোহী', সীমালঙ্ঘনকারী। ইসলামী পরিভাষায় শয়তান; আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদের উপাসনা করা হয় এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শাসক। |
| তাফসীর | تَفْسِير | ঃ | কুর'আন মজীদের অর্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। |
| তায়াম্মুম | تَيَمُّم | ঃ | পানি পাওয়া না গেলে বা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা করলে উযূ' বা গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি, ধূলা বা বালির দ্বারা পবিত্রতা হাসিল। |
| তায়েফ | طَايِف | ঃ | মক্কাহ থেকে ষাট মাইল পূর্বে অবস্থিত একটি শহর। |
| তারাবীহ্ | تَرَاوِيح | ঃ | রামাদান মাসে ছালাতুল 'ঈশা'র পরে যে বিশেষ ছালাত আদায় করা হয়। |
| তাল্বিয়াহ্ | تَلْبِيَة | ঃ | আভিধানিক অর্থ 'জবাব দান' বা 'সাড়া দেয়া'। পারিভাষিক অর্থে হাজ্জ বা 'উমরাহ্র সময় ইহ্রাম অবস্থায় "লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ....." বলা। |
| তালাক | طَلَاق | ঃ | কোনভাবেই বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা সম্ভব না হলে সে অবস্থায় ইসলামী শারী'আহ কর্তৃক স্বামীকে প্রদত্ত |

বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার প্রয়োগ। (সূরাহ আল্-বাকারাহ- ২ ঃ ২২৮-২৩২; সূরাহ আত্-তালাক– ৬৫ ঃ ১-৯)

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাশ্‌রীক্ | تَشْرِيق | ঃ | 'আইয়ামে তাশ্‌রীক' দ্রষ্টব্য। |
| তাশাহহুদ | تَشَهُّد | ঃ | ছালাতের দ্বিতীয় রাক্'আতে ও শেষ রাক্'আতে বসা অবস্থায় যা পড়া হয়। |
| তাস্‌বীহ | تَسْبِيح | ঃ | ছালাত আদায়কালে রুকূ'তে "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল 'আযীম" ও সিজদায় "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা" পড়া। এছাড়া ছালাতের বাইরে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনাকারী যে কোন বাক্য পড়া। |
| তাস্‌মিয়াহ | تَسْمِيَة | ঃ | "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়া; একে বিসমিল্লাহ্ পড়া বলা হয়। |
| তাহাজ্জুদ | تَهَجُّد | ঃ | মধ্যরাতের পরে ও ছুব্‌হে ছাদিকের পূর্বে যে নফল ছালাত আদায় করা হয়। |
| তাহারাহ | طَهَارَة | ঃ | পবিত্রতা। |
| তিরমিযী | اَلتِّرْمِذِي | ঃ | আত্-তিরমিযী দ্রষ্টব্য। |
| তিলাওয়াত | تِلَاوَة | ঃ | পড়া। শুধু কুর'আন পাঠের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। |
| তীরন্দায | تیرانداز | ঃ | (ফার্সী) তীর নিক্ষেপকারী সৈন্য। |
| তুওয়া | طُوَى | ঃ | সীনাই পর্বতের পবিত্র উপত্যকা। এখানে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে বাণী লাভ করেন। (সূরাহ ত্বাহা– ২০ ঃ ১২) |
| তোহমত্ | تُهْمَة | ঃ | খারাপ ধারণা, মিথ্যা অপবাদ। |
| দাওয়াত | دَعْوَة | ঃ | আহ্বান, আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। |
| দাফন | دَفْن | ঃ | মুসলমানের মৃতদেহকে গোসল করিয়ে ও কাফন পরিয়ে ছালাতুল জানাযাহর পরে কবর দেয়া। |
| দ্বীন | دِين | ঃ | এর মানে 'ধর্ম', 'জীবনব্যবস্থা', 'বিচার'। (সূরাতুল ফাতিহাহ– ১ ঃ ৩; আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৯; আল্-মায়িদাহ– ৫ ঃ ৩; আল্-মা'উন– ১০৭ ঃ ১; আল্-কাফিরূন– ১০৯ ঃ ৫; আন্-নাছ্‌র– ১১০ ঃ ২) বাংলায় 'ধর্ম' ও 'জীবনব্যবস্থা' অর্থে দ্বীন লেখা হয়। |
| দ্বীনদার | دِیندار | ঃ | (ফার্সী) ধার্মিক। |
| দ্বীনুল ফিত্‌রাহ | دِينُ الْفِطْرَة | ঃ | প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা বা প্রকৃতির ধর্ম। (সূরাহ আর্-রূম ঃ ৩০-৩০) |
| দু'আ' | دُعَاء | ঃ | অনুনয়-বিনয়সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা। |
| দু'আ' আল্-কুনুত | اَلدُّعَاءُ الْقُنُوت | ঃ | ছালাতুল বিত্‌রের তৃতীয় রাক্'আতে দাঁড়ানো অবস্থায় পড়ার বিশেষ দু'আ'। |
| দরূদ | دُرُود | ঃ | (ফার্সী) ছালাতের ভিতরে শেষ রাক'আতে বসা অবস্থায় যে "ছালাতু আলান্ নাবিয়্যি" পড়া হয় এবং ছালাতের বাইরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ বা শোনার পর "ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম" অথবা "আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলে মুহাম্মাদ" পড়া। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| দুনিয়া | دُنْيَا | ঃ | পৃথিবীর জগত, পার্থিব জগত। |
| দোযখ | دوزخ | ঃ | (ফার্সী) 'জাহান্নাম' দ্রষ্টব্য। |
| নছীহত্ | نَصِيحَة | ঃ | সদুপদেশ। |
| নফল | نَافِلَة | ঃ | নাফিলাহ্ দ্রষ্টব্য। |
| নবী | نَبِيّ | ঃ | আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত ওয়াহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বহুবচন আম্বিয়া' ( انبياء )। হযরত আদম (আঃ) প্রথম নবী ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী। |
| নবুওয়াত্ | نُبُوَّة | ঃ | নবীর পদ। |
| নহর | نهر | ঃ | ঝর্ণা, খাল, নদী। |
| নাপাক | ناپاك | ঃ | (ফার্সী) অপবিত্র। |
| নাপাকী | ناپاكى | ঃ | (ফার্সী) অপবিত্র অবস্থা, অপবিত্র বস্তু। |
| নাফরমানী | نافرمانى | ঃ | (ফার্সী) অবাধ্যতা, হুকুম অমান্য করা। |
| নাফিলাহ | نَافِلَة | ঃ | অতিরিক্ত, ঐচ্ছিক, ফরয নয় কিন্তু আদায় করলে ছাওয়াব আছে, এমন 'ইবাদাত। |
| নাবালেগ | نابالغ | ঃ | (ফার্সী) যে এখনো বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হয় নি। |
| নাবালেগা | نابالغه | ঃ | (ফার্সী) নাবালেগ-এর স্ত্রীবাচক। |
| নামায | نماز | ঃ | (ফার্সী) ছালাত দ্রষ্টব্য। |
| নাযাফাহ | نظافة | ঃ | পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। |
| নাযিল | نَازِل | ঃ | যা নীচে নেমে আসে। নাযিল হওয়া মানে অবতীর্ণ হওয়া; নাযিল করা মানে অবতীর্ণ করা। |
| নাযীর | نَضِير | ঃ | বানু নাযীর মদীনার একটি ইয়াহূদী গোত্র। |
| নি'মাহ (নি'আমাত্) | نِعْمَة | ঃ | (বহুবচনে নি'আম- نعم ) ধনসম্পদ ইত্যাদি ভোগ ও আনন্দের উপকরণ যা আল্লাহ্ তা'আলার দান ও অনুগ্রহ। |
| নিকাহ | نِكَاح | ঃ | বিবাহ। |
| নিছাব | نِصَاب | ঃ | একজন মুসলমানের সারা বছর সঞ্চিত কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হয়। |
| নিয়্যাত | نِيَّة | ঃ | (বহু বচনে نِيَّات ) কোন কাজ করার জন্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মনস্থির করা। |
| নূর | نُور | ঃ | আলো, জ্যোতি, আল্লাহ্র জ্যোতি। ফেরেশ্তারা আল্লাহ্র জ্যোতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। |
| নেককার | نيك كار | ঃ | (ফার্সী) যে ভাল কাজ করে, মুত্তাকী, পরহেযগার। |
| পরহেযগার | پرهيزگار | ঃ | (ফার্সী) যে ব্যক্তি গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকে; মুত্তাকী। |
| পাক | پاك | ঃ | (ফার্সী) পবিত্র। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফজর | فَجر | ঃ | ফাজ্‌র দ্রষ্টব্য। |
| ফতোয়া | فَتوى | ঃ | ফাত্‌ওয়া দ্রষ্টব্য। |
| ফায়সালা | فَيصَلَة | ঃ | 'ফায়ছালাহ' দ্রষ্টব্য। |
| ফরয | فَرض | ঃ | আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক হিসেবে নির্ধারিত কর্তব্য। |
| ফর্‌যে কিফায়াহ | فَرضُ كِفَايَة | ঃ | মুসলমানদের ওপর সমষ্টিগতভাবে ফরয এমন কাজ যা একজন বা কয়েকজন আদায় করলে অন্যরা তা আদায়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সকলেই গুনাহগার হয়। যেমন ঃ ছালাতুল জানাযাহ্‌। |
| ফাকীহ | فَقِيه | ঃ | ফিক্‌হ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি। |
| ফাজ্‌র | فَجر | ঃ | অর্থ 'ঊষা', ছুব্‌হে ছাদিক থেকে সূর্য উদয়ের পূর্বে যে ছালাত আদায় করা হয় তাকে ছালাতুল ফাজ্‌র বলা হয়। |
| ফাত্‌ওয়া | فَتوى | ঃ | কুর'আন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিষয়ে প্রদত্ত রায়। |
| ফায়ছালাহ | فَيصَلَة | ঃ | সিদ্ধান্ত। |
| ফিক্‌হ | فِقه | ঃ | আভিধানিক অর্থ 'বুঝ' বা 'সমঝ'। পারিভাষিক অর্থ ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান। |
| ফিক্‌হুয্‌ যাকাহ | فِقهُ الزَّكَاة | ঃ | যাকাত সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধান। (এছাড়া 'আল্লামা ইউসুফ আল্‌-কারাযাভী লিখিত একটি পুস্তকের নাম।) |
| ফির্‌'আউন | فِرعَون | ঃ | প্রাচীন মিসরের শাসকদের উপাধি। |
| ফেরেশ্‌তা | فِرشتة | ঃ | (ফার্সী) 'মালায়িকাহ' দ্রষ্টব্য। |
| বদর | بَدر | ঃ | মদীনাহ থেকে ১২৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি জায়গা। মুসলমানরা এখানে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ করেন। (সূরাহ আলে 'ইমরান– ৩ ঃ ১৩; সূরাহ আল্‌-আন্‌ফাল– ৮ ঃ ৪১) |
| বন্দেগী | بندگى | ঃ | (ফার্সী) 'ইবাদাত। |
| বাইতুল মাক্‌দিস | بَيتُ المَقدِس | ঃ | 'জেরুসালেম' দ্রষ্টব্য। |
| বাইতুল্লাহ | بَيتُ اللّٰه | ঃ | অর্থ 'আল্লাহ্‌র ঘর'; মক্কাহ নগরীতে কা'বাহ নামক ঘর। |
| বাতিল | بَاطِل | ঃ | মিথ্যা, ইসলামের বিপরীত পথ। |
| বানু | بَنُو | ঃ | কোন ব্যক্তির নামের আগে ব্যবহৃত হয়। (বাক্যমধ্যে ব্যাকরণের নিয়মে অনেক ক্ষেত্রে বানী بَنِى হয়।) অর্থ কারো বংশধর বা গোত্র। |
| বান্দাহ | بَندَه | ঃ | (ফার্সী) দাস, গোলাম। |
| বায়হাকী | البَيهَقِى | ঃ | আল্‌-বাইহাকী দ্রষ্টব্য। |
| বারাকাহ (বরকত) | بَرَكَة | ঃ | অর্থ 'বৃদ্ধি পাওয়া'; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কোন কিছুতে আশাতীত বৃদ্ধি বা ব্যবহারিক সুফল পাওয়া। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বালেগ | بَالِغ | ঃ | প্রাপ্তবয়স্ক। |
| বালেগাহ | بَالِغَة | ঃ | বালেগ-এর স্ত্রীবাচক। |
| বাশার | بَشَر | ঃ | মানুষ। (সূরাহ আল্-কাহফ– ১৮ ঃ ১১০) |
| বিত্‌র | اَلْوِتْر | ঃ | আভিধানিক অর্থ 'বেজোড়'। ছালাতুল 'ইশার পর যে ছালাত আদায় করা হয়। |
| বির্‌রি | بِرّ | ঃ | আল্-বির্‌রি দ্রষ্টব্য। |
| বিসমিল্লাহ | بِسْمِ اللّٰهِ | ঃ | তাসমিয়্যাহ দ্রষ্টব্য। |
| বুখারী | بُخَارِىْ | ঃ | আল্-বুখারী দ্রষ্টব্য। |
| বুনিয়াদী | بُنْيَادِى | ঃ | (ফার্সী) যা ভিত্তিস্বরূপ, মৌলিক। |
| বেহেশ্‌ত | بِهِشْت | ঃ | (ফার্সী) জান্নাত দ্রষ্টব্য। |
| মক্কাহ | مَكَّة | ঃ | মুসলমানদের সর্বাধিক পবিত্র স্থান। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্মস্থান। মুসলমানদের কিব্‌লাহ কা'বাহ এ শহরে অবস্থিত। কুর'আন মজীদে এ শহরকে 'বাক্কাহ'ও বলা হয়েছে। সূরাহ আলে 'ইমরান- ৩ ঃ ৯৬) |
| মজলিস | مَجْلِس | ঃ | আভিধানিক অর্থ বসার জায়গা। পারিভাষিক অর্থ সভা, বৈঠক। |
| মজীদ | مَجِيْد | ঃ | সুমহান, মর্যাদাবান, মহিমামণ্ডিত। |
| মদীনাহ্‌ | مَدِيْنَة | ঃ | মদীনাতুন নাবী-র সংক্ষেপ। |
| মসজিদ | مَسْجِد | ঃ | আভিধানিক অর্থ 'সিজদাহর জায়গা'। ইসলামী পরিভাষায় ছালাত আদায়ের জন্যে নির্মিত ঘর। অবশ্য এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত খোলা জায়গাও এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। |
| মহব্বত | مُحَبَّة | ঃ | ভালবাসা। |
| মাক্‌রূহ | مَكْرُوْه | ঃ | ইসলামী শারী'আহর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় জিনিস বা কাজ যা পরিত্যাগ করাই উত্তম। |
| মাগরিব | مَغْرِب | ঃ | সূর্যাস্তের পর যে ছালাত আদায় করা হয় এবং পশ্চিম দিক। |
| মদীনাতুন নাবী | مَدِيْنَةُ النَّبِى | ঃ | অর্থ 'নবীর শহর'। এর ইসলামপূর্ব যুগের নাম ইয়াছরিব। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এখানে হিজরত করার পর "মদীনাতুন নাবী" নাম হয়; সংক্ষেপে মদীনাহ বলা হয়। |
| মান্‌দূব | مَنْدُوْب | ঃ | ইসলামী শারী'আয় 'পছন্দনীয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। |
| মাফ | مُعَافِى | ঃ | ক্ষমা। |
| মাযহাব | مَذْهَب | ঃ | ইসলামের শীর্ষ স্থানীয় ফাকীহদের ফিক্‌হ বিষয়ক মতামতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চিন্তাধারা ও আচরণবিধি। (বহুবচনে মাযাহিব– مذاهب ) |
| মার্‌ওয়াহ | مَرْوَة | ঃ | আল্-মার্‌ওয়াহ দ্রষ্টব্য। |
| মা'রূফ | مَعْرُوْف | ঃ | সঠিক কাজ, ভাল ও ন্যায়সঙ্গত কাজ। এর বিপরীত মুন্‌কার (মন্দকাজ)। |

| | | |
|---|---|---|
| মাল | مَال | ঃ (বহুবচনে আমওয়াল– اَمْوَال ) ধনসম্পদ। |
| মালাঅিকাহ | مَلَائِكَة | ঃ (এক বচন– مَلَك ) ফেরেশ্‌তা। |
| মালাকুল মাওত | مَلَكُ الْمَوت | ঃ মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা; 'আযরাঈল বা 'ইযরাঈল নামেও পরিচিত। |
| মাস্‌জিদুন্‌ নাবাবী | اَلْمَسجِدُالنَّبَوِى | ঃ আল্‌ মাস্‌জিদুন নাবাবী দ্রষ্টব্য। |
| মাস্‌জিদুল আকছা | اَلْمَسْجِدُالاَقْصَى | ঃ আল্‌- মাস্‌জিদুল আকছা দ্রষ্টব্য। |
| মাস্‌জিদুল্‌ হারাম্‌ | اَلْمَسجِدُالحَرَام | ঃ আল্‌-মাস্‌জিদুল হারাম দ্রষ্টব্য। |
| মাহরাম | مَحْرَم | ঃ ঘনিষ্ঠতম স্বজন যাদের সাথে বিবাহ হারাম। |
| মিকাইল | مِكَائِيل | ঃ (মিকাল- مِكَال -ও বলা হয়।) কুর'আন মজীদে নাম উল্লেখ করা হয়েছে এমন একজন শীর্ষস্থানীয় ফেরেশ্‌তা। (সূরাহ আল্‌-বাকারাহ– ২ ঃ ৯৮) |
| মিনা | مِنَى | ঃ মক্কাহ থেকে সাড়ে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। হাজীগণ এখানে কুরবানী করেন। |
| মি'রাজ | اَلْمِعْرَاج | ঃ 'আল্‌-মি'রাজ' দ্রষ্টব্য। |
| মিল্লাত | مِلَّة | ঃ জাতি বা সম্প্রদায়। |
| মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ | مِلَّةً وَاحِدَةً | ঃ এক জাতি, একাত্ম জাতি। |
| মিশ্‌কাত্‌ | مِشْكَاة | ঃ মিশ্‌কাতুল্‌ মাছাবীহ مِشْكَاةُالْمَصَابِيح নামক হাদীছ সংকলনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। আবু মুহাম্মাদ আল্‌- হুসাইন বিন মাস্‌'উদ (ওফাত ৫১৬ হিজরী) এটি সংকলন করেন। |
| মীকাত্‌ | مِيقَات | ঃ (বহুবচন মাওয়াকীত- مواقيت ) 'উমরাহ বা হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ইহরাম পরিধানের জন্য নির্ধারিত পাঁচটি স্থান। এর যে কোন একটিতে পৌঁছার সাথে সাথেই তাদের জন্য ইহরাম পরা বাধ্যতামূলক। |
| মীরাছ | مِيْرَاث | ঃ ইসলামী শারী'আহর উত্তরাধিকার আইন। |
| মুআয্‌যিন | مُؤَذِّن | ঃ যিনি আযান দেন। |
| মুক্‌তাদী | مُقْتَدِى | ঃ ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায়কারী। |
| মুকীম | مُقِيم | ঃ কোন জায়গার অধিবাসী। ইসলামী শারী'আহর পরিভাষায় কোন মুসাফির কোথাও পনের দিনের বেশী বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে ঐ জায়গার মুকীম বলে গণ্য হবে। |
| মুছ্‌হাফ | مُصْحَف | ঃ কুর'আন মজীদের যে কোন একটি কপি। |
| মুছাল্লী | مُصَلِّى | ঃ ছালাত আদায়কারী। |
| মুজ্‌তাহিদ | مُجْتَهِد | ঃ 'ইজ্‌তিহাদ' দ্রষ্টব্য। |
| মু'জিযাহ | مُعْجِزَه | ঃ অলৌকিক কাজ; নবী-রাসূলগণ (আঃ) তাঁদের নবুওয়াত বা রিসালাহর প্রমাণস্বরূপ যে সব অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেছেন। |
| মুত্তাকী | مُتَّقِى | ঃ পরহেযগার, তাকওয়ার অধিকারী। |
| মুন্‌কার | مُنْكَر | ঃ গুনাহর কাজ, অন্যায় কাজ। এর বিপরীত হচ্ছে মা'রূফ। |

| | | |
|---|---|---|
| মুনাজাত | مناجات | ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাত তুলে দু'আ ও আবেদন-নিবেদন করা। |
| মুনাফিক | منافق | ঃ (বহুবচনে মুনাফিকূন– منافقون ) যার চিন্তা ও কথা বা কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান পোষণ করে না অথচ সে নিজেকে মু'মিন বা মুসলিম বলে দাবী করে। তেমনি যে ব্যক্তি ঈমান অনুযায়ী আমল করে না। |
| মুফ্তী | مفتى | ঃ ফতোয়া বা ইসলামী বিধি-বিধান সম্বন্ধে রায় দানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। |
| মুবাহ | مباح | ঃ ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় এর অর্থ নীরব অর্থাৎ ইসলাম যা করতেও বলে নি বা তা করা নিষেধও করে নি। |
| মু'মিন | مؤمن | ঃ (বহুবচন মু'মিনুন– مؤمنون ) ঈমানদার; যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে এক ও শরীকবিহীন, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল ও পরকালীন জীবনকে সত্য বলে জেনে তা ঘোষণা করেছে এবং তদনুযায়ী আমল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। |
| মুয্দালিফা | مزدلفة | ঃ মক্কাহ্ থেকে সাড়ে ১১ কিলোমিটার পূর্বে 'আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা। কুর'আন মজীদে এ জায়গাকে মাশ্'আরুল হারাম বলা হয়েছে। হাজ্জযাত্রীদেরকে ১০ই যুল্হিজ্জার রাতে (৯ই যুল্হিজ্জার সূর্যাস্তের পরবর্তী রাতে) এখানে অবস্থান করতে হয়। (সূরাহ আল্-বাকারাহ – ২ ঃ ১৯৮) |
| মুর্দা | مرده | ঃ (ফার্সী) মৃত, মৃতদেহ। |
| মুশ্রিক | مشرك | ঃ যে আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক বা অংশীদার বলে বিশ্বাস করে বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত-উপাসনা করে। |
| মুসলিম | مسلم | ঃ যে স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামী জীবনবিধানকে গ্রহণ করেছে ও নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলছে। এছাড়া ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর হাদীছ সংকলন ছাহীহ মুসলিম-এর সংক্ষিপ্ত নাম। |
| মুসাফাহাহ | مصافحة | ঃ দুই মুসলমানের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য পরস্পরের ডান হাতকে ডান হাত বা উভয় হাত দিয়ে ধরা। |
| মুসাফির | مسافر | ঃ সফরকারী। সফর দ্রষ্টব্য। |
| মুহাজির | مهاجر | ঃ (বহুবচন মুহাজিরূন– مهاجرون ) আভিধানিক অর্থ হিজরত কারী। ইসলামী পরিভাষায়, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় মক্কাহ থেকে মদীনায় হিজরতকারী মুসলমান। |
| মুহাজিরূন | مهاجرون | ঃ মুহাজির দ্রষ্টব্য। |
| মুহাদ্দিছ | محدث | ঃ হাদীছশাস্ত্রবিশারদ। |
| মুহার্রাম | محرم | ঃ ইসলামী সালের প্রথম মাস। |
| মুহাম্মাদ (সাঃ) | محمد(ص) | ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল্লাহ (সাঃ)। |

| | | |
|---|---|---|
| মেহেরবান | مهربان | ঃ (ফার্সী) দয়ালু। |
| যবেহ | ذَبح | ঃ (সঠিক উচ্চারণ যাব্হ্) আল্লাহ্র নাম নিয়ে হালাল পশু-পাখীকে হত্যা করা। |
| যাম্যাম | زَمزَم | ঃ আভিধানিক অর্থ 'উচ্ছ্বসিত' বা 'প্রচুর পানিপূর্ণ'। কা'বার নিকট হযরত হাজার (আঃ) (হাজেরা বলে পরিচিত) কর্তৃক আবিষ্কৃত কূপ। |
| যিক্র | ذِكر | ঃ আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ বা সপ্রশংস উল্লেখ। |
| যুল্হিজ্জাহ | ذوالحجة | ঃ ইসলামী সালের দ্বাদশ মাস। প্রতি বছর এ মাসে হাজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। |
| যুহর | ظُهر | ঃ অর্থ 'দুপুর'। ইসলামী পরিভাষায় মধ্যাহ্নের পরবর্তী ছালাতের ওয়াক্ত ও এ ছালাতের নাম (ছালাতুয্ যুহর)। |
| রব্ | رَبّ | ঃ (সঠিক উচ্চারণ রাব্ব্ অর্থ 'প্রভু', 'পালনকর্তা', 'প্রতিপালক'। |
| রহমত | رَحمة | ঃ দয়া, অনুগ্রহ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ বা দয়া। |
| রাক্'আহ্ (রাক্'আত) | رَكعة | ঃ (বহুবচন রাকা'আত- رَكعة) ছালাত বা নামাযের এক রাক্'আত বা এক ইউনিট। |
| রাজাব | رَجَب | ঃ ইসলামী সালের সপ্তম মাস। |
| রাবী'উল আউয়াল | رَبيعُ الأوّل | ঃ ইসলামী সালের তৃতীয় মাস। |
| রামাদান | رَمَضَان | ঃ ইসলামী বর্ষপঞ্জীর নবম মাস। এ মাসে ছাওম বা রোযা পালন করা বাধ্যতামূলক। |
| রাসূল্ | رَسُوْل | ঃ যিনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াতের জন্যে কিতাব ও শারী'আহ সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত। (বহুবচনে رُسُل রুসুল) |
| রাসূলুল্লাহ | رَسُوْلُ الله | ঃ আল্লাহ্র রাসূল। এটি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিচিতিবাচক নামও বটে। অর্থাত নাম উল্লেখ ছাড়া শুধু 'রাসূলুল্লাহ' বললে তাঁকেই বুঝায়, অন্যকোন রাসূল (আঃ)-কে নয়। |
| রিবা | رِبَا | ঃ ঋণের মোকাবিলায় ঋণের মোট অর্থের চেয়ে বেশী গ্রহণ করা অর্থ। প্রচলিত পরিভাষায় একে 'সূদ' ও 'ইন্টারেস্ট' বলা হয় (সূরাহ আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২৭৫-২৭৬) |
| রিয্ক্ | رِزق | ঃ খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য শারীরিক-মানসিক ভোগোপকরণ হিসেবে আল্লাহ্র দান। |
| রিসালাহ্ | رِسَالة | ঃ রাসূলের পদ; ফেরেশ্তা, ওয়াহী ও কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলগণের (আঃ) নিকট বাণী পৌছাবার ব্যবস্থা। |
| রুকূ' | رُكُوْع | ঃ ছালাতের মধ্যে (হাঁটুতে হাত রেখে) মাথা নত করা। |
| রূহ | رُوح | ঃ আত্মা– যার মৃত্যু নেই (সূরাহ আস্-সিজ্দাহ্- ৩২ ঃ ৯) এ ছাড়া কুর'আন মজীদে হযরত জিবরাঈল ফেরেশ্তাকেও এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরাহ আল্-কাদ্র-৯৭ ঃ ৪) |
| রোযা | روزه | ঃ (ফার্সী) ছাওম দ্রষ্টব্য। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| লা'নত্ | لَعْنَة | ঃ | অভিশাপ। ইবলীস হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদাহ করতে অস্বীকার করায় আল্লাহ্‌র লা'নতের শিকার হয়। |
| শয়তান | شَيْطَان | ঃ | আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য ইবলীস নামক জিনের উপাধি। জিন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ইবলীসের অনুসারী ও মানুষকে কুমন্ত্রনা দানকারীদের সাধারণ নাম। কুর'আন মজীদে এ ধরনের মানুষকেও শয়তান বলা হয়েছে। |
| শাউয়াল্ | شَوَّال | ঃ | ইসলামী সালের দশম মাস। |
| শাফা'আত্ | شَفَاعَة | ঃ | সুপারিশ। ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ বিচারের দিনে তাঁর অনুসারীদের ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট যে সুপারিশ করবেন। তাকে শাফা'আত বলা হয়। |
| শা'বান | شَعْبَان | ঃ | ইসলামী সালের অষ্টম মাস। |
| শাম | شَام | ঃ | প্রাচীন বৃহত্তর সিরিয়া; বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্দান এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। |
| শারী'আহ্ | شَرِيْعَة | ঃ | পথ, পন্থা, আইন-কানুন বা আচরণবিধি; ইসলামী পরিভাষায় ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান। |
| শাহাদাহ্ (শাহাদাত) | شَهَادَة | ঃ | এ মর্মে সাক্ষ্য দান যে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর রাসূল"। এটি হচ্ছে ইসলামের প্রথম মৌলিক কর্তব্য। এছাড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন দান করাকে শাহাদাহ্ বলা হয়। |
| শাহীদ | شَهِيد | ঃ | যে মুসলমান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন দান করেছেন। |
| শির্ক | شِرْك | ঃ | আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতায় কাউকে শরীক মনে করা বা আল্লাহ্ ছাড়া কারো 'ইবাদাত বা পূজা-উপাসনা করা। |
| শি'বি আবি তালিব | شعب ابى طالب | ঃ | মক্কার নিকটবর্তী একটি সংকীর্ণ উপত্যকা। |
| শূরা | شُوْرَى | ঃ | ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরামর্শ। (সূরাহ আশ্-শূরা- ৪২ ঃ ৩৮) |
| শোকর | شُكْر | ঃ | কৃতজ্ঞতা। |
| সফর | سَفَر | ঃ | ভ্রমণ, পর্যটন। ইসলামী পরিভাষায় পনর দিনের ক অবস্থানের নিয়্যাতে সুনির্দিক দূরত্বে গমনের জন্যে বের হওয়া ও সেখানে অবস্থান। |
| সাইফুল্লাহ্ | سَيْفُ اللّٰه | ঃ | আল্লাহ্‌র তরবারী- খ্যাতনামা মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন আল্-ওয়ালীদ (রাঃ)-এর খেতাব। |
| সাইয়্যিদাতুন নিসা' | سَيِّدَةُ النِّسَاء | ঃ | নারীদের নেত্রী, সাইয়্যিদাতুন নিসাই ফী আহলিল জান্নাহ্ অর্থাৎ 'বেহেশ্‌তে নারীদের নেত্রী'-এর সংক্ষেপ। এটি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমাহ (রাঃ)-এর উপাধি। |
| সা'ঈ | سَعْي | ঃ | ছাফা ও মার্ওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে আসা-যাওয়া যা হাজ্জের অন্যতম করণীয়। |
| সাজ্দাহ্ | سَجْدَة | ঃ | (বহুবচনে سُجُوْد সুজূদ) ছালাতের মধ্যে বসার পর কপাল মাটিতে (বা জায়নামাযের ওপর) ঠেকানো। বাংলায় 'সিজ্দাহ' বলা হয়। |

| | | |
|---|---|---|
| সাজ্‌দাতুস্‌ সাহ্‌ও | سَجدَةُ السَّهوُ | ঃ ছালাতের ভিতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভুলের কারণে যে দু'টি অতিরিক্ত সিজদাহ্‌ করতে হয়। |
| সালাম | سَلَام | ঃ ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আ মাছুরাহ পড়ার পর ডানে ও বামে মুখ ফিরানো ও প্রতি বার "আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলা । এই সালামের মাধ্যমে ছালাত শেষ হয়। এছাড়া দুই জন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাত হলে উক্ত বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ ও "ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" বলে জবাব দান। |
| সাহূর | سَحُور | ঃ ছাওম পালনের উদ্দেশ্যে ছুবেহ ছাদিকের আগে যে খাবার খাওয়া হয়। বাংলায় ব্যাপকভাবে সেহরী বলা হয়। |
| সীরাহ | سِيرَة | ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের জীবনকাহিনী। |
| সুন্নাহ | سُنَّة | ঃ (বহুবচন সুনান- سُنَن) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্ত। এছাড়া তিনি ফরযের অতিরিক্ত যে ছালাত আদায় করতেন তাকেও 'সুন্নাহ ছালাত' (সুন্নাত নামায) বলা হয়। |
| সূরাহ | سُورَة | ঃ (বহুবচন সুওয়ার- سُوَار ) কুর'আন মজীদের এক একটি অধ্যায়। |
| হক | حق | ঃ সত্য, সত্যপথ, ইসলাম এবং ন্যায্য অধিকার। |
| হযরত | حَضرَة | ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানিত ব্যক্তিদের নামের পূর্বে সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়। আভিধানিক অর্থ 'নৈকট্য' ও 'উপস্থিতি'। পারিভাষিক অর্থ ইংরেজী His/Her/Your Excellency- এর সমার্থক। |
| হাওয়া' | حوَاء | ঃ প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী, সমগ্র মানবজাতির আদি মাতা। |
| হাজার | هَاجَر | ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)-এর মাতা। বাংলা ভাষায় বিবি হাজেরা নামে পরিচিত। |
| হাজেরা | | ঃ 'হাজার' দ্রষ্টব্য। |
| হাজ্জ | حَج | ঃ যুল্‌হিজ্জাহ মাসে মাক্কায় আল্লাহ্‌র ঘরের নিকট হাযির হয়ে এ গৃহের তাওয়াফ করা সহ আরো কতক আনুষ্ঠানিকতা আঞ্জাম দেয়ার নাম। এটি ইসলামের পাঁচটি মৌলিক কর্তব্যের অন্যতম। (সূরাহ আল্‌-বাকারাহ- ২ ঃ ১৫৮ ও ১৯৬-২০৩; আলে 'ইমরান- ৩ ঃ ৯৭; আল্‌-মায়িদাহ- ৫ ঃ ২; আল্‌-হাজ্জ- ২২ ঃ ৩০) |
| হাদীছ | حَدِيث | ঃ (বহুবচন আহাদীছ- حَادِيث ) হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে কোন কথা বা কার্জ অথবা কোন কাজের প্রতি তাঁর অনুমোদনের বর্ণনা। |
| হাফিয | حَافِظ | ঃ (বহুবচন হুফ্‌ফায- حُفَّاظ ) সমগ্র কুর'আন যার মুখস্ত আছে। |
| হায়া' | حَيَاء | ঃ নম্রতা, লাজুকতা, আত্মসম্ভ্রম, অপ্রতিভ অবস্থা ইত্যাদি। কোন খারাপ কাজ করলে বা অশোভন কিছু ঘটলে যে লজ্জার অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাকেই হায়া' বলা হয়। |
| হার্‌বুল্‌ ফিজার | حَربُ الفِجَار | ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তরুণ বয়সে আরবে কয়েক বছর ব্যাপী (যখন তাঁর বয়স পনর হতে বিশ বছর ছিল) সংঘটিত |

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তৎকালেও পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ না করার রীতি প্রচলিত ছিল। এ যুদ্ধে সেসব মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করা হয় বলে এ যুদ্ধকে 'হারবুল্ ফিজার' বা 'পাপাচারের যুদ্ধ' বলা হয়।

হারাম حَرَام ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে যা নিষিদ্ধ– যা করলে গুনাহ হয়। তেমনি এর মানে সম্মানিত বা পবিত্র (জায়গা ও সময়); যেহেতু এর অসম্মান করা গুনাহ্র কাজ তাই তাকে হারাম বলা হয়। যেমন ঃ হারাম মাস, মাসজিদুল হারাম ইত্যাদি।

হালাল حَلَال ঃ ইসলামে যা বৈধ ও অনুমোদিত।

হিক্মাহ حِكْمَة ঃ পরম জ্ঞান, অকাট্য জ্ঞান, সৃষ্টিজগতের মৌলিক তথ্যাবলীর জ্ঞান।

হিজরাহ (হিজ্রত) هِجْرَة ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মক্কাহ থেকে মদীনায় চলে যাওয়া ও সেখানে অবস্থান।

হিজ্রী هِجْرِى ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হিজরতের বছর (৬২২ খৃস্টাব্দ)-কে ১ম বছর ধরে প্রবর্তিত ইসলামী সাল।

হিজাব حِجَاب ঃ একজন মুসলিম নারীকে বাইরে যেতে বা অনাত্মীয় পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় মাথা ঢাকাসহ যে বহিরাবরণ পরতে হয়।

হিদায়াহ هِدَايَة ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পথপ্রদর্শন বা দিকনির্দেশ।

হিফাজাহ (হেফাযত) حِفَاظَة ঃ সংরক্ষণ, রক্ষা করা।

হিরা' حِرَاء ঃ মক্কাহ নগরীর পার্শ্ববর্তী জাবালুন নূর (জ্যোতির পর্বত)-এর একটি গুহা যেখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট প্রথম বারের মত ওয়াহী নিয়ে আসেন।

হিলফুল ফুযূল حِلْفُ الْفُضُوْل ঃ অর্থ 'নেককার লোকদের মৈত্রী'। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যৌবনকালে মক্কায় যে সেবামূলক সংগঠনে যোগ দেন তার নাম।

হুদাইবিয়াহ حُدَيْبِيَة ঃ মক্কাহ থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে জেদ্দা যাবার পথে একটি সুপরিচিত জায়গা। এখানে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কার কাফিরদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।

হুকুম-আহ্কাম ঃ আহ্কাম বুঝাতে বাংলায় বহুল প্রচলিত বা প্রথাগত ব্যবহার। আহ্কাম দ্রষ্টব্য।

হুকুমাহ (হুকুমাত) حُكُوْمَة ঃ রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা।

হুবাল هُبَل ঃ জাহেলিয়াত যুগের মক্কাবাসীদের পূজনীয় প্রধান দেবমূর্তি। মুসলমানদের মক্কাহ বিজয়ের সময় এটিকে ধ্বংস করা হয়।

ইসলাম : ঈমান ও শিক্ষা ইংরেজীতে লিখিত Islam : Beliefs and Teachings বইয়ের বাংলা অনুবাদ। ইংরেজী ভাষায় এ বইটি এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৫০ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছে। এ বইটিতে অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার সহজ সরল ভাষায় সলামের বুনিয়াদী আকিদা, ঈমান ও শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়াবলীকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন। এ তে আল্লাহর শেষ রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনের প্রধান প্রধান দিকগুলি, খোলাফায়ে রাশেদীনের নর সংক্ষিপ্ত বিবরণী, হযরত খাদিজাহ, হযরত আয়েশাহ ও হযরত ফাতেমাহর জীবনের সংক্ষিপ্ত তি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এ বইটিতে রয়েছে ইসলামী শরী'আহ, পোশাক, খাদ্য-পানীয়, পারিবারিক, জিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কিত আলোচনা। বিবাহ, দের ইসলামী মর্যাদা, কোরআনের নির্বাচিত আয়াত ও রাসুল (সাঃ) এর হাদীছ এর কিছু নির্বাচনও এ ইতে সংযোজিত করা হয়েছে। এ বইটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখিত সম্ভবতঃ প্রথম বই। এ বইটি যদিও প্রধানত : ইংরেজী বলা বিশ্বের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত, কিন্তু এ বইটিতে ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা বেশ কিছু অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহন করতে অনুপ্রাণিত করেছে। অনেক প্রাপ্ত বয়স্করাও এ বই থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে উপকৃত হয়েছেন। বাংলাদেশের যুব সমাজের বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত যুবকরা এ বই থেকে উপকৃত হবেন। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্য তালিকায় বইটি শামেল করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় এ বইটি সর্বপ্রথম প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে দারুল খিদমাহ প্রকাশনী এবং এটা পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশের প্রধান ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **আধুনিক প্রকাশনী**।

**অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার** ১৯৭৩ সাল থেকে লন্ডনে অবস্থিত মুসলিম এডুকেশনাল ট্রাস্টের ডাইরেক্টর হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে বি,কম অনার্স ও ১৯৬৬ সালে বিজিনেস ম্যানেজম্যান্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কলেজে বিজিনেস ম্যানেজম্যান্ট বিষয়ে প্রায় তিন বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৯৬২ সাল থেকে তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ থেকে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইংরেজী ভাষায় লিখিত Islam for Younger People, The children's Book of Salah, Syllabus and Guidelines for Islamic Teaching, Sex Education: The Muslim Perspective, British Muslims and Schools, Islamic Education : its meaning, Problems and Prospects বইগুলি ইংরেজী বলা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

**দারুল খিদমাহ প্রকাশনী** ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজ সেবামূলক সংগঠন দারুল খিদমাহ ওয়াল ফালাহ বাংলাদেশের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান (Subsidiary organisation)। এ বেসরকারী সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খেদমতের মাধ্যমে বঞ্চিত, দুঃস্থ, অসহায় গরীব মানুষদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলামের দিকে আহ্বান করা। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা ছাড়াও কার্দান হাছানান কর্মসূচীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক দূর অবস্থা দূরীকরণে সহযোগিতা শামেল রয়েছে।

ISBN 984-32-0325-9

নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র